সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ৪

২০১৯ সালে মিডিয়াতে প্রকাশিত সিপিডি'র নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ

সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ৪

২০১৯ সালে মিডিয়াতে প্রকাশিত
সিপিডি'র নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ

প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি - ৬/২ (৭ ও ৮ তলা), ব্লক - এফ
কাজী নজরুল ইসলাম রোড, লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট
ঢাকা - ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৮১৫২৭৭৯, ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২
ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৪৮১১০৪১৪
ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২০

স্বত্ব
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারগুলোতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবে লেখকদের নিজস্ব। এর সাথে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে।

অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাস
মোঃ সাইফুল হাসান

ISBN 978-984-34-8795-7

মূল্য
৩৫০ টাকা

মুদ্রক

লিথোগ্রাফ
৪১/৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

C12020_2SOM_SPE

সিপিডি পরিচিতি

১৯৯৩ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) যাত্রা শুরু করে। নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সহযোগীদের সাথে সংযোগ ও সংলাপ প্রসারের লক্ষ্যে একটি নাগরিক উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় সিপিডি।

দীর্ঘ ২৬ বছরের পথ চলায় সিপিডি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি স্বাধীন থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সিপিডি'র অন্যতম কার্যক্রম হলো দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ও নীতি-নির্ধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে গবেষণা করা এবং গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সংলাপের আয়োজন করা।

এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিপিডি'র কার্যক্রম বৈশ্বিক পর্যায়ে বিস্তৃত। সিপিডি বর্তমানে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার ৪৯টি থিঙ্ক ট্যাংক নিয়ে গঠিত সম্মিলিত একটি নেটওয়ার্ক Southern Voice on Post-MDG International Development Goals (সাউদার্ন ভয়েস)-কে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

আবার জাতীয় পর্যায়ে সিপিডি *এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ*-এর সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে। দেশে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা রাখাই এই প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য।

এছাড়াও সিপিডি জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের চতুর্থ সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন গতিচিত্র পর্যবেক্ষণে গঠিত একটি স্বাধীন অংশীদারিত্ব, LDC IV Monitor-এর সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে।

সিপিডি প্রকাশিত বই, মনোগ্রাফ, ওয়ার্কিং পেপার, সংলাপ প্রতিবেদন ও সংক্ষিপ্ত নীতি পরামর্শের সংখ্যা ইতিমধ্যে ৪০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সিপিডি'র প্রকাশনা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি নিয়মিতভাবে সিপিডি'র ওয়েবসাইটে (www.cpd.org.bd) প্রকাশ করা হয়।

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান

ড. ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সম্মাননীয় ফেলো

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো

অধ্যাপক রওনক জাহান
সম্মাননীয় ফেলো

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
গবেষণা পরিচালক

তৌফিকুল ইসলাম খান
জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো

মোস্তফা আমির সাব্বিহ
জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী

সৈয়দ ইউসুফ সাদাত
জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী

মুখবন্ধ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) বাংলাদেশের একটি স্বাধীন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন অর্থনীতি, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য, অসমতা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সুশাসন, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সিপিডি তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করছে। এর পাশাপাশি সিপিডি'র গবেষকরা তাদের গবেষণার ফলাফল বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্রে কলাম লিখে থাকেন এবং সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতেও সিপিডি'র গবেষকদের মতামত প্রকাশিত হয়।

২০১৪-২০১৮ সালের নির্বাচিত মতামতগুলো তিনটি পূর্ণাঙ্গ বই আকারে ২০১৫, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলার জন্য বর্তমান সংকলনটি আমরা প্রকাশ করছি, যেখানে ২০১৯ সালে দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত সিপিডি'র গবেষকদের নির্বাচিত বিশেষ মতামত, কলাম ও সাক্ষাৎকার সংকলন করা হয়েছে। এ লেখাগুলোতে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট ও অর্থনীতি বিষয়ক আলাপ, উন্নয়ন ও অগ্রগতি, বাণিজ্য ও ব্যাংকিং খাত, এলডিসি হতে উত্তরণ ও এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের করণীয় ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ক বক্তব্য আছে। এছাড়া বইটিতে বর্তমানে বাংলাদেশের যুব কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা ও এর সমাধান নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তুর উপর বিন্যাস করে বর্তমান সংকলনটিকে ছয়টি পৃথক অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'জাতীয় বাজেট ও অর্থনীতি', যেখানে ২০১৯-২০২০ সালের প্রস্তাবিত বাজেট ও এর কার্যকারিতা নিয়ে সময়োপযোগী বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। 'উন্নয়ন ও অগ্রগতি' শিরোনামের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন ও উন্নয়নের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে করণীয় বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সংস্কার ও বাণিজ্যে সুদূরপ্রসারী বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায় 'ব্যাংকিং ও বাণিজ্য' তে।

বর্তমানে বাংলাদেশের একটি অন্যতম সঙ্কট হলো যুব বেকারত্ব ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এই সঙ্কট উত্তরণে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার জন্য নীতি বিষয়ক সংস্কারের কথা বলা হয়েছে 'যুব কর্মসংস্থান' শিরোনামের চতুর্থ অধ্যায়ে। পঞ্চম অধ্যায় 'স্বল্পোন্নত দেশ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলাদেশের উত্তরণ ও অভীষ্ট

অর্জনের চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচিত হয়েছে। ‘অন্যান্য’ শিরোনামের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবিধ বিষয়ের উপর প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে, যেমন রোহিঙ্গা সঙ্কট, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ও স্যার ফজলে হাসান আবেদের প্রয়াণ।

প্রকাশনার সময় অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়ের প্রবন্ধগুলো সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ বিষয় অনুযায়ী অধ্যায়গুলো বিন্যাস করার পর যে প্রবন্ধগুলো আগে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোকে ওই অধ্যায়ে আগে রাখা হয়েছে।

আশা করা যায়, সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে সিপিডি'র গবেষকদের বিশ্লেষণ সম্বলিত এই বইটির জন্য ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ সমাজ ও বৃহত্তর জনমানুষের আগ্রহ থাকবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সিপিডি'র গবেষণাকর্ম বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যেসব পত্রিকা সুযোগ করে দিয়েছেন, এ গ্রন্থের সকল লেখকের পক্ষে আমি সেসব পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখানে উল্লেখ্য যে, মিডিয়ায় প্রকাশিত বক্তব্যসমূহ গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করে প্রকাশের উপযোগী করতে গিয়ে ক্ষেত্র-বিশেষে কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্তন করা হয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি প্রবন্ধ ইংরেজী ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

সিপিডি'র ডায়লগ ও কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীরা এ সংকলন প্রকাশের জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন। লেখা ও মন্তব্যসমূহের নির্বাচন ও বাছাই, সেগুলো বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যাস ও পরিমার্জন করে প্রকাশের উপযোগী করে তুলতে তারা প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। এ বিভাগের যুগ্ম-পরিচালক *অভ্র ভট্টাচার্য* এক্ষেত্রে সার্বিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রকাশনা সহযোগী *আসমাউল হুসনা* এবং প্রোগ্রাম সহযোগী (ডিটিপি) *মোঃ সাইফুল হাসান* সংকলনটি প্রকাশে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। তাদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি, ২০২০

ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সূচিপত্র

মুখবন্ধ *সাত*

অধ্যায় ১: জাতীয় বাজেট ও অর্থনীতি

Will the budget for FY2020 be any different? ৩
Fahmida Khatun

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নিরিখে আগামী বাজেট ৭
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

The emerging cracks in our external sector ১১
Mustafizur Rahman

দুর্বল আর্থিক কাঠামোই বড় চিন্তার কারণ ১৬
তৌফিকুল ইসলাম খান

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট কতখানি বাস্তব ১৯
ফাহমিদা খাতুন

এই বাজেট কি পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য হবে? ২৩
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ত্রিশূলের উপর এবারের বাজেট ৩৮
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যায় ২: উন্নয়ন ও অগ্রগতি

Looking beyond high growth in Bangladesh ৪৯
Fahmida Khatun

রবীন্দ্র স্বদেশ ও উন্নয়ন চিন্তা ৫৩
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অর্থনীতি কীভাবে বৃদ্ধি পায়? ৫৮
সৈয়দ ইউসুফ সাদাত

Our incomprehensible obsession with GDP ৬১
Fahmida Khatun

প্রবৃদ্ধি এখন ভোগবৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪
ফাহমিদা খাতুন

প্রবৃদ্ধির কাহিনি যেন উন্নয়নের শত্রু না হয় ৬৬
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হতে পারে উন্নয়নের সহায়ক ৭২
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

২০২০ সালে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশ ৮৮
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সামগ্রিক মূল্যায়ন ২০১৯ ১০৬
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

তিনটি আশা করার সাহস পাচ্ছি না ১২২
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যায় ৩: ব্যাংকিং ও বাণিজ্য

পাটশিল্পের পরিত্রাণ কোন পথে ১২৭
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

সুদের উচ্চ হার কি জনস্বার্থে? ১৩২
ফাহমিদা খাতুন ও সৈয়দ ইউসুফ সাদাত

ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা জরুরি ১৩৫
মোস্তাফিজুর রহমান

BRI - an emerging new international economic order ১৩৯
Rehman Sobhan

Sale of non-performing loans to asset management company ১৪৯
Fahmida Khatun

বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য প্রসঙ্গে ১৫২
মোস্তাফিজুর রহমান

Basic wage as a proportion of total wage for RMG workers has been falling ১৫৫
Khondaker Golam Moazzem

Why we still do not get fair clothing industry in Bangladesh ১৬০
Khondaker Golam Moazzem

ব্যাংককে করের টাকা দিয়ে ক্ষতির রাষ্ট্রীয়করণ করা হচ্ছে ১৬৩
মোস্তাফিজুর রহমান

বিনিয়োগ বাড়ানো বড় চ্যালেঞ্জ ১৬৬
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে চাঞ্চল্য দেখা যায়নি ১৭২
মোস্তাফিজুর রহমান

আগে চামড়া রপ্তানির ঘোষণা দিলে এ অবস্থার সৃষ্টি হতো না ১৭৩
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অধ্যায় ৪: যুব কর্মসংস্থান

কর্মক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার কী হতে পারে? ১৭৯
সৈয়দ ইউসুফ সাদাত

How much has the youth gained from growth? ১৮২
Fahmida Khatun

Time to address youth unemployment ১৮৫
Fahmida Khatun

যুব কর্মসংস্থান ও বাজেট ১৮৯
তৌফিকুল ইসলাম খান

অধ্যায় ৫: স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

Bangladesh’s LDC graduation and its repercussions for RMG ১৯৫
Mustafizur Rahman

Mahatma Gandhi and the Sustainable Development Goals ২০১
Debapriya Bhattacharya

Sustainable development of Bangladesh: Lessons from Korea ২০৬
Mostafa Amir Sabbih

এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতির নিরিখে এবারের বাজেট দেখা উচিত ২১৩
মোস্তাফিজুর রহমান

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২১৬
ফাহমিদা খাতুন

অধ্যায় ৬ঃ অন্যান্য

Addressing the Rohingya crisis: Whose responsibility is it? ২২১
Fahmida Khatun

The political philosophy of Bangabandhu ২২৫
Rounaq Jahan

Winners and losers in the Fourth Industrial Revolution ২৩৫
Fahmida Khatun

আমি আজ বেদনা ভারাক্রান্ত ২৩৯
রেহমান সোবহান

আমাদের ঘরের শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় আনতে হবে ২৪২
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যায় ১

জাতীয় বাজেট ও অর্থনীতি

Will the budget for FY2020 be any different?

Fahmida Khatun

Bangladesh's national budget for FY2020 will be the first budget of the newly elected government that came to power following the election in December 2018. Hence many would like to see how the budget is going to implement the promises made in the election manifesto of the ruling party. If taken seriously, election manifesto is a document which can act as the reference point of a political party to deliver on its commitments. The election manifesto of the ruling party is quite a comprehensive document that outlines the achievements of the last 10 years and elaborates the pledges to be delivered during the next five years. Some of the important deliverables will have to be achieved through budgetary allocations.

The issue of the size of the budget is not so relevant anymore. Quite naturally, the size will continue to increase in a growing economy with a large population. Still, the size hovers around 18 per cent of our gross domestic product (GDP) on average. This is not large if compared with other emerging economies. Rather, the quality and inclusivity aspects of the budget are more important for Bangladesh at this point in time. The GDP growth for FY2019 is predicted to be 8.13 per cent. Despite such a high growth, the economy is experiencing a number of challenges.

Economic growth could not create enough jobs in the economy leaving some 11.6 per cent of total youths unemployed. Inequality is evident in all respects, all forms—between rich and poor, between men and women, and between the eastern and western parts of the country. Private investment is stuck at around 23 per cent of GDP. Exports and remittances have seen slow growth in FY2019. Thus formulating a budget is not an easy task in such circumstances.

One of the weak links of our national budget is its implementation. This is applicable both for Annual Development Plan (ADP) and revenue mobilisation. The estimated budget is revised downwards in the mid-way. Then again the final numbers at the end of the fiscal year are even lower than the revised budget in most cases. This demonstrates the weak capacity of our budget implementation effort. As opposed to our family budget, the national budget develops expenditure plans first. Then the finance minister looks for resources to make those expenditures. One of the major sources of resource is domestic resource mobilisation, of which taxation is a key component. As the development expenditure is increasing, the government has to set high targets of revenue mobilisation to meet up expenses. However, neither our tax base is broad enough nor our tax collection mechanism is efficient enough to generate the targeted amount of taxation. As a result, for the last couple of years, there has been a huge shortfall of revenue mobilisation from the targets. Even with such deficit in revenue generation, the budget deficit remains below the target of five per cent. Why is that? Because ADP implementation also remains below the target. While this reflects our inability to fulfil commitments, the other aspect of the budget is no less important. And that is, the quality of budget implementation.

When it comes to the quality of expenditures, transparency and accountability are questionable in many cases. Large infrastructural projects are not completed timely. The delay costs dearly. Waste of resources and corruption are not unheard of. Many a time, poor quality infrastructures require an even larger amount for their maintenance. The other issue is to increase investment in social sectors. Such

investment should not only be for construction of schools and clinics but also for ensuring quality of education and health services. Improving the quality of teachers through training, overseeing the curriculum and syllabus in schools and monitoring the healthcare services are only a few means for quality enhancement. Similarly, resource for social safety net programmes is essential to address poverty. Surprisingly, government pension is considered part of the social safety net budget which makes the social safety budget larger than the actual amount flowing to the poor.

We would also like to see how the budget addresses the ongoing crisis in the financial sector. The banking sector is burdened with huge amounts of default loans. The government has been injecting resources to the losing banks, mostly owned by the state. Such regular recapitalisation has not resulted in improvement of the health of the problem-struck banks. It has rather created incentives even for the private commercial banks to misappropriate taxpayers' money. The recently published Financial Stability Report 2018 by the Bangladesh Bank points out that the net profit of the banking sector has decreased because of large amounts of default loans. This implies that banks' contribution to revenue generation will be lower. Rescheduled loans are becoming defaulted again and again. But banks continue to reschedule those default loans. How is it consistent with the election pledges of the ruling party?

Zero tolerance to corruption has been announced by the highest political authority of the current government. This is a laudable move. But this is not going to be a simple task given the nature of governance in the country at present. It will require strong and harsh measures. Institutional reform of the organisations in charge of monitoring corruption issues and taking measures against the corrupt are still unfinished. Budget can allocate more resources for digital governance and capacity development of officials. However, if the responsible bodies are not allowed to function without influence and fear, we will not be able to progress much on this count.

So the finance minister has a tall order in front of him. In terms of issues, the upcoming budget will have to deal with the same old ones. But it is time to change the approach. During its third term in leading the country, the ruling party will have to address the sources rather than the symptoms of the problems. Budgetary measures will be one of the tools to eliminate those.

31 May 2019
The Daily Star

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নিরিখে আগামী বাজেট

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মতে, 'জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, এরপর তৈরি হয় উপলব্ধি আর তা শেষ হয় যুক্তি দিয়ে। যুক্তির ঊর্ধ্বে কিছুই নেই'। গত আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে আমি জাতীয় বাজেট বিশ্লেষণে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছি। আর তা করতে গিয়ে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে অনেক যুক্তিযুক্ত বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তবে সাধারণত: সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে তেমন যৌক্তিক সাড়া পাইনি। এবার দুই ধাপ (কান্টের মতে) পিছিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মানুষের ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করলে যোগাযোগ আরো কার্যকর হয় কিনা, তা বোঝার জন্য।

প্রাত্যহিক জীবনে পঞ্চ ইন্দ্রিয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের সার্বিক উপলব্ধি তৈরিতে একটি ইন্দ্রিয় অন্যটির উপর নির্ভরশীল। পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলোর অনুক্রমের সমানুতার বিষয়ে কোনো সর্বসম্মত মতামত না থাকলেও, দর্শনেন্দ্রিয় বা চক্ষু সর্বোচ্চে অবস্থান করে।

তাই প্রথমেই দেখা যাক, জাতীয় বাজেট নিয়ে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় কি বলে? আমি মনে করি, এটি হলো জাতীয় বাজেটের আর্থিক কাঠামো। যা নির্ধারিত হয় সরকারের আয়, ব্যয় ও ঘাটতির উপর ভিত্তি করে। গত এক দশক ধরে বাংলাদেশ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখলেও, পদ্ধতিগতভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছে। জিডিপির অনুপাতে দেশের মোট রাজস্বের পরিমাণ বিশ্বে সর্বনিম্ন দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম! উপরন্তু, প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ মোট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ মাত্র এবং এই কর আদায়ের গতি উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। ভ্যাট সংক্রান্ত নতুন আইনের কার্যকর প্রয়োগ অবশ্যই এক্ষেত্রে একটি নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে যোগ হবে।

এ অবস্থায় নিজস্ব উদ্বৃত্ত রাজস্ব দ্বারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অর্থায়ন সরকারের পক্ষে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। সৌভাগ্যক্রমে, এডিপি বাস্তবায়ন এখন পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার নিচে রয়েছে। ফলে বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এডিপির আওতাধীন প্রকল্পগুলোর গুণগত মান ও বাস্তবায়ন প্রতি বছরই আমাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে। বর্তমানে, বেতন ও ভাতা খাতে সরকারের ব্যয় পৌনপুনিকভাবে অন্যান্য খাতের চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে বাজেট ঘাটতি কীভাবে সামাল দেওয়া হয়? সরকার প্রতি বছরই অভ্যন্তরীণ ঋণের জন্য উচ্চ সুদের সঞ্চয়পত্র এবং উচ্চ সুদের বৈদেশিক ঋণের দ্বারস্থ হচ্ছে, যদিও বিদেশি অনুদান ও অল্প সুদে ঋণ নেওয়ার সুযোগ বিদ্যমান। সরকারের ঋণের বোঝা যে বাড়ছে তার প্রাথমিক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তাই এটি পরিষ্কার যে দীর্ঘ মেয়াদে জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য যে শক্তিশালী আর্থিক কাঠামো দরকার তা ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাই আগামী বাজেটে আর্থিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার বিশ্বাসযোগ্য কী প্রস্তাব দেয়, আমরা তা দেখার অপেক্ষায় আছি।

আসন্ন বাজেটকে অনুধাবনের জন্য আমি দ্বিতীয় যে ইন্দ্রিয়ের কথা বলবো তা হলো - সাউন্ড বা শব্দ। যদিও এক্ষেত্রে সাউন্ড বা শব্দের অর্থ হলো কোলাহল, মিউজিক বা সংগীত নয়। আর ব্যাংকিং খাত এবং পুঁজিবাজার থেকে সৃষ্টি হচ্ছে উচ্চস্বরের সেই কোলাহল। ডেব্‌ট মার্কেট বা ঋণবাজার এবং ইকুইটি মার্কেট উভয়েই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় রয়েছে যা অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে বেসরকারি বিনিয়োগে হতাশাজনক পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে প্রধান কারণগুলোর অন্যতম। গত চার বছর ধরে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে বেসরকারি বিনিয়োগের হার স্থবির হয়ে আছে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের চিত্রও নিষ্প্রভ। ক্রমবর্ধমান ঋণ খেলাপির মধ্যেও সম্প্রতি সুদের হার নিয়ে সরকার যে নয়-ছয় করলো, তাতে এই খাতের মূল সমস্যা ক্রুটিপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা মোকাবেলা করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। ব্যাংকিং খাত ও পুঁজিবাজারকে সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে, প্রথাগত আর্থিক প্রণোদনার বাইরে, আসন্ন বাজেটে সরকার নীতিগত কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা আমরা দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের আপেক্ষিক গুরুত্বের বিপরীতে, অবশিষ্ট তিনটি ইন্দ্রিয় - যেমন স্পর্শ, স্বাদ ও ঘ্রাণের ক্রম সর্ম্পকে (গুরুত্বের বিবেচনায়) সর্বসম্মত কোন মতামত নেই। যাই হোক, আমি উপরে উল্লিখিত ক্রম অনুসারেই বলছি।

আগামী বাজেটে যে খাতে সরকারের সূক্ষ্ম স্পর্শের প্রয়োজন তা হলো বহির্খাত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহ থাকা সত্ত্বেও আমদানির

উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য নেতিবাচক অবস্থানে রয়েছে। সরকারের লেনদেনের ভারসাম্য ও চলতি হিসাব উভয়ই নিম্নগামী। আর আগেও বলেছি, সরকারের ঋণভার যে বাড়ছে তার পূর্বলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর চাপ বাড়ার লক্ষণও পরিষ্কার। সে জন্য টাকার বিনিময় হার চাপের মুখে আছে। মুদ্রা অবমূল্যায়নেরও প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। তবে মূল্যস্ফীতির চিন্তা করে সরকার টাকার মান না কমিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশি ও রপ্তানিকারকদের আর্থিক প্রণোদনা দিতে পারে। ব্যাপারটি হলো, ব্যালান্স অব পেমেন্ট নিয়ে যে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে তাতে সরকারকে সূক্ষভাবে মোকাবেলা করতে হবে। বাজেটে সরকার এই বিষয়ে কী নীতি গ্রহণ করে তার মধ্য দিয়েই স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যাপারটি বোঝা যাবে।

উৎপাদনশীল খাতের জন্য সরকার কী প্রস্তাব পেশ করে তার মধ্য দিয়েই আগামী বাজেটের স্বাদ বোঝা যাবে; বিশেষ করে দেশীয় বাজারভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য সরকার কী উদ্যোগ নেয়, তা দেখে ব্যাপারটি বোঝা যাবে। চলতি বছরে দু'টি বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। প্রথমত, পাট খাতের দুরাবস্থার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্থিতিশীল অবস্থার প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষেত্রে, আসন্ন বাজেট কি পুঁজি সরবরাহের বাইরে উদ্ভাবনী কোন কর্মসূচি প্রস্তাব করবে? দ্বিতীয়ত, অতি অবহেলিত কৃষি খাত, যেখানে কৃষকেরা ধানের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের জন্য সরকার কী করে। এখানেও নতুনত্বের দরকার। বিপুল পরিমাণে ও অধিক কার্যকরভাবে ধান কেনার প্রতিশ্রুতির বাইরেও বাজেটে কি বাজার ব্যবস্থা কৃষকের অনুকূলে আনার কোনো কার্যকর প্রস্তাব দেওয়া হবে?

পরিশেষে আসা যাক, সর্বশেষ ইন্দ্রিয়ে। আগামী বাজেট কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় তা দিয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে বাজেট সুগন্ধ না কটু গন্ধযুক্ত। সামগ্রিক মানব উন্নয়ন সূচকের প্রেক্ষাপটে প্রধান উদ্বেগের বিষয় হলো শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব। এছাড়াও আয় ও সম্পদের বৈষম্য বেড়ে চলছে, যার ফলাফল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার ঘাটতিতে সুস্পষ্ট। এখন দেখার বিষয়, স্বাস্থ্য বাজেট জিডিপির ১ শতাংশ ও শিক্ষা বাজেট জিডিপির ২ শতাংশের কোটা থেকে বেরোতে পারে কিনা? সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কোন অগ্রগতি হয় কিনা, অনেকে আবার তাও দেখতে চাইবেন।

দেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান নানা চ্যালেঞ্জের কারণে আমাদের উচ্চ মধ্যম-আয়ের দেশ হওয়ার যাত্রাপথ বন্ধুর হয়ে যেতে পারে, মসৃণ ও টেকসই উত্তরণ ব্যাহত হতে পারে। এমনকি পঞ্চেন্দ্রিয়-নির্ভর একটি জাতীয় বাজেটের পক্ষেও তা করা সম্ভব হবে না, যদিও অনেকে এ নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করতে পারেন। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যা অনুভব

করছি তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আমাদের ব্যাপক সংস্কারের দিকে যেতে হবে। এই অপশাসনের যারা অন্তর্নিহিত সুবিধাভোগী, তাদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে এই সংস্কার প্রয়োজন। এর জন্য, আমাদের নতুন অর্থমন্ত্রী এ ব্যাপারে কী 'ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের' পরিচয় দেন, তা দেখার জন্য রহস্যোপন্যাস পাঠের মতো অধীর আগ্রহ নিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

১১ জুন ২০১৯
মানবজমিন

The emerging cracks in our external sector

Mustafizur Rahman

The robust external sector performance has been a strong pillar on which Bangladesh's impressive macroeconomic stability and growth of recent years was founded. The strong performance was underwritten by several factors.

Firstly, the growth and combined earnings of export and remittances contributed to a comfortable current account balance position.

Secondly, the forex reserves had been on a secular rise boosted by inflow of export earnings, remittance flows and inflows of short-, medium- and long-term (MLT) loans.

Thirdly, Bangladesh Bank was able to undertake sterilisation interventions on a regular basis to influence the exchange rate of Bangladeshi Taka (BDT) in a way that arrested the slide of BDT at a time when the real effective exchange rate was on the rise.

Fourthly, the debt and debt-servicing liability remained comfortable in the backdrop of the low levels of foreign loans incurred and utilised, and the concessional nature of the loans.

The emerging cracks

However, in the last couple of years, cracks have started to appear in the external balance which, if not addressed with the urgency the concern deserves, could not only undermine the external sector performance but also put overall macroeconomic stability and the growth narrative under threat.

Firstly, as evidence bears out, since 2011, for the first time, the overall balance was in the red in FY2018, when it was United States dollar (USD) (-) 0.8 billion. This negative position has continued in the first three quarters of FY2019. The negative would have been much higher had the growth of imports not come down significantly, from the high of 25.2 per cent in FY2018 to 5.1 per cent during July-March of FY2019. If imports post higher growth in FY2020, the deficit in trade and current account will rise further. Much will also depend on commodity price movements.

Secondly, the yawning current account gap is, at present, being financed through large inflows in the financial account where the overwhelming share is accounted for not by foreign direct investment (FDI) or portfolio investment, but by the inflow of short and MLT loans. This is corroborated by the fast rising loans in the pipeline which increased from USD 18.1 billion in FY2016 to USD 22.1 billion in FY2017 to USD 35.8 billion in FY2018. One will need to keep in mind that since 2015, because of (lower) middle-income graduation, the cost of Bangladesh's borrowings has been on the rise significantly. Thus, accumulated debt and the debt-servicing liability will rise sharply.

Thirdly, with rising import payments, capacity of forex reserves to underwrite imports has been falling sharply, from eight months' equivalent in FY2017 to only about 5.3 months in March FY2019. At the same time, buyers' credit from the private sector has been on the rise, from USD 3.85 billion in December 2015 to USD 10.2 billion in December 2018. In this backdrop, the capacity of the central bank to continue to

undertake sterilisation interventions in the foreign exchange market, at least on the scale seen in recent past years, may be rather limited.

The cumulative impact of the external sector trends is clearly depicted by the distance between the Seventh Five Year Plan (7FYP) targets and the actual on-the-ground performance. The overall balance in 7FYP was envisaged to be a positive of USD 5.45 billion in FY2019 instead of the negative estimated for this year based on trends so far (for July-March FY2019, the overall balance stood at (-) USD 0.33 billion). Net FDI was projected to be USD 7.4 billion for FY2019 (and about USD 10 billion in FY2020) as against actual figures averaging around less than USD 2 billion annually.

Addressing the emerging tensions

It will not be easy for Bangladesh's policymakers to deal with these cracks. A lot will depend on Bangladesh's capacity to enhance forex earnings from exports and remittances. In a welcome development, export growth rate in FY2019, at about 11.6 per cent in FY2019 (July-April), surpassed the target of 6.4 per cent. Remittances have also posted an impressive growth of 10 per cent over the corresponding period, although the number of workers going abroad in this period has come down by more than 11 per cent. This will likely have a lagged response and slow down future growth.

From a medium-term perspective, the urgency of a push towards export diversification, move up the value chain to more value-added products and skills upgradation towards higher competitiveness cannot be overemphasised. However, in the short-term, the expected deficit in the current account may be brought down by containing imports. As was noted earlier, import growth has come down sharply in FY2019. Fiscal measures are an option. The import tariffs on rice have been raised significantly in recent times to discourage imports. The government may also consider raising import duties on selected luxury items and consumer goods. The other option to discourage imports is to go for

raising letter of credit (LC) margins for imports. Indeed, the Bangladesh Bank has already been resorting to this measure selectively.

As was pointed out, capacity to deploy sterilisation interventions by the Bangladesh Bank has weakened in the face of depleting reserves. Bangladesh's export competitors have gone for significant depreciation of respective currencies over the recent years. Since sharp depreciation will have adverse implications for import payments, inflation and consumer prices and interest payments, a gradual depreciation of the BDT would be the preferred option. Indeed, this has been the strategy pursued by the central bank which needs to be continued. However, debt-servicing liabilities will keep on rising in view of the rising aid flows noted earlier. The apprehension is that if the pressure on the reserves keeps on rising, undertaking sterilisation may become increasingly difficult. Realising the aspirations of 7FYP—to bring in more FDI in the range of USD 7-9 billion annually—must be given top priority to enhance exports and improve the overall balance situation.

There is no easy solution in dealing with the emerging cracks that are weakening Bangladesh's external sector position and performance. How the 7FYP GDP growth targets are being achieved—and even being exceeded—in spite of the disquieting external sector scenario remains a disturbing question though. In recent times, many experts have questioned the GDP growth rate figures on the ground that they do not correspond with key variables contributing to macroeconomic and sectoral performance of the Bangladesh economy, more particularly the investment figures.

As the above discussion bears out, as far as the external sector is concerned, key variables have significantly underperformed in FY2019 against what was projected for FY2019 in the 7FYP (for example, USD 7 billion of net FDI projected in the 7FYP compared to less than the USD 2 billion projected for this year; export projection of USD 47.5 billion in the 7FYP instead of the estimated USD 42.5 billion for this year; positive overall balance projected in 7FYP instead of the negative balance of this

year). The projected net FDI flow during the first four years according to the 7FYP was to the tune of USD 20.2 billion against the realised amount of about USD 7 billion actually received over the corresponding period. At the same time, the GDP growth figure for FY2019 has been estimated to be 8.13 per cent, which is higher than the figure of 7.6 per cent projected for FY2019 in the 7FYP.

Has there been an exceptional growth in capital productivity to sustain such high growth? There is indeed a clear case to revisit the GDP growth estimates.

Policymakers should be concerned about the external sector challenges which come at a time when Bangladesh needs to take adequate preparations to face the implications of the country's dual graduation, with the anticipated rising competitive pressure on export performance because of preference erosion (emanating from the LDC graduation), and the escalating cost and more stringent conditionalities associated with foreign borrowing (originating from the middle-income graduation).

Against this backdrop, concrete initiatives to raise export competitiveness, ensure appropriate use of foreign funds and improve the quality of external sector management cannot be overemphasised.

12 June 2019
The Daily Star

দুর্বল আর্থিক কাঠামোই বড় চিন্তার কারণ

তৌফিকুল ইসলাম খান

নতুন সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নতুন নেতৃত্ব এবং বর্তমান অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি, তিন বিবেচনাতেই আগামী বছরের বাজেট নিয়ে মানুষের মধ্যে এক ধরনের আগ্রহ ছিল। এবারের বাজেট সম্প্রতি দুর্বল আর্থিক কাঠামোর দুষ্টচক্র থেকে বের হবে, এ প্রত্যাশা ছিল সবচেয়ে বেশি। বাজেট যেহেতু মূলত সরকারের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক পরিকল্পনা, তাই এটি যদি সুশৃঙ্খলভাবে না করা হয়, তবে তার প্রকৃত কার্যকারিতা সবসময়ই প্রশ্নের সম্মুখীন থাকে। গত পাঁচ বছরে আয়, সরকারি ব্যয় বা বিনিয়োগের বিচারে বাজেট বাস্তবায়নের হার ক্রমেই কমে আসছে।

পাঁচ বছর আগেও এ হার যেখানে ৯০-৯৫ শতাংশ ছিল, তা এখন ৭৫-৮০ শতাংশে নেমে এসেছে। তাই আগামী অর্থবছরের আয় বা ব্যয়ের পরিকল্পনা প্রণয়নে এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৯ দশমিক ৩ শতাংশ, যা আপাতদৃষ্টিতে খুব বেশি নয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, চলতি (২০১৮-১৯) অর্থবছরে যে রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি অনুমিতি ধরা হয়েছে (৪৬ দশমিক ২ শতাংশ), তা অর্জন করা সম্ভব নয়। সংশোধিত বাজেটে মাত্র ২২ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব কাটছাঁট করা হলেও প্রকৃত পক্ষে রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি ৮৫ হাজার কোটি হতে পারে। ফলে প্রস্তাবিত ১৯ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি বছর শেষে হয়তো ৪৮ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। মনে রাখতে হবে, অর্থমন্ত্রীই গত মাসে সংসদে জানিয়েছেন, এই অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে মাত্র ১১ শতাংশ রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে। একই ধরনের বাস্তবতা সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাংলাদেশের অর্থনীতির বাস্তবতা হলো, আমাদের দেশের অর্থনীতির আকার এবং আমাদের উন্নয়ন অভিলাষের

বিচারে, আমাদের সরকারি আয় বা ব্যয়ের পরিমাণ কিন্তু বেশি নয়। একইভাবে ঘাটতি অর্থায়নের ক্ষেত্রে যে নাটকীয় কাঠামোগত পরিবর্তনের পরিকল্পনা এবারের বাজেটে দেওয়া হলো তা অতীতেও পেশ করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়ন করা যায়নি।

জাতীয় সঞ্চয়পত্রের বিক্রি থেকে নেওয়া ঋণ কীভাবে আগামী অর্থবছরে একলাফে ৪৫ হাজার কোটি টাকা থেকে ২৭ হাজার কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হবে, তার কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। সঞ্চয়পত্রে সুদের হার পরিবর্তনের ঘোষণা বাজেট ঘোষণায় অন্তত পাওয়া গেলো না। আগামী অর্থবছরে ৯৬০ কোটি ডলার বৈদেশিক ঋণ সঞ্চালন করা যে সহজ হবে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ বছরে ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নেওয়ার বিবেচনাও সহজ নয়। বর্তমানে ব্যাংকিং খাতে অনাদায়ী ঋণের পাশাপাশি নতুন করে তারল্য সংকটও দেখা দিয়েছে। বাজার ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে জোর করে সুদের হার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার মাঝে ব্যক্তি খাতে ঋণপ্রবাহ কমে যাওয়া ব্যাংকিং খাতের ভঙ্গুর অবস্থা নির্দেশ করে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ ঋণ সরবরাহ করতে প্রস্তুত আছে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

সত্যিকার অর্থে প্রস্তাবিত বাজেটের আর্থিক কাঠামো অটুট রেখে বাজেট বাস্তবায়ন করতে গেলে ব্যাংকিং খাতে নাটকীয় ইতিবাচক পরিবর্তন দরকার হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলো, ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের জরুরি বিষয়টি বাজেট বক্তৃতায় যথাযথ স্থান পায়নি।

অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় টাকার মুদ্রামান কমিয়ে আনার বিষয়টি আবশ্যক ছিল বলেই আমার মনে হয়েছে। আমি কিছুটা অবাক হয়েছি এটি দেখে যে, বাজেটের সামষ্টিক অর্থনীতির নীতি পরিকল্পনায় বরং টাকাকে আগামী বছর আরো অতি মূল্যায়ন করার অনুমিতি নেওয়া হলো। টাকার অবমূল্যায়নের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তা বাজেটে রপ্তানিকারকদের অতিরিক্ত ১ শতাংশ এবং রেমিটেন্স প্রবাহে ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দেওয়ার প্রস্তাবনা থেকেই স্পষ্ট। ২-৩ শতাংশ টাকার অবমূল্যায়ন করে এ ধরনের রাজস্ব ব্যয়ের চাপ থেকেও বের হয়ে আসা যেতো। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নীতিমালায়ও এ ব্যবস্থা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। বরং এ থেকে যে অর্থ সাশ্রয় হবে, তা দিয়ে সম্প্রতি কৃষকরা ধান উৎপাদনে যে ক্ষতির সম্মুখীন হলো, তাদের এককালীন নগদ ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতো। সিপিডি'র পক্ষ থেকে সম্প্রতি আমরা প্রত্যেক কার্ডধারী কৃষককে ৫০০০ টাকা এককালীন নগদ ক্ষতিপূরণ সরাসরি ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে দেওয়ার প্রস্তাব করি। বাজেটে যদি দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের উপর আয়করের সারচার্জ সীমা বাড়িয়ে প্রণোদনা না দিয়ে আয় বৈষম্য হ্রাসেই গুরুত্ব দেওয়া হতো, তা হলেই তা বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো। ইশতেহারে

দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে নতুন করে ‘কালো টাকা সাদা’ করার সুবিধা সাংঘর্ষিক বলেই মনে হয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বরাদ্দ না বাড়াটা অবশ্যই হতাশাজনক।

বাজেটে যুব উদ্যোক্তাদের জন্য স্টার্ট-আপ তহবিল নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবি রাখে। নতুন মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইনের প্রণয়ন নিয়ে হয়তো এখনও অনেক আলোচনা ও পরিমার্জন প্রয়োজন; কিন্তু ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের ব্যাপারে অর্থমন্ত্রীর নমনীয় মনোভাব এ আইনকে আরো সুসংহত করার সুযোগ রেখেছে। তবে রাজস্ব আদায় এ সংস্কারের পর সত্যিকার গতি পাবে বলে আশা করি।

১৪ জুন ২০১৯
বাংলা ট্রিবিউন

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট কতখানি বাস্তব

ফাহমিদা খাতুন

২০২০ অর্থবছরের বাজেট দেখে আমরা খুব অবাক হয়নি। এটি অনেকটা গতানুগতিক। কেউ কেউ বলতে পারেন যে বাজেটের মাধ্যমে নতুন কিছু করার সুযোগ কম, কারণ এটি কেবল এক বছরের জন্য তৈরী। কিন্তু রাজস্ব সংগ্রহ এবং ব্যয় পরিচালনা বাজেটের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এগুলো দেশের মানুষের উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। এটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। এ কারণেই একটি সুচিন্তিত বাজেট মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ২০২০ অর্থবছরের বাজেটের মূল বার্তাটি কী? এখানে কি ভবিষ্যতের জন্য নতুন কোনো বার্তা রয়েছে? আর অর্থের যে অংক উপস্থাপন করা হয়েছে তার অর্ন্তনিহিত ব্যাখ্যা কি হতে পারে ?

যে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ২০২০ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে তা বোঝা জরুরি। দেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে ২০১৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭.৬ শতাংশ। এই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৮.১৫ শতাংশে পৌঁছেছে। পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পাই, ২০১১ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল ৯২৮ মার্কিন ডলার, যা বেড়ে ২০১৯ অর্থবছরে ১,৯০৫ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। মূদ্রাস্ফীতির হার অবশ্য এখনো সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে যা ৫.৫ শতাংশ। তবে রপ্তানি ও রেমিট্যান্সের আয় কম হওয়ায় বৈদেশিক খাত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। এর ফলে চলতি হিসাব ভারসাম্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন সত্ত্বেও কিছু সামাজিক সূচক, যেমন মাতৃমৃত্যু, সাক্ষরতার হার এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হওয়ার বেলায় ২০২০ অর্থবছরের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তার

চেয়ে আমরা এখনো অনেক দূরে আছি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এখনো পর্যন্ত অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে এবং সমাজে বৈষম্য হ্রাস করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই জনসংখ্যার বিপুল অংশের জন্য উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্থবহ হয়নি।

এবছরে বাজেটের আকার বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ এটি ৫,২৩,১৯০ কোটি টাকা ছুঁয়েছে। তবে এই পরিমাণ এখনো জিডিপির ১৮.১ শতাংশ এবং একটি উদীয়মান অর্থনীতির জন্য যথেষ্ট বড় নয়। ২০১৯ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল জিডিপির ১৮.৩ শতাংশ ছিল যা সংশোধন করে ১৭.৪ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। তার এই বিশাল অর্থের কার্যকারিতা নিয়ে কথাবার্তা তেমন হয় না, যতটা হয় বাজেটের আকার নিয়ে। রাজস্ব আদায় এবং উন্নয়ন ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় না বলে আর্থিক কাঠামো ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। প্রতিটি আর্থিক বছর শেষে বাজেট ঘাটতি ৫ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে থাকে। এর কারণ হচ্ছে সরকারের ব্যয় এবং আয় করার সক্ষমতা কম।

বাজেট ঘাটতি পূরণ করতে সরকার দেশী এবং বিদেশী উৎসের উপর নির্ভর করে থাকে। দেশীয় উৎসের মধ্যে ব্যাংক ঋণ একটি প্রধান উৎস হবে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সঞ্চয়পত্রের উপর সরকারের নির্ভরতা বাড়ছে। কিন্তু সরকারের জন্য এটি একটি ব্যয়বহুল উৎস। ২০২০ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয়পত্র বিক্রয় গত অর্থবছরের তুলনায় ৪০ শতাংশেরও বেশি কমানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে ব্যাংকিং খাত তারল্য সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ঋণের জন্য বেসরকারি খাতের চাহিদা বাধাগ্রস্ত না করে সরকার কীভাবে ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নেবে, তাই এখন দেখার বিষয়।

এবারের বাজেটে কোনো সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেই। বিশেষ করে যে সমস্ত খাত সমস্যায় জর্জরিত সেগুলো কীভাবে সমাধান করা হবে – এবং এর জন্য কি ধরনের সংস্কার প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে বাজেটে কোন দিক নির্দেশনা নেই। সমস্যাসংকুল খাতের শীর্ষে রয়েছে ব্যাংকিং খাত। প্রচুর পরিমাণে খেলাপি ঋণের বোঝা এবং তারল্য সংকটজনিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য পুরো ব্যাংক খাতটিকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রথমবারের জন্য এক ট্রিলিয়ন টাকা অতিক্রম করেছে। ২০১৯ অর্থবছরের প্রথম চতুর্থাংশে বকেয়া ঋণের শেয়ার ১১.৮৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা গত চতুর্থাংশে ১০.৩০ শতাংশ ছিল। ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপির সংস্কৃতি, রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়া ব্যাংকিং খাত নতুন জীবন পাবে না। দুঃখের বিষয়, বাজেটে এমন গুরুতর সমস্যা

সমাধানের জন্য তেমন কিছু নেই। বাজেটে দেউলিয়া আইনের মাধ্যমে ঋণ খেলাপিদের বের করে দেওয়ার পথের কথা বলা হয়, কিন্তু কোনো বিস্তারিত বিবরণ দেয় না।

উচ্চ বাজেটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রাও উচ্চতর নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২০ অর্থবছরে জিডিপির ১৩.১ শতাংশ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ১২.৫ ছিল। গত কয়েক বছর ধরে নির্ধারিত উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সক্ষমতা ছাড়িয়ে গেছে। মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্পূর্ণ অটোমেশন প্রয়োগের মাধ্যমে এনবিআরের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ছাড়া উচ্চতর রাজস্ব আদায় সম্ভব নয়। বর্তমানের নিম্নস্তর থেকে রাজস্ব-জিডিপি কীভাবে বাড়ানো হবে সে বিষয়ে কোনো আলোচনা বাজেটের বক্তৃতায় পাওয়া যায়নি।

বাজেটে ২০৩০ সালের মধ্যে তিন কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে যেখানে জিডিপির ২৩ শতাংশের আশেপাশে বেসরকারি বিনিয়োগ ঘুরপাক খাচ্ছে সেখানে এই অতিরিক্ত কর্মসংস্থান কীভাবে তৈরি হবে তা কিছুটা অস্পষ্ট। নির্দিষ্ট গ্রুপের লোকদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য একশো কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের ধরণ এবং এর সুবিধাভোগী গোষ্ঠীগুলোর বিষয়ে স্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা নেই। এছাড়াও বিপুল সংখ্যক বেকার যুবকের প্রয়োজনের তুলনায় এই বরাদ্দ খুবই নগণ্য। যুবকদের স্টার্ট-আপ-এ মূলধন সরবরাহ করতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। এটি আশা করা যায় যে, এই মূলধনের বিতরণ স্বচ্ছ হবে।

সামাজিক খাত ব্যাপকভাবে সব সরকার দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে। ২০২০ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১৮.২ শতাংশ, যা ২০১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে বেশি। তবে যদি মোট বাজেটের অংশ হিসাবে তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে সময়ের সাথে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে - ২০০৯ সালে যা ছিল ১২ শতাংশ, ২০২০ অর্থবছরে তা ১১.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও ২০২০ অর্থবছরে জিডিপির মাত্র ২.১ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এটি সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম। একইভাবে মোট বাজেটের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য খাতের জন্য বরাদ্দ ২০২০ অর্থবছরে কমে ৪.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা ২০১৯ অর্থবছরে ৫.১ শতাংশ ছিল। প্রকৃতপক্ষে জিডিপির শতাংশ হিসেবে স্বাস্থ্য খাতে বাজেটের অংশটি ২০১৭ অর্থবছর থেকে ০.৯ শতাংশে পড়ে রয়েছে। এটি সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম, যা নির্ধারণ করা হয়েছিল জিডিপির ১.১২ শতাংশ।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ক্ষেত্রে পেনশন বাদে মোট বরাদ্দ জিডিপির মাত্র ১.৮ শতাংশ। এটি সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত জিডিপির ২.৩ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার থেকে অনেক কম। ২০১৯ অর্থবছরে যেমন ঘোষণা করা হয়েছিল, ২০২০ অর্থবছরের বাজেটও তেমনি একটি সর্বজনীন পেনশন প্রকল্পের কথা বলে। তবে এই প্রকল্প গ্রহণের জন্য কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয়নি।

ক্ষমতাসীন দল পরপর বেশ কয়েকটি বাজেট বাস্তবায়ন করেছে, তাই বাজেটে আরো নতুনত্ব আশা করা হয়েছিল। বেশ কিছু বিষয়ে সরকারের রাজনৈতিক অবস্থান থেকে কিছু বিচ্যুতি দেখা যায় যা ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের সময় নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

[*অনূদিত*]

১৫ জুন ২০১৯
দ্য ডেইলি স্টার

এই বাজেট কি পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য হবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জিল্লুর রহমানঃ *বাংলাদেশের আর্থিক খাত এবং সেই সঙ্গে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলার জন্য এসেছেন আজকের অতিথি দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্বাগত আপনাকে।*

আলোচনায় কী হয়

আমরা বাজেট এবং বাজেটকে ঘিরে অনেক আলোচনা করি। আপনারা তো আরো বেশি করেন, নানা রকমের ভবিষদ্বাণী করেন, সরকারের দিক থেকেও নানারকমের ভাষ্য শুনি। কেউ কেউ এখন বলছেন যে আদৌ বাজেটের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। কারণ বাজেট একটি হয় বটে, আমরা আলোচনা করি, সময় নষ্ট করি, কিন্তু অর্থনীতি তো নিজস্ব গতিতে চলে বা যাঁরা চালনা করেন, তারা নিজের মতো করে চালান। প্রকৃত পক্ষে, এখানে বাজেট শেষ পর্যন্ত ভূমিকা রাখে না। দ্বিতীয়ত, এবার আমার কাছে মনে হয়েছে, আমার ভুলও হতে পারে, যে বাজেট নিয়ে কথাবার্তা সরকারের দিক থেকেও আসছে না। অন্যান্য বছর বাজেট নিয়ে যে তৎপরতা দেখা যায়, এবার সেটি দেখা যাচ্ছে না। আমরা শুনছি, বাজেটের আকার ছোট হবে। ইতিমধ্যে আমরা জানি, বাজেট অনুমোদিত হয়েছে। সব মিলিয়ে আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই, এই যে বাজেট নিয়ে এত আলোচনা, সেই আলোচনা আপনি কীভাবে দেখেন? এবং শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা আসবে যে কেমন বাজেট আপনি চান? যদিও বাজেট যা হওয়ার ইতিমধ্যে হয়ে গেছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি বললেন, এবারের প্রাক-বাজেট উত্তেজনা একটু বোধ হয় কম। কথাটা ঠিক। আমরা সম্প্রতি সরকারের ১০০ দিনের মূল্যায়ন করেছি। সেখানে আমি বলেছিলাম, একটি উচ্ছ্বাসহীন, উদ্দমহীন, উদ্যোগহীন ১০০ দিন গেল। এখনো উত্থান দেখলাম না। সেই যে উচ্ছ্বাস-উদ্দমের অভাবটা, এটি কি রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের কারণে, নাকি দেশের পরিস্থিতি এতই সুষম ও সুগম সে কারণে, নাকি আমাদের এই মুহূর্তে চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে অর্থনীতির চেয়ে অন্যান্য বিষয় প্রাধান্য পাচ্ছে, তার কারণে? তবে আপনি যে কথাটা বলছেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাজেটের তাৎপর্য আদৌ থাকবে কিনা, আমি এই মন্তব্যের সঙ্গে আংশিক একমত হয়ে আপনার অন্য একটি মন্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত করছি। সেটি হলো, আপনি বলছেন যে আমরা বাজেট নিয়ে আলোচনা করে অনেক সময় নষ্ট করি। আসলে বাজেট বিশ্লেষণ করা আমার পেশাগত দায়িত্ব।

তিনটি দিক

জিল্লুর রহমান: আমি শুধু অর্থনীতিবিদদের ইঙ্গিত করিনি, আমি আমার মতো লোকদের কথাও বলছি, যারা গণমাধ্যমে কাজ করছেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি মনে রাখবেন, এই আলোচনার ভেতর দিয়ে সরকার কি শুনলো বা না শুনলো তার চেয় বড় বিষয় হলো, আমার নাগরিক চেতনা বাড়লো কি বাড়লো না। মানুষ যে দুঃখ-কষ্ট বা চ্যালেঞ্জের মধ্যে থাকে, এই বিষয়গুলো জেনে তারা স্বস্তিবোধ করেন কিনা। এতে কিন্তু ওই মানুষদের বিষয়গুলো আলোচিত হচ্ছে এবং একইসঙ্গে সে এসবের ব্যপারে আরো সজাগ হচ্ছে।

এবার বাজেটের আলোচনায় আসি, এবারের বাজেটে কিন্তু এক অর্থে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য দিক আছে। বৈশিষ্টের দিক হলো, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হচ্ছে। আমি এই আলোচনাকে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে ভারাক্রান্ত করব না। আপনি আমার উপর আস্থা রাখবেন, যে কথাগুলো বলছি তার পেছনে তথ্য-উপাত্ত আছে। সেটি হলো, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে উচ্চাভিলাষের কথা আমরা বলেছিলাম, প্রতিটি বছরে আমরা কিন্তু ক্রমান্বয়ে সেই সমস্ত প্রাক্কলন থেকে দূরে সরে গেছি এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমরা এখন শেষ করতে যাচ্ছি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য তৈরি হবে, এই দু'টির সংযোগ স্থলে কিন্তু বাজেটটি অবস্থান করবে, এটি হলো একটি। দ্বিতীয়ত, ডিসেম্বরের ৩০ তারিখের নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে যে ইশতেহার এসেছে, সেই দলিলে প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করতে

হবে যে এই বাজেট সেই প্রতিশ্রুতিগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা। তৃতীয়ত, আমরা এমন একটি সময়ে উপনীত হয়েছি, যখন পৃথিবীব্যাপী, বাংলাদেশসহ, আমরা একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে - যেটিকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বলছি - সই করেছি এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে কাউকে পেছনে রাখা যাবে না। অর্থাৎ উন্নয়নকে অবশ্যই পিছিয়ে থাকা মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে।

অর্থাৎ তিনটি জিনিস আমি বলছি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও তার সাথে বৈশ্বিক উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি, যেখানে আমরা কাউকে পেছনে ফেলে রাখব না। তাহলে এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মূল্যায়ন করে দেখছি, বাংলাদেশের আগামী দিনের বাজেটের দু'টি দিক আছে। একটি হলো বাজেটকে কেন্দ্র করে যেসব বিষয়াদি আছে, মানে সামগ্রিকভাবে আয়-ব্যয়ের বিষয়; আরেকটি থাকে বড় আলোচনা, যেটিতে নাগরিকদের আগ্রহ থাকে, সেটি হলো, যেসব আর্থিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে সেগুলো নিয়ে, কোথায় সুবিধা দেওয়া হবে, কোথায় করারোপ করা হবে ইত্যাদি। আরেকটি বিষয়, বাংলাদেশের রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা যেটি আছে, সেটিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বাজেট কতখানি ভূমিকা রাখতে পারে এবং সেখানেই আমি আপনার সঙ্গে আংশিক একমত হয়েছি। আয়-ব্যয় ও যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা আছে, আমরা অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে এখানেই বেশি জোর দিই।

বাজেটের ক্ষেত্রে বলতে হয়, সম্প্রতি বাংলাদেশে সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল। স্থিতিশীলতার লক্ষণগুলো কী? মূল্যস্ফীতি তুলনামূলক কম থাকা, টাকার মূল্যমান বেশি উঠানামা না করা, অথবা সুদের হার খুব বেকিনা হওয়া। যদিও আমরা দেখেছি, হুকুমের অর্থনীতি হিসেবে যে কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ সুদের হার যে হুকুম দিয়ে কমানো যায় না, সেটি আমরা অবশেষে উপলব্ধি করলাম কিনা, তা বোঝার বিষয়। তাই দেখছি যে এবারের বাজেটে তিন দিক থেকে চাপ আসছে এবং এই চাপটা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। প্রথম চাপটা হলো, বাংলাদেশে এখন অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ একটি বড় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। কর আহরণের হার ক্রমান্বয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিচে নেমে এসেছে এবং তার ভেতরে যেটি সমস্যা হলো, প্রত্যক্ষ করের আদায় আরো কমে যাচ্ছে অর্থাৎ পরোক্ষ কর বাড়ছে। পরোক্ষ কর বাড়ছে মানে হলো যার ক্ষমতা নেই সেও দিচ্ছে, যার ক্ষমতা আছে সেও দিচ্ছে। এ ছাড়া এবার যে নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর করা হবে, সেটি আদতে কেমন হবে, তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না।

নতুন ভ্যাট আইন

জিল্লুর রহমানঃ বাজেটের সময় থেকে হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ বাজেটের সময় থেকে হবে। তিন হারের কথা বলা হচ্ছে। আমরা একক হারের পক্ষপাতী এবং তা কম মাত্রায় হতে হবে। এই নতুন ভ্যাট হারগুলো কীভাবে কার উপর গিয়ে কি চাপ তৈরি করবে, সেটি এখনো আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। এটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সরকারও রাজস্ব হারাবে কিনা, সেটিও আমরা এখনো বুঝতে পারছি না। যেহেতু কর আহরণের বড় একটি সমস্যা হয়ে গেছে, তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বিবেচনা করতে হবে। অপরদিকে, যে স্ফীত আকারের উন্নয়ন কর্মসূচী আমরা নিচ্ছি, টাকার অংকে অনেক বড় বড় লাখ কোটি টাকার কথা বলা হয় ঠিকই, কিন্তু আসলে দেশজ আয়ের তুলনায় এটি মাত্র ১৬ শতাংশের মতো। পৃথিবীর বহু দেশ এটি ১৮-২৬ শতাংশ করে থাকে। সেহেতু এটি নিয়ে খুব প্রীত হওয়ার কারণ নেই। সবাই খালি টাকার অংকে দেখে, মিলিয়ে দেখে না যে অর্থনীতি বড় হয়েছে, টাকার অংকে বাজেট তো বাড়বেই।

বাজেটের আকার

জিল্লুর রহমানঃ অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী তো অংকটা তেমন বড় কিছু না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ তাই বাজেটের আয়তনের চেয়ে চিন্তার বিষয় যেটি হলো, এটি আপনি অর্থায়ন করবেন কীভাবে। যেই অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আপনার টাকা পেতে হবে, সেই টাকা তো আপনার নেই, আপনি পারছেন না। আমরা সিপিডি থেকে বছরের পর বছর কর আহরনের প্রাক্কলন নিয়ে গবেষণা করছি এবং দেখা যাচ্ছে, এখন প্রায় ৭০-৮০ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে প্রাক্কলন থেকে। তাহলে তখন কি করছে সরকার? তখন সরকার ঋণ নিচ্ছে, কিন্তু ঋণটা কোথা থেকে নিচ্ছে? সে ঋণ নিচ্ছে ব্যাংক থেকে, সবচেয়ে বেশি নিচ্ছে জাতীয় সঞ্চয়পত্র থেকে। এর ফলে উচ্চমাত্রায় সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে দায়-দেনা বাড়ছে। অথচ, সরকারের কাছে কিন্তু অনেক জমে থাকা বৈদেশিক সাহায্য আছে, সেগুলো ব্যবহার করতে পারছে না। আবার এমন অনেক প্রকল্প আছে, আমি যেগুলোকে বলি 'সুইট হার্ট' ডিল। সেটি হচ্ছে যে আপনি এগুলো নিয়েছেন এবং নামে মাত্র লাখ টাকা বা কোটি টাকা করে ছুঁইয়ে রেখে দিয়েছেন বছরের পর বছর। এই যে রাজস্ব আদায়, সরকারি ঘাটতির ঋণ নেওয়া, পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে না পারা এবং হাজার টাকা মূল্যের প্রকল্পকে আপনি ১০ হাজার টাকায়

নিয়ে যাচ্ছেন, অতি মূল্যায়ন করছেন, এর ফলে ঋণের শেষ হচ্ছে না। এতে করে ঋণের বোঝা বাড়ছে। এই বাজেট এই সমস্যার সমাধান দিতে পারবে কিনা এটি হলো এক নম্বর বিষয়। দুই নম্বরে যেটি দাঁড়াচ্ছে সেটি হলো, ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ স্থবির হয়ে আছে চার থেকে পাঁচ বছর ধরে। দেশজ আয়ের তুলনায় সেটি বাড়ছে না। দেশজ আয়ের তুলনায় স্থবির হয়ে থাকা বিনিয়োগ বাড়াতে হলে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, ঋণ ও মূলধনের বাজার। এই দু'টিকে সব সময় ঠিক পথে রাখতে হয়, চাঙা রাখতে হয়। তাহলে ঋণের বাজারটা কী? ঋণের বাজারটা হলো ব্যাংকিং খাত, ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নিয়েই লোকে বিনিয়োগ করবে। ব্যাংকিং খাতে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ হাজার হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

জিল্লুর রহমান: লাখ হাজার কোটি টাকায়।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: লাখ হাজার কোটি টাকায়। মাফ করবেন। আমি এরপর আর চিন্তাও করতে পারি না। আমরা হিসাব করে দেখেছি সিপিডিতে, যদি ওই অনাদায়ী ঋণ আদায় হতো, তাহলে আমরা শিক্ষা খাতে এখন যে ২ শতাংশের মতো টাকা দিই দেশজ আয়ের, এটিকে ৪ শতাংশ করা যেতো। আর স্বাস্থ্য খাতে যে ১ শতাংশের মতো আমরা দিই, সেটি ৪ শতাংশ করতে পারতাম। তাহলে দেখেন, কোন জায়গাতে অবক্ষয়টা হচ্ছে বা ট্রেড অফটা হচ্ছে এবং ছাড় দিতে হচ্ছে।

অর্থনীতির মূল জায়গাগুলো ঠিক রাখা

জিল্লুর রহমান: এখন অনাদায়ীটা আদায়ের জন্য নতুন......

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সরকার প্রথমে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিল পরবর্তীকালে তার একদম উল্টো পথে যাত্রা শুরু করেছে। আমি এখন আলোচনা করব কেন এসব হচ্ছে। এবং এর ফলে সমাধান হবে না। এই বাজেট কী এটির সমাধান দিতে পারবে? পারবে বলে এখনো মনে হচ্ছে না। পুঁজিবাজার দেখেন, নির্বাচনের আগে এটিকে তোলা হয় নির্বাচনের পর আবার এটির পতন হয়, আজেবাজে সমস্ত প্রকল্পকে অনুমোদন দিয়ে বাজারে আনা হচ্ছে এবং এর স্বচ্ছতা নেই, লোকের আস্থা নেই এবং লোকের কাছে এটি একটি ফাটকাবাজির জায়গায় পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাজার পৃথিবীর সব জায়গায় দীর্ঘমেয়াদী জায়গা: বন্ডস, সিকিউরিটি ইত্যাদি। তাহলে এবারের বাজেট কি পুঁজিবাজারকে সুস্থ ধারায় নিয়ে আসার জন্য এমন কিছু দিতে পারবে? কিংবা ব্যাংকিং খাতকে? তৃতীয় যেই জায়গাটায় আসছি সেটি হলো, ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক

বাণিজ্যের ঘাটতি বাড়ছে। বিশেষ করে চলতি যে হিসাবটা আছে, যেখানে আমরা বিভিন্ন অর্থ পাই এবং অর্থ পাঠাই, সেই হিসাবে ক্রমান্বয়ে ঘাটতি বাড়ছে। এটির একটি বড় কারণ হলো, এবারের আমদানি গত বছরের চেয়ে একটু বেশি হলেও প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭/৮ শতাংশের মতো। এই আমদানি বৃহৎ আমদানি এবং আগে আমরা মনে করেছিলাম, বড় বড় প্রকল্প হচ্ছে, বড় বড় প্রকল্পের জন্য আমদানি করা হচ্ছে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তার বাইরেও হচ্ছে। সেটি কী? ব্যাপারটি হলো, টাকা বিদেশে নেওয়ার জন্য এর গভীরে কিছু হচ্ছে কিনা, সেটি আমরা বুঝতে পারছি না। আমদানি বাড়ছে রপ্তানির চেয়ে বেশি। রেমিট্যান্সের টাকা আমরা রেখেছিলাম, কিন্তু তারপরও টাকার উপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। টাকা এখন প্রকৃত মূল্যমানের দিক থেকে প্রতিযোগী দেশগুলোর উপরে আছে। অর্থাৎ এটিকে নিচে আনতে হবে। এখন ৮৫ টাকা যদি থাকে, সেখানে ৮৬/৮৭ টাকা দিতে হবে। কিন্তু টাকাকে যদি আপনি নিচে নামান, তাহলে অবশ্যই আপনার আমদানিকৃত পণ্যের দাম বাড়বে। ফলে এখানে মূল্যস্ফীতি হবে। দেখুন, বিজিএমই ৫ শতাংশ বিশেষ প্রণোদনা চেয়েছে। এখন প্রণোদনার টাকা দিবেন নাকি টাকার মূল্যমান সমন্বয় করবেন, এটি একটি বড় বিষয়। আর এর ভেতরে যে বড় বড় ঋণ নেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে চীন এবং অন্যান্য দেশ থেকে, এই ঋণের দায়-দেনার পরিস্থিতি বর্তমানে ভালো থাকলেও ২-৩ বছরের মধ্যে অনেক দুর্যোগ হতে পারে। এটি শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, দুই বছরের মধ্যে কীভাবে পরিস্থিতি পাল্টে গেল। সেহেতু, আমি যেটি আজকে বলতে চেয়েছি সেটি হলো, এই বাজেটকে আমি বলছি যে ত্রিশূলের উপর আছে, তিনটি বড় ধরনের আক্রমণ এর মধ্যে আছে। এর একটি হলো, রাজস্ব আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতি। দ্বিতীয়ত, ব্যাংকিং খাত ও পুঁজিবাজারে এই মুহূর্তে যে অসুস্থতা এবং তৃতীয়ত হলো বৈদেশিক ভারসাম্যে যে চাপটি সৃষ্টি হয়েছে এর ফলে টাকার মান, মূল্যস্ফীতি ও সুদের হার – তিনটিই কিন্তু একটি আরেকটির সাথে যুক্ত। বিষয়টা হলো, নতুন অর্থমন্ত্রী এই ত্রিধারার সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করবেন, সেই রণকৌশলটা দেখার অপেক্ষায় রয়েছি।

জিল্লুর রহমান: উনাকে সমঝোতা করতে হবে...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এখন সমঝোতা যদি করতে হয়... সমঝোতা তো করবেন না, সমন্বয় সাধন করতে হবে। সেরকম বিভিন্ন ধরনের চিন্তা আমরা দেখছি। উনারা মনে করছেন, হয়তো বিশেষ বিশেষ কিছু গোষ্ঠীকে যদি ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়, তাহলে বোধহয় আদায় বাড়বে। এটি অনেকটা এরকম যে আপনার যদি জ্বর অনেক বেশি হয় এবং আপনি অ্যান্টিবায়োটিক বা ওষুধ না খেয়ে জলপট্টি দিয়ে মনে করেন যে জ্বর কমে যাবে,

তাহলে তো কিছু হবে না, কারণ ভেতরে তো বিষক্রিয়া চলছে। সেহেতু আপনি রোগের চিকিৎসা না করে শুধু উপশমের মাধ্যমে রোগ সারানোর চেষ্টা করলে সমাধান হবে না।

খেলাপিদের সুবিধা দেওয়া ও ক্ষমতাসীন দলের শ্রেণিভিত্তি পরিবর্তন

জিল্লুর রহমান: কিন্তু আপনি কী মনে করেন, যে সুবিধাটা সরকার দিচ্ছে, তাতে এই খেলাপি ঋণ আদায় করা সম্ভব? এটি একটি দিক। আরেকটি দিক হচ্ছে, যারা নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করতেন, তারা তো নিরুৎসাহিত হবেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যারা নিয়মতি ঋণ পরিশোধ করছে, তাদের চেয়ে বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাদের, যারা ঋণ পরিশোধ করছে না। তাহলে তো সবারই এখন খেলাপি হয়ে যাওয়াটা বাঞ্ছনীয়। আমি যে বিজনেস মডেল দেখি তাতে তো খেলাপি না হওয়াটা হলো বোকামি। আপনি যদি শাস্তি না দেন, আপনি যদি আয়কর না দেন ঠিক মতো যা আপনার ঠিকঠাক দেওয়ার কথা, খেলাপি ঋণ যার ফেরত দেওয়ার কথা কিন্তু সে যদি না দেয়, আর সে যদি আমদানির নামে টাকা পাচার করে এবং এই গোষ্ঠীকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা না হয়, তাহলে যে বাংলার কথা আমরা চিন্তা করি, ২০৪০ সালের কথা, কী সুবর্ণজয়ন্তীর কথা, তা হবে না। এসবের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এমনকি এটি নির্বাচনী ইশতেহারের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা সরকার যেটি বলবে, তার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে এটি কেন হচ্ছে? এটি হচ্ছে খুব সাধারণ কারণে, এটির একটি রাজনৈতিক অর্থনীতি আছে। সেটি কী? বিগত সময়ে যারা বিভিন্ন ধরনের অশুভ বা অন্যায্য সুবিধা নিয়েছে, তারা পরিবর্তন আনতে দিতে নারাজ এবং দুঃখজনকভাবে হলেও সত্য, বর্তমান সরকার নতুনভাবে ম্যান্ডেট নিয়ে আসার চেষ্টার ভেতর দিয়েও এদের মোকাবেলা করার মতো রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করেনি। যেহেতু রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করেনি, সেহেতু তাদের কাছে এখনো জিম্মি। এখন জিনিসটা খুব পরিষ্কার হচ্ছে যে, আপনি এই বাজেট এবং পরবর্তী নীতিমালা কার সঙ্গে পরিচালনা করবেন। এই জন্যই আমরা বলেছি, বাজেটের এবার একটি বড় বিষয় হলো পিছিয়ে পড়া মানুষের পক্ষে আপনি কাজ করবেন কিনা। দেখেন, বাংলাদেশের দারিদ্র্য কমেছে, কিন্তু তারপরও এর মধ্যে যে মানুষগুলো আছে, সেই গরিব মানুষের সন্তান জন্মকালে মারা যায় হাজারে ৬৩ জন। আর হয়তো আপনার আমার পরিবারের মধ্যে এটি ২০-এর কাছাকাছি হবে, এটি হলো *এডুকেশনাল অ্যান্ড হেলথ অ্যাটেইনমেন্টের আউটকামসের* দিক থেকে। গরীব মানুষের মেয়েগুলোকে আমরা দেখছি, তারা ৪০ শতাংশের বেশি ঝরে পড়ছে স্কুল

থেকে। তার উপর তো সরকার বিয়ের বয়স কমিয়ে দিয়েছে, ফলে বিয়ে শাদির ক্ষেত্রেও একটি চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এর পাশাপাশি দেখেন কৃষকদের সমস্যাটি। আমদানিকারকদের স্বার্থের কাছে কৃষকদের স্বার্থ কিন্তু বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ এই কৃষকেরই কিন্তু ভোট দেওয়ার কথা, তাই নয় কি? বঙ্গবন্ধুর আমল থেকে কৃষক বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের অনেক বড় শক্তি ছিল। বর্তমান ক্ষমতাসীন দলকে আমরা যখন বিশ্লেষণ করতাম, শ্রেণি বিশ্লেষণ করতাম, আমরা বলতাম যে এই দলটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের দল। আমরা বলতাম, বিকাশমান মধ্যবিত্তের দল, এটি কৃষকের পক্ষের দল, শ্রমিকের পক্ষের দল। এখন কি সেটি বলতে পারব? এই বাজেট বা এই নীতিমালা কি সেটি প্রকাশ করবে? আমি তো বঙ্গবন্ধুর ছায়া খুঁজে বেরাচ্ছি এটির মধ্যে, উনি থাকলে কী বলতেন? উনি থাকলে হয়তো এই নির্বাচনী ইশতেহারে যা আছে তাই বলতেন, কিন্তু নির্বাচনী ইশতেহারের সঙ্গে বাস্তবতার অনেক অসঙ্গতি দেখতে পাচ্ছি।

এখন বিষয় হলো, তাহলে সমাধানের রাস্তা কী? সমাধানের রাস্তা ছিল এক, যদি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ভূমিকা রাখতে পারতেন, ভালো হোক মন্দ হোক, উনারা সংসদে আছেন, কৃষকের স্বার্থ নিয়ে কেন উনারা বড় পরিসরে নামলেন না? উনাদের কী বোঝা উচিত ছিল না যে শুল্কটা আরোপ করা হলো এই দুই সপ্তাহ আগে, এটিকে ছয় মাস আগে করা উচিত ছিল এবং এই যে এখন রপ্তানির আলোচনা হচ্ছে, রপ্তানির আলোচনা করতে হলে কী কী প্রস্তুতির দরকার হয়, এটি কি চাইলেই বিদেশে পাঠানো যায়? আজকালকার দিনে মাননিয়ন্ত্রণ অনেক শক্তিশালী, এই চালের ভেতর থেকে দশ রকমের আর্সেনিক বের করে দেবে। এই জায়গায় আমার যেটি বড় বিষয় মনে হয় সেটি হলো, নতুন মন্ত্রী এসেছেন, সেহেতু প্রত্যাশাও অনেক বেশি। আমি বহু মন্ত্রীর সঙ্গে কাজ করেছি, বিগত ২০/২৫ বছরে তো কম হলো না। আমি দেখেছি যে অর্থমন্ত্রীরা মন্ত্রীসভায় জোরালো ভূমিকায় থাকেন। আমি কিবরিয়া সাহেবকে দেখেছি, আমি সাইফুর রহমান সাহেবকে দেখেছি। উনারা পুরো কেবিনেটের বিরুদ্ধে গিয়ে যেটিকে সঠিক মনে করছেন সেটির পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীরা উনাদের কথা মেনেছেন। কারণ, নৈতিকতার দিক থেকে এবং রাজনৈতিক দিক থেকে দু'টিই উনারা সঠিকভাবে বলেছেন এবং এটি একটি বড় বিষয় ছিল। পরবর্তীকালে আমরা যেটি দেখেছি, অর্থমন্ত্রীদের যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা যেসব নীতি প্রণয়নে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা, সেটি আর থাকেনি। তাদের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে ম্লান হয়ে গেছে। আপনি যদি আমাকে বলেন, বর্তমান অর্থমন্ত্রীর কাছে আপনার প্রত্যাশা কী? আমার সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা হলো, অর্থনৈতিক নীতিমালায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের যে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা, সেই ভূমিকা পুনস্থাপন করা। বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অসহায়ের মতো কথা বলে, অনেক সময় উপর থেকে আসে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর অনেক বেশি ক্ষমতাবান হয়েছে। সে জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে সঠিকভাবে নীতিমালা প্রণয়ন করতে দেখা যায় না।

জিল্লুর রহমান: না মানে আপনি কি এই বোঝাতে চাচ্ছেন যে আর্থিক খাত আসলে অন্যান্য সকল খাতকে প্রভাবিত করে ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক হোক...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আর্থিক খাতগুলো আপনার এই ধমনীর রক্তপ্রবাহ। এটিকে সচল রাখতে হবে। আমার কথা হলো এখানে একটু সাহসিকতা এবং নেতৃত্বের বিষয় রয়েছে এবং আমার বিশ্বাস যে এরকম একটি নেতৃত্ব পেলে নিঃসন্দেহে খুশি বৈ অখুশি হবে না।

জিল্লুর রহমান: এখানে একটি প্রশ্ন, আপনি বড় বড় প্রকল্পের কথা বলছিলেন। আমরা সরকারি ভাষ্য শুনছি, দেশে প্রচুর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হচ্ছে, এরকম উন্নয়ন আগে কখনো হয়নি, ভবিষ্যতেও কখনো হবে কিনা – যদি উনারা না থাকেন – এটিও নিশ্চিত করে বলা যায় না। এবং একধরনের শ্লোগানও আমরা শুনছি যে কয়েক বছর ধরে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। এই যে বড় বড় প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে কিন্তু তা সেই অর্থে শেষ হচ্ছে না। কিছুটা প্রকল্পের ব্যয়, প্রকল্পের সময় ও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে এই প্রকল্প কতটা প্রভাবিত করছে এসব বুঝতে হবে, বাজেটেও এর একটি বড় প্রভাব আছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি ভালো বিষয় উত্থাপন করেছেন। বড় প্রকল্পের বিষয়ে আমি তিনটি দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। একটি হলো বড় প্রকল্পের অতি মূল্যায়ন এবং এই অতি মূল্যায়ন হচ্ছে দুই কারণে। প্রথমত, আপনার বাস্তবায়নের সক্ষমতা কম থাকায় সময় বেশি লাগছে, আরেকটি হলো নিতান্তই শঠতা। বালিশ অর্থনীতির কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই।

অবকাঠামোভিত্তিক উন্নয়ন টেকসই হয় না

জিল্লুর রহমান: হ্যাঁ, রুপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটি হলো একটি দিক। আরেকটি দিক হলো, এগুলো আপনি কীভাবে অর্থায়ন করছেন। একটি তো হলো দাম, আরেকটি হলো অর্থায়ন। এই অর্থায়ন কী মূল্যে আপনি নিয়ে আসছেন, সেটিও অনেকের কাছে পরিষ্কার নয়। ২ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প ১২ বিলিয়ন ডলার হয়ে যাচ্ছে। সেই ঋণের কে কতটা দেবে এবং কীভাবে শোধ দিতে হবে, কত বছর ধরে দিতে হবে, কোন প্রজন্ম দেবে এবং এটি ব্যবহার করতে কি লাগবে, এগুলো আমরা বলেছি। দ্বিতীয়ত হলো অর্থায়ন। তৃতীয়ত হলো, টেকসই হবে কীভাবে? সম্প্রতি শ্রীলংকার রাজাপাক্ষে থেকে তুরস্কের এরদোয়ান – সবাই কিন্তু

উন্নয়নের চটজলদি পথ হিসেবে রাষ্ট্রীয় খাতের অর্থায়নে অবকাঠামো তৈরিকে বড় মনে করেছে। এরদোগান যে এবার নির্বাচনে রাজধানীতে হেরে গেলো, যদিও নির্বাচন আবার বাতিল করছে সেটি অন্য বিষয়, এর বড় কারণ হলো তাদের ওখানে স্থবিরতা এসেছে। কারণ আপনি অর্থায়ন যেভাবে করেন, তা থেকে আয় সেভাবে হয় না। পদ্মা সেতুর টাকা উঠানোর আগে দায়-দেনা শোধ করার সময় চলে আসবে। তাই বলছি যে গার্মেন্টসের বাইরে অন্য শিল্প গড়ে না উঠলে এবং সেই শিল্প যদি অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান তৈরি করতে না পারে, তাহলে সমস্যা হবে। আবার দেখছি যে, যারা রপ্তানি করেন, তারা সোচ্চার। তারা প্রণোদনা চাচ্ছেন। আমরা হিসাব করছি ওটা কত কোটি টাকা হবে এবং সেটি স্বাস্থ্য বাজেট বা খাদ্য বাজেটের তুলনায় কতখানি হবে। এর তুলনায় যারা ছোট শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, গ্রামীণ অকৃষি খাতের সঙ্গে যুক্ত, তাদের কণ্ঠস্বর নেই। বাজেট শেষ পর্যন্ত কিন্তু রাজনৈতিক অর্থনীতি। সেটি হলো যে শ্রেণি, দল বা বর্গ উচ্চস্বরে কথা বলতে পারবে এবং ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কাছ থেকে তাদের জন্য মুখপাত্র বের করে আনতে পারবে, তারা অনেক বেশি ভাগ পাবে, বাজেটের টাকার অংশ হিসেবে। যদি কথায় না হয় তবে বাস্তবে বাকিরা প্রকৃত অর্থেই বঞ্চিত হবে। বাংলাদেশের উন্নয়নের যে বিরাট কিংবদন্তি আমরা রচনা করেছি, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সত্যতা আছে, কিন্তু কিংবদন্তির নায়ক যারা, তারাই সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। কারণ, বিকাশমান মধ্যবিত্তে নিচের ৪০ শতাংশ মানুষের আয় কিন্তু মোট দেশজ আয়ের মধ্যে বাড়ছে না। আর তার নিচে যে ১০ শতাংশ, তাদের আয় আরো কমেছে। সুতরাং বাড়ছে কেবল উপরের ১০ শতাংশের। এ রকম একটি বৈষম্যপূর্ণ সমাজ যদি আমাদের গড়ে উঠে, তাহলে সেই সমাজের প্রবৃদ্ধি টেকানো কষ্টকর। তাই এবারের বাজেটের কাছে যে উত্তরটি আমরা সবাই খুঁজতে চাইব, আমি চাইব অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে, এই উন্নয়নের কিংবদন্তির দ্বিতীয় অধ্যায় রচনা করতে হলে যে ধরনের মঞ্চসজ্জা লাগে, সেই মঞ্চসজ্জা উনি দেবেন কিনা? এই মঞ্চসজ্জা আশা করছি কারণ, নতুন সূত্রধর এসেছেন একজন। এই নতুন সূত্রধর কী মন্ত্র পাঠ করেন সেটি দেখার আকাঙ্ক্ষা আমার আছে। মনে করছি যে উনি বড় বিবেকের ভূমিকায় সামনে আসবেন।

অর্থনীতি ও ভূরাজনীতি

জিল্লুর রহমান: এখানে আরেকটি প্রশ্ন আছে, যেটি আপনি খানিকটা ইঙ্গিতও করছেন, রমরমা অর্থনীতির কথা বা উন্নয়নের কথা আমরা শুনি। তার পাশাপাশি আমরা দেখছি বৈদেশিক নির্ভরতাও বাড়ছে। সে কারণে আমরা যদি কূটনৈতিক বিবেচনা থেকে দেখি, আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত এবং তার সঙ্গে আরেক প্রতিবেশী চীন, তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ একটি ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে। সেটি নিয়ে আমরা অনেক

প্রশংসাও শুনেছি, কূটনীতিকরাও করেছেন। তবে এখন দেখা যাচ্ছে, অর্থনীতির ব্যাপারে বা নানা ব্যাপারে চীনের উপর অনেক বড় নির্ভরতা বাংলাদেশের তৈরি হয়েছে। সেটি নিয়ে আমরা অন্যদের অনেকটা অসন্তুষ্টি দেখতে পাই। চীনের এসব ঋণের অভিজ্ঞতা খুব একটি সুখকর নয়। আপনি শ্রীলংকার কথা বলছিলেন। আফ্রিকার অনেক দেশের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। আবার প্রধানমন্ত্রী জাপান গেলেন, সেখানে একটি বড় চুক্তি হলো। সব মিলিয়ে সেটি কী চীনের উপর নির্ভরতা কমানোর উদ্যোগ কিনা, অনেকে প্রশ্ন তুলছেন। সব মিলিয়ে আমি বুঝতে চাইছি যে আমাদের অর্থনৈতিক নির্ভরতা, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক সব মিলিয়ে এবং এই যে ভারত, চীন এখন জাপান কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, এই জায়গায় বাংলাদেশের অবস্থানটা কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ভারত ও চীনের ক্ষেত্রে যেই পরিবর্তনটা বাংলাদেশের হয়েছে, তার আগে চীন ও ভারতকে বুঝতে হলে আপনি দুইভাবে বুঝতে পারেন। তারা যে যার পেছনের চারণভূমিতে প্রতিযোগিতা করে, বাংলাদেশকে তারা হয়তো তাদের চারণভূমি হিসেবে দেখে। আরেকটি জিনিস তারা করে, আন্তর্জাতিকভাবে তারা অবশিষ্ট বিশ্বের সঙ্গে সহযোগিতা করে। তারা কিন্তু দ্বৈত পরিস্থিতির মধ্যে থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারত ও চীনের অবস্থান আমি যেটুকু বুঝি তা হলো, ভারত আগে অনেক বেশি নিরাপত্তা স্থিতিশীলতা বা তার শান্তি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চিন্তিত ছিল। বাংলাদেশ থেকে তাদের প্রতি বৈরী আচরণ হচ্ছে কিনা, এটি তাদের কাছে বড় বিষয় ছিল। সেই ভারত আগের চেয়ে অনেক বেশি অর্থনীতির বিষয়াদি অর্থাৎ ট্রানজিট থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক অঞ্চল বানানো ইত্যাদিতে যুক্ত হয়ে গেছে। আর চীন আগে অনেক বেশি বাণিজ্যিক চিন্তা ধারায় নিয়োজিত ছিল এবং আমাদের প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং অন্যান্য চুক্তি, গার্মেন্টসের আমদানি ইত্যাদি ব্যবসা পেলে খুশি থাকত। ইদানীং ভারত অর্থনীতিতে এসেছে আর চীন আগের চেয়ে বেশি রাজনীতিতে মনোযোগ দিচ্ছে। কিন্তু তাদের যে আগে একধরনের ডিভিশন অব লেবার বা শ্রম বিভাগ ছিল, সেই শ্রম বিভাগ এখন আর থাকছে না। অর্থাৎ যে রাজনীতি করতেন, তিনি বুঝেছেন যদি রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী না হই তাহলে রাজনীতি টিকাতে পারব না। আর যিনি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী আছেন তিনি ভাবছেন, তার অর্থনৈতিক সম্পর্ক টেকসই থাকবে না যদি পছন্দমতো রাজনীতি না থাকে। অবশ্যই এর ফলে দেশের ভেতর একধরনের সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি হচ্ছে। সুখের বিষয় হচ্ছে, আমাদের সরকার এই পর্যন্ত শুধু এই দুই দেশ নয়, একইসঙ্গে সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশ যেমন, জাপান কিংবা ইউরোপের সব দেশের সঙ্গে ভারসাম্য নিয়ে চলতে পারছে। আমি এখন অর্থনীতিতে ফিরে আসি, আমাদের যেটি বোঝার ব্যাপার তা হলো, অর্থনীতিতে যদি সুশাসন না থাকে এবং এর মধ্যে যদি আইনানুগভাবে এবং নীতিনিষ্ঠভাবে কর্মকাণ্ড না ঘটে, তাহলে এদের

হস্তক্ষেপ করারও সুযোগ বেশি থাকে এবং এদের অসন্তোষেরও সুযোগ বেড়ে যায়। কারণ আপনি বলতে পারবেন যে আমি এই প্রকল্পটা আপনাকে দিইনি উনাকে দিয়েছি কারণ হলো, আমি খুব সৎভাবে টেন্ডার সম্পন্ন করেছি। এটি যদি না বলতে পারেন, আর ওই টেন্ডারের পেছনে যদি ব্যক্তি বিশেষ থাকে, অন্যদের সামনে আপনি সরকার হিসেবে দুর্বল হয়ে যাবেন এবং সেটির ফলাফল কিন্তু অন্য জায়গায় প্রতিভাত হবে। এটি যে ওই টেন্ডারেই হবে তা নয়, ওটা নানা পথ ঘুরে আপনার কাছে আসবে, আর আপনি টেরও পাবেন না কোথা থেকে আসছে। আমি আবার ফিরে আসি, এসব জিনিস মোকাবেলা করার জন্য সবচেয়ে ভালো হলো নীতিনিষ্ঠ থাকা, প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকা, স্বচ্ছতার মধ্যে থাকা। আপনি এখন আনসলিসিটেড প্রকল্প নিচ্ছেন অর্থাৎ আপনি চাননি তবু এই প্রকল্প চলে আসছে। বাজেটের মধ্যে নেই, এডিপির মধ্যেও নেই। অর্থাৎ কোনো ধরনের প্রতিযোগিতা হলো না, টেন্ডার হলো না বা আদৌ আপনার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এসব বিবেচনা না করে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটে অর্থাৎ সরবরাহকারীর টাকায় আপনি তার জিনিস তার কাছ থেকেই কিনছেন এবং আবার তাকেই ঋণ শোধ দিচ্ছেন, এ রকম পরিস্থিতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সে জন্য আমার সাধারণ ধারনা, সরকারের ক্রয়নীতির আওতায় আরো স্বচ্ছতার সঙ্গে সব কিছু করা উচিত। সরকারের মন্ত্রীসভার যে কমিটি আছে তাকে আরো যৌক্তিকভাবে মনযোগী হয়ে এই জিনিসগুলো বিবেচনায় নিতে হবে। আর অবশ্যই এর উপর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা তো থেকেই যায়। কিন্তু এটি বাংলাদেশের জন্য নতুন একটি বিষয়। আগামী দিনের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক পরিস্থিতি – সবকিছুতে বৈদেশিক নীতির আলোকে মনোযোগ দিতে হবে।

সফলতার মূল্য

জিল্লুর রহমান: আরেকটি বিষয় আমি একটু বুঝতে চাই, বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশ নানাভাবে নানারকম প্রতিযোগিতার মধ্যে আছে, হুমকির মধ্যেও আছে কোথাও কোথাও। সেটি আপনি কীভাবে দেখেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশকে তো কিছুটা সাফল্যের মূল্য দিতে হচ্ছে, কারণ বাংলাদেশ আগামী ছয় বছরের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে যাবে। আর আমরা তো নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে ২০১৫ সালে ঢুকে গিয়েছি, যদিও আমাদের মন্ত্রীরা প্রায়ই বলেন, ২০২১ সালে ঢুকব। উনারা কী বুঝে বলেন নাকি না বুঝে বলেন, আমি জানি না।

জিল্লুর রহমান: উনারা আসলে বোঝাতে চেয়েছেন মধ্যম আয়ের। উনারা বলেন মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত বিশ্ব।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না না, মধ্যম আয়ের বলে কিছু নেই। আছে নিম্ন মধ্য-আয় ও উচ্চ মধ্য-আয়। যাই হোক, এই বিভ্রম থেকে তাদের বের হতে হবে। আমি দেখেছি যে লিখিত বক্তব্যের মধ্যে এসব ভুল থাকে। এগুলোর কারণে আমরা বিভিন্ন ধরনের সুবিধা হারাব। এখন ওই সুবিধা হারানোর ফলে কী অবস্থা হতে পারে? বিশেষ করে আমাদের বেশি মূল্যে টাকা নিতে হবে, রপ্তানির ক্ষেত্রে হয়তো শুল্ক দিতে হবে, মেধাসত্ব ব্যবহার করলে সেটি মূল্য দিয়ে কিনে আনতে হবে। এটির জন্য একধরনের কথা আছে, কিন্তু বাস্তবে আমরা সেই প্রস্তুতি দেখি না। এখনো কেনো যেন এগুলোকে দূরবর্তী জিনিস মনে হয়। আমরা যেটি বলতে চাই তা হলো, এই যে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলার পক্ষে যদি আপনি দাঁড়ান, তাদের যদি উৎপাদনশীলতা বাড়ান, আমি কৃষকের কথা বলছি, ওই গার্মেন্টস শ্রমিককে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দিতে বলছি। আমরা বলছি, যারা পিছিয়ে আছে, যেমন নদীর চরের মানুষ, হাওড়ের মানুষ – এসব মানুষের দিকে যদি আপনি নজর দেন, তাহলে এই বিষয়গুলো মোকাবেলা করার শক্তি সমাজের অনেকটাই বাড়ে। এই শক্তি বাড়াতে গেলে আপনার সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল রেখে বাড়াতে পারবেন, এই ধারণা ব্যাকরণে মেলে না। এই মানুষগুলোর কণ্ঠস্বর যদি সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারকদের কাছে না পৌঁছায়, অর্থাৎ সুবিধাভোগী মানুষগুলো যদি নীতি নিয়ন্ত্রণ করে, আর খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষগুলোর কণ্ঠস্বর তাদের কানে এসে না পৌঁছায়, তাদের যদি কেউ ধারণ না করে, তাহলে আরো বড় ধরনের হতাশা সৃষ্টি হয়। আজকে আপনি বাজেটের কথা বলছেন, কিন্তু সব বিষয় ঘুরে ফিরে রাজনীতি ও অর্থনীতিতেই যাবে।

জিল্লুর রহমান: এই যে হতাশার কথা আপনি বলছেন, হতাশাগ্রস্ত মানুষতো নিজেকে একসময় শেষ করে দেয়, তাতে অনেক সময় অন্যের ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না বা অন্য কেউ সেটি অনুভবও করে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তাই কী? ইতিহাসে আমি দেখেছি, ধৈর্য্য ধরতে হয়, আপনি যে বিষয়টিতে বিশ্বাস করেন, সেটিতে আস্থা রাখতে হয়, ইতিহাসের জ্ঞান থেকে পথ নির্দেশনা নিতে হয় এবং সেটি নিয়ে আগামী দিনের জন্য চেষ্টা করতে হয়। আপনি বলেছিলেন না যে এই আলোচনা করে সময় নষ্ট হয়, আমি মনে করি না সময় নষ্ট হয়। এক নম্বর কারণ হলো, এই মানুষগুলো যে এখনো জাগ্রত আছে তার চেতনাতে, এটি যে কেউ ধারণ করে তা দেখলে সে সাহস পায়। সেই সাহস থেকে একাধিক মানুষ উজ্জীবিত হলে আন্দোলন সংগ্রাম হয়। সেহেতু আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত হওয়ার জন্য যে উপলব্ধিটা দরকার সেটি এই আলোচনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। এই উপলব্ধি কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না, এই যে বললেন নিজেই নিজেকে শেষ করে দেয়, কিন্তু যতক্ষণ ওই উপলব্ধিটা আছে, চেতনাটা আছে, ততক্ষণই ভরসা থাকে।

রাজনীতি ও অর্থনীতি

জিল্লুর রহমান: একটি দেশে যখন রাজনীতি নিরুত্তাপ থাকে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন উদ্যোগহীনতা, উদ্দ্যমহীনতা, উদ্দীপনাহীনতা বলছেন, রাজনীতিতেও তাই এবং দু'টি প্রধান ক্ষেত্রে যদি এই অবস্থা বিরাজ করে, তবে সেই দেশের ভবিষ্যৎ আসলে কী দাঁড়ায়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তাহলে বুঝতে হবে, রাজনীতিতে সমস্যা আছে। তার মানে বুঝতে হবে, যে রাজনীতি মানুষকে উদ্দীপনা দেয় না, আশা দেয় না বা তার মন ছুঁতে পারে না, তাহলে সেটি রাজনীতি নয়। একধরণের রাজনীতি আছে মূলধারার রাজনীতি। আপনি লক্ষ্য করে দেখেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের অভিজ্ঞতা হলো, প্রচলিত ধারার রাজনীতিতে মানুষ এখন আস্থা রাখছে না, এটি এখন পরিষ্কার। ডাকসু আন্দোলন, বাচ্চাদের নিরাপদ সড়কের আন্দোলন, কোটা আন্দোলন, ইত্যাদির ভিতর দিয়ে এটি হয়েছে; অর্থাৎ হঠাৎ করে রাজনৈতিক আন্দোলনের জায়গায় যেন সামাজিক আন্দোলনের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ইলেকশন দেখেন, গ্রিনরা কীভাবে আসলো অথবা লিবারেল ডেমোক্রেটসরা কীভাবে আসল, যারা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র পুঁজির কথা বলছে। তাই আমাদের এসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে। বাংলাদেশ তো পৃথিবীর বাইরে নয়, তাই না? বাংলাদেশ কী সুদানের চেয়েও খারাপ?

জিল্লুর রহমান: কিংবা আলজেরিয়া থেকেও...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সেখানকার শাসকগোষ্ঠী সেটি মোকাবেলা করছে এবং আমি যখন শাসকগোষ্ঠী বলি, আমি কিন্তু দলীয় শাসকগোষ্ঠীর কথা বলছি না, কোনো দল বলে বলছি না। আমি দেখছি যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের যে উন্নয়ন হচ্ছে, সেই উন্নয়েনর সুবিধাভোগী বাংলাদেশের সব মানুষ সমভাবে হচ্ছে না। এখানেই আমার সমস্যা। আমার সমস্যা এটি নয় যে কোন দল আছে আর কোন দল নেই ইত্যাদি, আমার কথা হলো, উন্নয়ন সবাই ভোগ করতে পারছে না। এর কারণ হলো, এই মানুষগুলোর কণ্ঠস্বর সংগঠন করার মতো পরিস্থিতি বা পরিবেশ নেই। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আমাদের অনেক বেশি বলতে হচ্ছে, যেগুলো আমাদের বলার কথা নয়। আমি আপনার সাথে আধা ঘণ্টা যে আলোচনা করলাম, এগুলো নিয়ে আমার কথা বলার কথা নয়, এই কথাগুলো জনপ্রতিনিধিদের বলা উচিত। কৃষক কেন ধানের দাম পায় না, একটি চাকরির জন্য কেন লাখ লাখ টাকার খেসারত দিতে হয়, কেউ কেন বাসে উঠলে মরে যাওয়ার আশংকায়

থাকবে – এসবের উত্তর তো জনপ্রতিনিধিরা দেবেন, ক্রিয়াশীল গণতন্ত্র দেবে। একটি ক্রিয়াশীল গণতন্ত্র একটি ভালো বাজেট তৈরি করবে এই ভরসায় আছি।

জিল্লুর রহমান: অনেক ধন্যবাদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আপনাকে। আসন্ন বাজেট নিয়ে কথা বলছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে হুকুমের অর্থনীতি বলছেন এবং বলছেন যে, এই অর্থনীতি হচ্ছে উদ্যমহীন, উত্তাপহীন, উদ্যোগহীন। যে বাজেট সামনে উপস্থাপন করা হবে, তা একটি ত্রিশূলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ত্রিশূলের উপর দাঁড়ালে তার অবস্থা কী হয়, দর্শকরা তা বুঝতেই পারেন এবং তার জন্য সমাধান হিসেবে প্রধানত তিনি মনে করেন, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। এর বিকল্প নেই। দর্শক, আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

তৃতীয় মাত্রা
চ্যানেল আই
১২ *জানুয়ারি* ২০১৯

ত্রিশূলের উপর এবারের বাজেট

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জহিরুল আলম: *সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের এই সপ্তাহের বিশেষ আয়োজন 'বাজেট এই সময়ে' সবাইকে স্বাগত। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হতে যাচ্ছে, বাজেটের আকার প্রতিবছর বাড়ছে; এর মধ্যে অনেকের আগ্রহ থাকে বাজেটে কোন বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কোন বিষয়গুলো আজ প্রকৃত অর্থে মনোযোগের দাবি রাখে, সেগুলো জানার। এই সপ্তাহেই আমরা ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করেছি, যেমন আমরা কেমন বাজেট চাই, বাজেটে সরকারের অগ্রাধিকারগুলো কী বা অর্থমন্ত্রীর তরফ থেকে কী ধরনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে ইত্যাদি নানা বিষয়ে। আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করব। অর্থনীতিবিদেরা ইতিমধ্যে বলেছেন, কর্মসংস্থান, মানুষের আয় বাড়ানো, বৈষম্য কমানো – এগুলোই বাজেটের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আজ আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে। স্বাগত আপনাকে।*

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা

জহিরুল আলম: আপনাকে যখন পেয়েছি, তখন অনেক বিষয় জানার কৌতূহল হচ্ছে। বিশেষ করে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কী সুসংবাদ আছে অথবা নেতিবাচক দিক কী আছে অথবা কী ধরনের ঝুঁকি আছে ইত্যাদি। ঝুঁকি কিংবা নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করলে অনেকেই অসুখী হবেন, কিন্তু আমার মনে হয়, একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন আমরা আপনার কাছে পাব; অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুসংবাদ কী আছে অথবা দুশ্চিন্তা বা ঝুঁকির কী বিষয়গুলো দেখছেন ইত্যাদি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি যেহেতু বাজেটকে সামনে রেখে আলোচনা করছেন, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই জনমানুষের জানার আগ্রহ থাকে যে বাজেটে যেসব কর প্রস্তাব আসবে এবং যেসব সুবিধাদির নীতিমালা আসবে, সেগুলো তাদের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করবে। এ আলোচনা হবে এবং হয়তো আগামী দিনে আপনার সাথে এই আলোচনাটা করব। এ ছাড়া, এই বাজেটকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অর্থনীতির মধ্যমেয়াদি আলোচনাও বিভিন্নভাবে আসে। কিন্তু আজকে আপনার সাথে আমি যেটি আলোচনা করতে চাই সেটি হলো, একজন পেশাদার অর্থনীতিবিদ যেভাবে দেখে, অর্থাৎ সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার যে কথা আপনি বললেন, সেটির ভিত্তিতে যে বাজেটটা দাঁড়ায় এবং তার যে আর্থিক কাঠামো, ব্যয় বরাদ্দ ও বাস্তাবায়ন করার সক্ষমতা – এসব বিষয়।

আপনি তো ইতিবাচক-নেতিবাচক অনেক কিছু বললেন, তবে আমি প্রথমে বলতে চাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সফলতার কথা এবং সেই সফলতা তাকে একধরনের ফাঁদে ফেলে দিচ্ছে কিনা। গত ৭ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জন পৃথিবীর বুকে উন্নয়ন কিংবদন্তীর পর্যায়ে চলে গেছে, আমি যখনই বিদেশে যাই তখন দেখি সবাই খুব ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সফলতার কথা বলে। বিশেষ করে আফ্রিকার জনগণ আমাদের উন্নয়েনের ব্যাপারে উচ্ছ্বসিত, এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনৈতিক পর্যায়ে এটি নিয়ে আলোচনা হয়; বিশেষ করে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন এবং এখন চলমান টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন ইত্যাদি। যে জিনিসটা আমরা দেখি সেটি হলো, গত ৭-১০ বছরে বাংলাদেশ অর্থনীতির আয়তনের দিক দিয়ে প্রায় ৬/৭টি দেশকে অতিক্রম করেছে, যার মধ্যে অনেক বড় বড় দেশও আছে যেমন, কেনিয়া, জিম্বাবুয়ে ও অন্যদিকে ফিনল্যান্ডের মতো দেশ। অর্থনীতির আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ এখন ৪২/৪৩ তম দেশ, অর্থাৎ প্রথম ৫০টি দেশের মধ্যে সে ঢুকে গেছে, ধরুন পৃথিবীতে যদি ২০০ টার মতো দেশ থাকে। আর আপনি যদি মাথাপিছু আয়ের কথা চিন্তা করেন, তাহলে বাংলাদেশ এই সময়ে প্রায় ১৪টির মতো দেশকে অতিক্রম করেছে। মাথাপিছু আয়ে তার সফলতা অনেক বেশি।

জহিরুল আলম: আয়ের হিসাবটা কি ঠিক আছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রবৃদ্ধির হিসাব করলে সরকারি হিসাব গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। আর আন্তর্জাতিক উৎসের কথা যদি বলেন, তাহলে জানানো দরকার, তারা একমাত্র সরকারি ছাড়া আর কোনো সূত্র ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে না। সেই আলোচনায় একটু পরে আসি। হিসাবের আলোচনায় তো অনেকরকম বক্তব্য আসেই।

জহিরুল আলমঃ না, এটি আমার সন্দেহ না। আপনারাই অনেক সময় বলে থাকেন, প্রবৃদ্ধির যে হিসাব করা হচ্ছে তার উৎস কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ সিপিডি'র পক্ষ থেকে গত মাসে আমরা বলেছি, এই অনুমিতির ব্যপারে কী কী সমস্যা আছে। এ নিয়ে হয়তো কিছু তর্ক-বিতর্ক থাকতেই পারে। প্রাক্কলন হলো, আমরা ২০৩০ সাল নাগাদ অর্থনীতির আয়তের দিক থেকে ২৬ তম দেশ হব। এখন এই প্রাক্কলনটার ভিত্তি হলো, আমাদের জনসংখ্যা এবং সাম্প্রতিককালের প্রবৃদ্ধির হার। এই প্রবৃদ্ধির হারে এক ধরনের কিংবদন্তী সৃষ্টি হয়েছে। এতে আমাদের মনে এক ধরনের আত্মতুষ্টি বিরাজ করছে এবং এই আত্মতুষ্টির কারণে অর্থনীতির গভীরে বিভিন্ন সময়ে যে গতিশীল সমস্যাগুলো আসে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে যে কাঠামোগত সমস্যাগুলো আসে, সেগুলোর প্রতি আমরা নজর দিই না বা দিতে চাই না। অথবা এর মধ্যে একধরনের অস্বীকারের মনোভাব থাকে। আমি সে জন্য আপনাকে বললাম, সফলতাই বাংলাদেশের জন্য কাল না হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, আমরা আত্মতুষ্টিতে এতই নিমগ্ন থাকি যে অর্থনীতি যে একটি চলমান প্রক্রিয়া, সেটিই ভুলে যাই। তার প্রতি যদি যথা সময়ে মনোযোগ না দেওয়া হয়, তাহলে উন্নয়নের সব ধারাই দুর্বল হয়ে যায়। তৈরি হয় এক ধরনের বিকৃতি। তখন গরিব মানুষ এটির উপকার পায় না। বাংলাদেশ এই জায়গায় এসে উপকৃত হচ্ছে কিনা, এই বাজেটের আগে সেটিই আমার প্রশ্ন।

প্রবৃদ্ধির ভ্রম

জহিরুল আলমঃ গত বছর বাজেট পেশের সময় আপনি বলেছিলেন যে এটি একটি কল্পকাহিনী বা আর্থিক ভ্রম।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমি বলেছিলাম যে আর্থিক ভ্রম, পরাবাস্তাব একটি জিনিস, আর এই পরাবাস্তাব বাস্তব হয়ে যাচ্ছে বলে আমার আশঙ্কা। এবারের বাজেট ত্রিশূলের উপর দাঁড়িয়ে আছে - ত্রিশূল মানে হলো তিনটি বড় বড় বর্শা ফলক - বাংলাদেশের এবারের বাজেট আগামী দিনের অর্থনীতিকে যে বিদ্ধ না করে। বাজেটের প্রথম দিক হলো সরকারি আয়-ব্যয় এবং এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় জায়গা হলো কর আদায়। রাজস্ব-জিডিপির অনুপাতে পৃথিবীতে সবচেয়ে নিচের সারিতে বাংলাদেশ, অর্থাৎ সরকারের উন্নয়ন করার আকাঙ্ক্ষা অনেক, কিন্তু তার পক্ষে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থ সংস্থান করা সম্ভব হচ্ছে না। যে লক্ষ্যমাত্রা তারা নির্ধারণ করছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলছি, এবার ৭০/৮০ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি হবে।

জহিরুল আলম: বর্তমান হিসেবে রাজস্বের প্রবৃদ্ধি কত শতাংশ?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটিতো ১০/১২/১৪ শতাংশ হয়, বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন রকম আসে।

জহিরুল আলম: মার্চ থেকে জুলাই ৭ শতাংশের বেকিনা।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শেষ কয়েক মাসে যদি ৫-৬ শতাংশ বৃদ্ধি না করা যায়, তাহলে বাকিটা পূরণ করা যাবে না। সিপিডি থেকে আমরা বিশ্লেষণ করেছি যে কীভাবে লক্ষ্যমাত্রার সাথে আদায়ের ফারাকটা বাড়ছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় দুর্যোগের জায়গাটা হলো, বাংলাদেশের এই পুরো আয়করের মধ্যে ৩৫ শতাংশের মতো হলো প্রত্যক্ষ কর, ৬৫ শতাংশ পরোক্ষ কর (তথ্য সংশোধিত)। নিয়ম হলো, প্রত্যক্ষ কর বেশি হবে এবং যার দেওয়ার সক্ষমতা যত বেশি, সে তত বেশি কর দেবে। কিন্তু তা হচ্ছে না। প্রত্যক্ষ কর আমরা বাড়াতে পারছি না। কিন্তু যে মানুষগুলোর দেওয়ার সক্ষমতা কম, তাদের উপর আমরা বিভিন্ন ধরনের পরোক্ষ কর আরোপ করছি, এটি বাংলাদেশের কর কাঠামোর মধ্যে বড় ধরনের সমতাবিরোধী একটি কাজ।

বড়দের কর ছাড়

জহিরুল আলম: এর মধ্যেই অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে রাজহাঁস যারা, যারা বেশি প্রতক্ষ্য কর দিতে পারেন, তাদের আর বেশি ব্যথা দেওয়া যাবে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যদি তাই হয়, বেশি ব্যথা দেওয়া না যায়, তবে করের পরিধিও সেভাবে বাড়বে না। যারা কর ফাঁকি দিচ্ছেন, তাদেরও শাস্তি হবে না এবং দেশ থেকে টাকা বাইরে নিয়ে যাওয়াও আটকানো যাবে না। তাই কর একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সাথে যেটি দাঁড়িয়েছে তা হলো ব্যয়ের ক্ষেত্র। ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজস্ব ব্যয় উন্নয়ন ব্যয়ের চেয়ে বেশি হারে বাড়ছে। আগে রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে আমরা দেখতাম ভর্তুকি ও দায় দেনা পরিশোধই বড় অংশ ছিল। কিন্তু এখন দেখছি, প্রশাসনিক খাতে অর্থাৎ বেতন ভাতাতেই বেশি ব্যয় হচ্ছে। এটি খুব দ্রুতহারে বাড়ছে। এটিও একটি সমস্যা।

অর্থায়নের উৎস ও হুকুমের অর্থনীতি

জহিরুল আলম: আপনি ত্রিশূলের মধ্যে একটি শূলের কথা বললেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ, এবং এটির সাথে যেটি যুক্ত তা হলো, অর্থায়ন অনেক বেশি ব্যাংক ঋণ ও সঞ্চয়পত্র নির্ভর। ঘাটতিটা এভাবেই এেটিনো হচ্ছে। অর্থাৎ বৈদেশিক সুদহীন যে টাকাগুলো আছে, সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারছি না। এভাবে আমাদের আর্থিক কাঠামো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। এটি হলো প্রথম শূল। দ্বিতীয় শূল হলো, আমাদের ব্যাংকিং, পুঁজিবাজার, মুদ্রানীতি ইত্যাদি। ব্যাংকিং খাতে এই মুহূর্তে কী পরিস্থিতি চলছে তা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন এবং এর মাধ্যমে খুবই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে বাংলাদেশে গত ১-২ বছর ধরে খেলাপি ঋণ খুবই দ্রুতগতিতে বাড়ছে। ১০০ হাজার কোটি টাকা দিয়ে কয়টা পদ্মা সেতু তৈরি করা যায় ভাবুন একবার। এখন এই টাকা আদায়ের অগ্রগতি নেই। নতুন সরকার এসে যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে তার মধ্যে এটি উল্টো পথে যাত্রার মতো। উনারা বিভিন্ন ধরনের প্রতিষেধক দিচ্ছেন, কিন্তু তাতে হয়তো রোগের উপশম হবে না, বরং রোগ বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হবে। ব্যাপারটি হলো, উনারা ঋণখেলাপিদের আরো বেশি সুবিধা দিচ্ছেন, যারা ভালোভাবে ঋণ শোধ করল, তাদের উনারা তুলনামূলক ভাবে কম সুবিধা দিচ্ছেন।

জহিরুল আলম: এখানে আমি একটু যোগ করতে চাই যে, উচ্চ আদালতও এক্ষেত্রে মন্তব্য করেন। এটি কী পরিস্থিতির উন্নয়নে সহায়ক হবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি আপনাকে এতক্ষণ যা বলেছি তাতেই হয়তো অনেক বিতর্ক সৃষ্টি হবে, এখন আবার এর মধ্যে বিচার ব্যবস্থা টেনে এনে আমাকে কনটেম্পট অব কোর্টের (আদালত অবমাননা) ঝুঁকিতে ফেলবেন না। ধারণা করা হচ্ছে, কিছু লোক যদি সুবিধা পায়, তাহলে বোধহয় তারা টাকা ফেরত দেবে, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। আমাদের কাঠামোগত সুশাসনের অভাব আছে, এখানে শাস্তি হয় না কারো। সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে হুকুম দিয়ে - আমরা বলি হুকুমের অর্থনীতি - সুদের হার কমানোর চেষ্টা করা হলো, কিন্তু তা কি সম্ভব হলো? হলো না। কারণ হুকুমের ভিত্তিতে এসব হয় না, উল্টো যে ব্যাংকগুলো ব্যবস্থাপনায় ছিল, এই নয়-ছয়ের মধ্যে আটকে গিয়ে তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা আরো দুর্বল হয়ে গেছে। আর সুদের হার তো কমলোই না। একইভাবে পুঁজিবাজারে টাকা বিনিয়োগ করার সুবিধা হলো, কিন্তু সেখানে সুশাসন নেই। সবচেয়ে নিম্নমানের কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি। ফলে যেমন ঋণের বাজারে সমস্যা হলো, মূলধনের বাজারেও হলো। এই ঋণ এবং মূলধন বাজারের সমস্যা সমাধান না করে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর সুযোগ নেই।

এখন তিন নম্বর শূলের প্রসঙ্গে আসি, যেটি সবচেয়ে বড় এবং এবার আরো প্রকটভাবে আসছে সেটি হলো, বৈদেশিক খাতে লেনদেনের সমস্যা। বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি বাড়ার সম্ভাবনা আছে এবং চলতি হিসাবে যেটি আছে, যেখান থেকে আমরা অর্থ পাই, সেখানেও ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিচ্ছে, ফলে দায় দেনা পরিশোধ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন খাতে ঘাটতি হচ্ছে। এর সরাসরি প্রতিফলন হিসেবে আমরা দেখছি যে টাকার বিনিময় হারে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। যেহেতু টাকার বিনিময় হার আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ডলার বিক্রি করে স্থিতিশীল রাখছি, সেহেতু এটি ৮৬ টাকা থেকে ৮৭/৮৮ টাকা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর বিপরীতে এখন কী হচ্ছে, বিনিময় হার ঠিক করা হলো না বলে বিজিএমইএ এখন প্রণোদনা চাচ্ছে।

জহিরুল আলম: ৫ শতাংশ প্রণোদনা চাচ্ছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ৫ শতাংশ প্রণোদনা চাচ্ছে। যদি টাকার বিনিময় হারে ঠিকঠাক সামঞ্জস্য আনা হতো, তাহলে এই সমস্যা হতো না।

জহিরুল আলম: আপনি ত্রিশূলের কথা বলছেন, ঝুঁকির কথা বলছেন। কেন এই পরিস্থিতির উদ্ভব হলো এবং নিশ্চয়ই এ থেকে বেরোনোর চেষ্টা করতে হবে। বাজেটে এর কী প্রতিফলন আপনি আশা করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যে ত্রিশূলের কথা বললাম, তার মধ্যে একটি হলো আর্থিক কাঠামোর দুর্বলতা, আরেকটি হলো ব্যাংকিং, পুঁজিবাজার ও মুদ্রাবাজারের দুর্বলতা; আর তৃতীয়ত হলো, বৈদেশিক লেনদেন খাতের দুর্বলতা। কীভাবে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো? আমি মনে করি, এটির বড় একটি কারণ হলো, সামষ্টিক অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যে ধরনের গতিশীল চিন্তা এবং তার বাস্তাবায়ন দরকার, বাংলাদেশ অনেক দিন ধরেই তা থেকে অনেক দূরে আছে। অর্থমন্ত্রীদের মূল কাজই কিন্তু সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। এই যে বাহ্যিক প্রবৃদ্ধির হারে যে উচ্চ অনুমিতি, সম্প্রতি টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকা ও মূল্যস্ফীতি কম থাকা – এগুলো আমাদের মধ্যে একধরনের আত্মপ্রসাদ সৃষ্টি করেছিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা-নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যে ধরনের সামনের দিক নিয়ে চিন্তা থাকে – আমরা ইতিহাসে যেটি দেখেছি – আমি যদি নাম ধরে বলি, যেমন কিবরিয়া সাহেব ও সাইফুর রহমান সাহেব, উনারা যেভাবে অগ্রগামী হয়ে এগুলো করেছেন, সাম্প্রতিককালে আমরা তেমন একটি কিছু দেখছি না। এখন নতুন মন্ত্রী এসেছেন, উনি এই নেতৃত্ব প্রদর্শন করবেন এটি আমরা আশা করতে পারি। এটি অনেকটা নির্ভর করে মন্ত্রী তার রাজনৈতিক সক্ষমতা কতখানি ব্যবহার করবেন, তার

উপর। কারণ হলো, এতে অনেক বড় ধরনের শত্রুতা সৃষ্টি হতে পারে, অনেক উত্তেজনা হতে পারে, এটি অনেক বড় ব্যাপার। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, এগুলো ঠিক করার জন্য যে সংস্কার দরকার সেগুলো এই সরকার বা তার আগের সরকার করেনি। আমরা সিপিডি'র পক্ষ থেকে গবেষণা করে দেখিয়েছি, ২০০৯ সালে যখন এই সরকার আসলো, তারপর ২০১২ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত কিছু কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ আমরা দেখেছি। সংস্কার একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া এবং তা যদি চলমান না রাখা যায়, তাহলে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হয়, যার প্রকৃত প্রমাণ হলো ব্যাংকিং খাত বা পুঁজিবাজার।

জহিরুল আলম: এই অ্যালার্মটা কী অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে এসেছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই অ্যালার্মটা আসলে দুই জায়গা থেকেই আসার কথা, শুধু অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে নয়। অর্থমন্ত্রীর নেতৃস্থানীয় ভূমিকা এরকম হওয়া উচিত: সামষ্টিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল এবং দীর্ঘমেয়াদে টেকসই রাখতে ভূমিকা পালন করা ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি আসলে যৌথ দায়িত্ব। কারণ প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর বলা উচিত যে পাট খাতে এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে, কৃষককে ন্যায্যমূল্য দিতে পারছি না, বাণিজ্য খাত বলবে যে রপ্তানি করার জন্য গার্মেন্টস ব্যতীত আর কিছু পাচ্ছি না, শিল্প খাত বলবে যে কোন শিল্পে অভ্যন্তরীণ বাজারমুখী কর্মসংস্থান হচ্ছে না ইত্যাদি। এই কথাগুলো সবাইকে বলতে হবে এবং সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এটিকে ধারণ করে সরকারের প্রথম দিকেই এ নিয়ে কাজ করবে। গতবার, অর্থাৎ ২০১০-২০১২ সালের দিকে এই কাজটি হয়েছিল।

জহিরুল আলম: আপনারা তো বললেন প্রথম ১০০ দিন উদ্যমহীন, উৎসাহহীন ছিল।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটিই তো আমি তুলনা করছি। তুলনা করে দেখছি যে এবার প্রথম ১০০ দিনে আমরা সেই উদ্যম, উচ্ছ্বাস, উদ্যোগ দেখলাম না। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে কেউ কেউ বলছেন, ১০০ দিনের কর্মসূচি তো দিইনি। কিন্তু আমরা তো কর্মসূচীর মূল্যায়ন করছি না। আমরা দেখেছি যে নতুন সরকার আসলে প্রথম দিকে ওই উদ্যএটি সাধারণত থাকে।

ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বা অসাম্য

জহিরুল আলম: একটি বিষয় এই সময় খুব বেশি আলোচিত হচ্ছে, সামষ্টিক অর্থনীতির ঝুঁকি বা সূচক নিয়ে কথা হয়, কিন্তু এর বাইরেও মানুষ বলছে যে বৈষম্য অনেক বেড়ে

যাচ্ছে। একটি সেমিনারে এসব কথা বলা হয়েছে, অধ্যাপক রেহমান সোবহানও সেখানে ছিলেন, আমরা এখন সেই সেমিনারের সংবাদ দেখব।

সেমিনার ভিডিও: ২০১৩ সালে বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য উল্লেখ করে সিপিডি বলছে, দেশে প্রতি বছর প্রায় ২১ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে আসছে, কিন্তু কর্মসংস্থান হচ্ছে ১৩ লাখের। অর্থাৎ ৮ লাখ মানুষ বেকার থাকছে প্রতি বছর। সেই সঙ্গে ক্রমেই বাড়ছে আয় বৈষম্য। দুই দশক আগেও দেশের সবচেয়ে গরিব ৫ ভাগ মানুষের সম্পদের চেয়ে শীর্ষ ৫ ভাগ মানুষের সম্পদ ২৭ গুণ বেশি ছিল। এখন শীর্ষ ৫ ভাগ মানুষের সম্পদ নিচের পাঁচ ভাগ মানুষের ১২১ গুণ। আয় বৈষম্য কমাতে সামাজিক খাতের বরাদ্দে বিশেষজ্ঞরা জোর দেন। অথচ শিক্ষায় সরকারের খরচ গত ৫ বছরে ১৯ ভাগ বাড়লেও মাথাপিছু বরাদ্দ বেড়েছে মাত্র ৪৪৫ টাকা। স্বাস্থ্য খাতে আরো কম, মাত্র ২০৫ টাকা।

জহিরুল আলম: এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন কিছু সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া আমরা শুনব।

ভিডিও:

১) মানুষের কর্মসংস্থানমুখী বাজেট ভীষণভাবে প্রয়োজন। বাংলাদেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে যুব সমাজ, বেকার। সে কারণে বাজেট অবশ্যই যেন কর্মমুখী হয়।

২) আমরা যখন বেতন তুলি বা কোনো কিছু করতে যাই, তখন এই ট্যাক্স আর ভ্যাট কাটতে কাটতে আমাদের আর টাকা থাকে না। আমি ৩০ হাজার টাকা আয় করি প্রতি মাসে। আমিও যদি ভ্যাটের আওতায় পড়ে যাই, তাহলে টাকা আরো কমে যায়। তখন আমি অনেক কিছু কিনতে পারি না।

৩) সারের দাম বেশি, কীটনাশকের দাম বেশি; ধান বিক্রি করতে গিয়ে টাকা কমে যাচ্ছে।

৪) প্রবাসী শ্রমিক, কারখানার শ্রমিক ও গ্রামের কৃষকদের জন্য বাজেট হচ্ছে না। বাজেট হচ্ছে, মন্ত্রীদের বেতন বাড়ছে, বড়লোক আরো বড়লোক হচ্ছে, কোটিপতি আরো কোটিপতি হচ্ছে এবং গরিব আরো গরিব হয়ে যাচ্ছে। এরকম বাজেট আমরা চাই না। বাজেট হবে জনগণের জন্য, সবার জন্য, এরকম বাজেট চাই।

৫) দক্ষিণবঙ্গে যে উন্নয়নের স্রোত আসছে, সেটি আরো ভালো হয় গ্যাসের লাইনটা আসলে।

৬) বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম যে হারে বাড়ছে, তা আমাদের সাধারণ মানুষের ক্রয় সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যেন সহনশীল থাকে, এটি সরকারের কাছে আমাদের আকুল আবেদন।

জহিরুল আলমঃ এখানে বৈষম্যের বিষয়টি উঠে আসছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ মানুষেরা যে কথাগুলো বলেছেন, এগুলো চেতনার দিক থেকে তো ভিন্ন হওয়ার কথা নয়। প্রথম দিকের যেই তথ্য উপাত্ত দিলেন, সেগুলো আমাদের সিপিডি'র তথ্য উপাত্ত, আমি এটির সঙ্গে আরো অনেক কিছু যোগ করতে পারি। যেমন, যুব সমাজের কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সাধারণ বেকারত্বের হার হলো ১০ শতাংশ, শিক্ষিত বেকারত্বের হার ৩০ শতাংশ। অর্থাৎ যত বেশি শিক্ষিত,তত বেশি বেকার। এটি একটি অদ্ভুত পরিস্থিতি। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, বাংলাদেশের যে বিকাশমান মধ্যবিত্ত, সেই মধ্যবিত্তের আয় কিন্তু এর তুলনায় বাড়ছে না। সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে তা হলো, এখন শহরের চেয়ে গ্রামীণ বৈষম্য বেশি বাড়ছে। আর কৃষকেরা যে ধানের দাম পাচ্ছে না, আগামী দিনের বৈষম্যে তা আরো বেশি করে প্রতিফলিত হবে। যে সমস্যার কথা আমি বলছি, অর্থাৎ ত্রিশূলের কথা, সেই ত্রিশূলের সমাধান এই বাজেটে নেই।

জহিরুল আলমঃ এটি কি নতুন বাজেটে আশা করা যায়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ প্রথমত, বাজেটে এই সমস্যাগুলোর স্বীকৃতি থাকতে হবে এবং এই সমস্যাগুলোর সঙ্গে এমন কিছু পদক্ষেপকে নির্দিষ্টভাবে যুক্ত করতে হবে, যাতে এই ত্রিশূলের সমাধান হয়। যেমন, প্রত্যক্ষ কর আদায় বাড়ানোর ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে? ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের যে বাড়বাড়ন্ত, তার জন্য কী ধরনের র‍্যাডিকাল (আমূল পরিবর্তনকামী) চিন্তা করা হবে। যে বৈদেশিক খাতের কথা বলা হলো, সেই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়াতে আপনি কী করবেন? কিন্তু এগুলো করার জন্য যেটি দরকার সেটি হলো, এই নীতি সংস্কার করার জন্য জনমানুষের প্রতিনিধিদের প্রকৃত ভূমিকা পালন। সংস্কারের পদক্ষেপ যেগুলো আসছে কিছু প্রভাবশালী মানুষ সেই পরিবর্তনগুলো আনতে দিচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে।

জহিরুল আলমঃ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য।

এনটিভি
বাজেট এই সময়ে
৩০ মে ২০১৯

অধ্যায় ২

উন্নয়ন ও অগ্রগতি

Looking beyond high growth in Bangladesh

Fahmida Khatun

In 2018 Bangladesh began its graduation process from least developed country to developing country status. Bangladesh has now met the criteria for graduation set by the United Nations Committee for Development Policy in terms of gross national income per capita, human assets index and economic vulnerability index. Politically, the country held its 11th national elections on 30 December 2018.

During the 2018 fiscal year, the economy grew by 7.9 per cent in a continuation of high growth exceeding 7 per cent for the last three fiscal years. At a time when the state of the global economy looks gloomy, Bangladesh’s growth numbers indicate promise. The agriculture and industry sectors saw higher growth rates than the previous year. The service sector declined slightly, though its share in GDP remained at 52.2 per cent. Robust economic growth has contributed to an increase in per capita income and a reduction in poverty over time.

Yet high growth has not increased the pace of job creation and poverty reduction. According to Bangladesh’s Labour Force Survey 2016–17, though the national unemployment rate is steady at only 4.2 per cent, youth unemployment sat at 10.6 per cent in 2017. Despite a positive demographic composition, with a large share of the country still young, Bangladesh has not been able to benefit from its ‘demographic dividend’.

More worrying is that the youth unemployment rate is rising steadily. A significant segment of the youth population — 29.8 per cent in 2017 — was not engaged in education, employment or training. Unfortunately, the existing education system is not providing young people with the required skills to be employable in the job market.

Linked to this is the issue of technology. Bangladesh will have to embrace technology to remain competitive in the global market. The economy must diversify and increase its productive capacity through technological upgrading and innovation. But appropriate policies need to be in place to reduce the digital divide.

Impressive growth also has not generated adequate income for all. Stark income, consumption and wealth inequality remain a scar on the economy. Official statistics show that in 2016, the top 5 per cent of households possessed 28.9 per cent of the national income while the bottom 5 per cent possessed only 0.2 per cent.

These challenges should be addressed through higher investment in both physical and social infrastructure. Private sector investment is hovering around 23 per cent of GDP. Foreign direct investment is not impressive either. The main driver of growth has been consumption. As a result, national savings declined in 2018 compared to the previous fiscal year.

The trade deficit also widened to 6.1 per cent of GDP due to higher imports of food, fuel and capital goods. This is despite export and remittance growth. Export destinations of readymade garments remained concentrated in the European Union and the United States (US). A disproportionate share of readymade garment exports and a narrow market concentration put the export sector at risk.

The high value of the Bangladeshi taka (BDT) against the US dollar put exporters at a disadvantage when it came to some of Bangladesh's competitors in the global market. China, India, Sri Lanka and Vietnam saw a depreciation of their currencies against the US dollar.

But if the real effective exchange rate is considered, the BDT appreciated. There may be a need for an adjustment of the exchange rate in 2019 to increase exports. This will help reduce the deficit in the balance of payments and current account. The volume of foreign exchange reserves has been declining since 2017 and could only cover five months of imports in 2018 compared to more than eight months in the previous year.

Targets for revenue generation and expenditure efforts remain unfulfilled, reflecting a weak fiscal framework. Bangladesh's revenue-to-GDP ratio is one of the lowest in the world at only 11.5 per cent in 2018.

Bangladesh's graduation from the least developed country group will lead to the withdrawal of the European Union's and some other countries' Generalised System of Preferences schemes, meaning a loss of duty free access to these markets. There may also be a curtailment of access to concessional finance. The newly elected government will design and execute the Eighth Five Year Plan and continue to implement the Sustainable Development Goals. Resource mobilisation will be critically important during this time.

Bangladesh has demonstrated significant success in the social sector in the past. These successes include gender parity in primary education, higher school enrolment ratios and adult literacy rates, reductions in infant mortality, under-five mortality and maternal mortality, a lower birth rate and higher life expectancy. Low allocation of budgetary resources and inequality in accessing education and health services are pertinent issues to be addressed.

Institutional and governance challenges in the banking sector in recent years are likely to threaten the macroeconomic stability of the country. Burdened with a large quantity of non-performing loans, various irregularities, a weak central bank and problematic political influence, the sector is being supported by the government through injections of capital. It desperately needs reform and only strong political commitment will make it happen.

While several important economic indicators show promise, Bangladeshi policymakers will have to remain vigilant to ensure that growth is sustainable and inclusive and the country's transition to developing country status is a smooth one.

7 March 2019
East Asia Forum

রবীন্দ্র স্বদেশ ও উন্নয়ন চিন্তা

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

কবিগুরু প্রচলিত অর্থে অর্থনীতিবিদ ছিলেন না। ছিল না তার এ ক্ষেত্রে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। তবে তার ছিল একটি সৃষ্টিশীল পারিবারিক পরিবেশ, ছিল তার ব্যাপক পাঠাভ্যাস। দেশের গ্রামীণ জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন কাছ থেকে; লক্ষ্য করেছেন ঔপনিবেশিক শাসন কীভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশকে শৃঙ্খলিত করে। একই সাথে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমাজ ও সভ্যতাকে পর্যালোচনা করেছেন গঠনমূলক দৃষ্টিতে। তাই তার বিস্তৃত রচনাবলি গভীরভাবে পাঠ করলে আমরা লক্ষ্য করি সাম্প্রতিককালে যেসব অর্থনৈতিক উন্নয়ন চিন্তা আমাদের ব্যস্ত রাখছে, তার বহু কিছু রবিঠাকুরের মনোযোগ লাভ করেছিল প্রায় শত বছর পূর্বে।

উপরোক্ত এবং অন্য বহুবিধ উপাদান রবিঠাকুরকে আর্থ-সামাজিক বিবর্তন সম্বন্ধে দিয়েছিল একটি গভীর ইতিহাসবোধ ও উন্নয়ন অর্থনীতির মূল দ্বন্দ্বগুলো সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ধারণা। তাই তার বিশ্ববীক্ষার মাঝে উজ্জ্বলভাবে স্থান পেয়েছে উন্নয়ন দর্শন এবং তৎসঞ্জাত সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন তথা জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের প্রস্তাবনা।

আজকের এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে নিতান্তই বিক্ষিপ্তভাবে আমি বিশ্বকবির স্বদেশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন চিন্তার কতিপয় দিক স্মরণ করতে চাই।

দেশ, মানুষ ও দারিদ্র্য

কবিগুরুর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন চিন্তার সূচনাবিন্দুটি ছিল দেশপ্রেম। সেই দেশপ্রেম তার জন্য কোনো বায়বীয় বিষয় ছিল না। তার জন্য, 'দেশকে ভালবাসিবার প্রথম লক্ষণ

ও প্রথম কর্তব্য দেশকে জানা।' তিনি আরো বলেছেন, 'দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি... ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়।'

সমাজ ও অর্থনীতির বস্তুগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিতকে জানা বা বোঝার উপর পেশাদার অর্থনীতিবিদরা যে গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন, সেটির কথাই এখানে বলা হয়েছে। দেশজ বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করতে না পারলে যে সঠিক আর্থ-সামাজিক নীতি প্রণয়ন করা যায় না, তাই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন। তবে তার এই স্বদেশ চিন্তার মধ্যে মানবতাবোধই প্রধান। তিনি বলেছেন, 'যে প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমস্ত দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থভাবে দেখে না।' স্বদেশ চিন্তার মানবিক দিকের পাশাপাশি কবিগুরু স্বরাজ চিন্তার রাজনৈতিক দিকের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বলেছেন, 'বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে। দেশকে আপন চেষ্টায় দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়।'

রবীন্দ্রনাথের উন্নয়ন চিন্তার সূচনাবিন্দু যেমন দেশকে জানার ভেতর দিয়ে আত্মোপলব্ধি, তেমনি সেই প্রকাশিত স্বদেশ-স্বরাজ চিন্তার মূল উপকরণ হলো মনুষ্যত্বের বন্ধন। এক্ষেত্রে তার ভাববাদী চিন্তার পাশাপাশি বস্তুবাদী চিন্তার প্রকাশ কম দেখি না। তিনি বলেছেন, 'আধপেটা অবস্থায় কোন জাতের মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় না।' ওই পংক্তিটি যেন সুকান্তকে অনুপ্রাণিত করেছিল লিখতে - 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।' আমরা লক্ষ্য করি, কবিগুরু দারিদ্র্য কাউকে 'মহান' করে এমনটা মনে করেননি। তিনি লিখেছেন 'ঐশ্বর্যকে অধিকার করিবার শক্তি যাহাদের আছে দারিদ্র্য তাহাদেরই ভূষণ। ... এই জন্য ত্যাগের দারিদ্র্যই ভূষণ, অভাবের দারিদ্র্য ভূষণ নহে।'

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে দারিদ্র্যের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন, তাই নয়; তিনি বৈষম্যকেও চরমভাবে ধিক্কার দিয়েছেন। আজ আমরা যারা দারিদ্র্য বিমোচনের সাফল্যের পাশাপাশি দেশে ক্রমবর্ধমান আয় ও সুযোগের বৈষম্য দেখে চিন্তিত হই, তাদের জানা দরকার যে এই নেতিবাচক প্রবণতাটি কবিগুরু বহু আগেই চিহ্নিত করেছিলেন। তার ভাষায়, 'ধনের ধর্মই অসাম্য।' আবার বলছেন, 'ধন নির্মম, নৈর্ব্যক্তিক।' মার্কেন্টাইলবাদী অর্থনীতিতে সম্পদ সৃষ্টির সাথে যখন পুঁজিকেন্দ্রিক মূল্যবোধ উৎকটভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, সেটিকে তিনি নিন্দা জানালেন অকুণ্ঠভাবে। 'আজকের দিনে পৃথিবীতে মানুষের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে এই বাণিজ্যের অনুষ্ঠান সবচেয়ে কুশ্রী।' লিখলেন, 'আজকাল কুলশীল রীতিনীতি বুদ্ধি বিদ্যা সমস্ত ছাপিয়ে চোখে পড়ে ধনের বৈশিষ্ট্যতা। এই বৈশিষ্ট্যতার গৌরবই মানুষের সবচেয়ে বড় অগৌরব।' এ যেন মার্কসের 'পুঁজি আসক্তি'রই [ক্যাপিটাল ফেটিশিজম] অন্য ব্যাখ্যা।

আমরা প্রায়ই বলি - দেশ দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে ক্ষুদ্র শোষক গোষ্ঠী, অন্যদিকে ব্যাপক শোষিত জনমানুষ। এর উপলব্ধি রবিঠাকুরের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে এভাবে, 'দেশের যে অতি ক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি-বিদ্যা-ধন-মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের এক দেশ নয়।' আরেক জায়গায় তিনি বলছেন- 'ইংরেজীতে যাকে বলে এক্সপ্লয়টেশন, অর্থাৎ শোষণ নীতি, বর্তমান সভ্যতার নীতিই তাই। ন্যূনাংশিক বৃহদাংশিককে শোষণ করে বড় হতে চায়; এতে ক্ষুদ্র-বিশিষ্টের স্টস্ফীতি ঘটে, বৃহৎ-সাধারণের পোষণ ঘটে না।'

কৌতূহলোদ্দীপক হলো যে, ধনবাদী সমাজে গণতন্ত্র চর্চার সীমাবদ্ধতাও কবিগুরুর দৃষ্টি এড়ায়নি। 'যেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে অত্যন্ত ভেদ আছে সেখানে ডেমক্রেসি পদে পদে প্রতিহত হতে বাধ্য।' এ যেন সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির সাথে রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর দ্বন্দ্বাত্মক সম্পর্কের মার্ক্সীয় অভিজ্ঞানের আরেক সূত্রায়ন।

ক্রমবর্ধমান 'ধন-বৈষম্যের অগৌরব' যে একসময় সমাজ বিপ্লব ডেকে আনতে পারে এবং সেটিকে ঠেকানোর জন্য যে সমাজের কায়েমী স্বার্থ সচেষ্ট থাকে সেটিও রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তার ভাষায়, 'ধনের বৈষম্য লইয়া সমাজে যখন পার্থক্য ঘটে তখন ধনীর দল সেই পার্থক্যকে সমূলে ঘুচাইতে ইচ্ছা করে না, অথচ সেই পার্থক্যটা যখন বিপদজনক হইয়া ওঠে তখন বিপদটাকে ঠেকো দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে চায়।' কবিগুরু যেন এই কথার ভেতর দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজের মূল দ্বন্দ্বের প্রতি ইঙ্গিত করে সংস্কারবাদী চিন্তার প্রতি তির্যক মন্তব্য করছেন।

ভিক্ষা নয়, ভরসা

তাহলে কবিগুরু দেশ ও সমাজে পরিবর্তন কীভাবে আনতে চেয়েছিলেন? তার জন্য পরিবর্তন চিন্তা-ভাবনার মূল ভিত্তি ছিল ইতিবাচক আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় সম্মানবোধ। তিনি তাই বিশ্বাস করতেন 'আমাদের দেশে সকলের চেয়ে বেশি দরকার হাতে ভিক্ষার ঝুলি তুলিয়া দেওয়া নয়, মনে ভরসা দেওয়া।' দেশ ও জাতির বিকাশের জন্য নিজের উপর বিশ্বাস বা আস্থার প্রয়োজনীয়তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে - 'যে দেশে গরিব ধনী হইবার ভরসা রাখে সে দেশে সেই ভরসাই একটি মস্ত বড় ধন। আমাদের দেশের টাকার অভাব আছে, সেটি বলিলে সবটা বলা হয় না। আসল কথা আমাদের দেশে ভরসার অভাব।' লক্ষণীয় বিষয়, 'গরিব ধনী হইবার ভরসা' বর্তমানকালে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক প্রত্যয়, সামাজিক অগ্রাভিমুখী চলিষ্ণুতার [সোশ্যাল মোবিলিটি] সমার্থক।

রবীন্দ্রনাথ তাই জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে - 'আমাদের দেশকে সম্পূর্ণভাবে কেউই কেড়ে নিতে পারে না, এবং সেই দেশকে বাইরে থেকে দয়া করে কেউ আমাদের হাতে তুলে দেবে এমন শক্তি কারও নেই।' এ যেন বৈদেশিক সাহায্য থেকে যে অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়, তার সমালোচনা। এই সমালোচনা আরো তীক্ষ্মভাবে প্রকাশিত হয়, যখন তিনি বলেন, 'ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনো সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। উপরন্তু বিদেশকে যতক্ষণ আমরা কিছু দিতে পারি না, বিদেশ হইতে ততক্ষণ আমরা কিছু লইতেও পারি না; লইলেও তাহার সঙ্গে আত্মসম্মান থাকে না বলিয়াই তাহা তেমন করিয়া আপনার হয় না, সংকোচে সে অধিকার চিরদিন অসম্পূর্ণ ও অসঙ্গত হইয়া থাকে।'

কবিগুরু শুধু যে 'বৈদেশিক পরনির্ভরশীলতা'র সমালোচক ছিলেন তাই নয়, অতিমাত্রায় সরকার-নির্ভরশীলতারও বিরুদ্ধে ছিলেন। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী উদ্যোগকে আহ্বান করে তিনি বলেছেন - 'সরকার বাহাদুর-নামক একটি অমানবিক প্রভাব ছাড়া অভাব নিবারণের আর কোন উপায় আমাদের হাতে নাই, এ রকম ধারণা মনে বদ্ধমূল হতে দেওয়াতেই আমরা নিজেদের দেশকে যথার্থভাবে হারাই।' মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ এখানে ঔপনিবেশিক আমলের সরকারের কথা বলছেন; স্বাধীন দেশের উন্নয়নকামী জাতীয় সরকারের কথা নয়।

প্রতিকার ও পরিবর্তন

কবিগুরু পরনির্ভরশীল মানসিকতা ত্যাগ করে, দেশজ সম্পদকে দেশের মানুষের কাজে লাগাতে বলেছেন। 'আমাদের যাহা নাই তাহার জন্য আমরা রাজদ্বারে ধর্ণা দিয়া পড়ি এবং চাঁদার খাতা লইয়া গলদঘর্ম হইয়া বেড়াই - কিন্তু তাহাকে কেমন করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে, সেদিকে কি আমরা দৃকপাত করিব না?' এ যেন অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদ সমাবেশের নীতি নির্দেশনা।

উপরোক্ত চিন্তার মন্তব্য প্রয়োগের চেষ্টা রবীন্দ্রনাথকে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সমবায় পদ্ধতি প্রচলনে উদ্বুদ্ধ করে। রাশিয়ায় ভ্রমণ করে তিনি লিখলেন, 'আমাদের দেশে পল্লীতে পল্লীতে ধন-উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায় নীতির জয় হোক।' অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তিনি যৌথতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এটি এসেছে তার সাম্য চিন্তার মূল ভাবনা থেকে। কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারেও তিনি উৎসাহী ছিলেন।

আজকাল টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অনেকে [অমর্ত্য সেনের তত্ত্ব অবলম্বনে] দরিদ্রদের স্ব-ক্ষমতা [এন্টাইটেলমেন্ট], বিশেষ করে আয়ের সাথে অন্যান্য সামাজিক খাতের সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধির কথা বলছেন। বর্তমান সময়ে বহু গবেষণার পর আমরা বুঝেছি যে, গুণমানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ সর্বজনীন না হলে দরিদ্র মানুষের সামাজিক অগ্রাভিগমন নিশ্চিত করা যায় না। আশ্চর্যের বিষয়, বহু বছর আগে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, 'আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড় দরকার শিক্ষার সাম্য।' শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বজনীনতা অর্জনের জন্য তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কথা বলেছেন, বিশেষ করে জাপানি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। 'আধুনিক সমস্ত বিদ্যাকে জাপানী ভাষায় সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করে তবে জাপানী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সত্য ও সম্পূর্ণ করে তুলেছে। তার কারণ জাপানীরা শিক্ষা বলতে সমস্ত দেশের শিক্ষা বুঝেছে - ভদ্রলোক বলে এক সংকীর্ণ শ্রেণীর শিক্ষা বোঝেনি।'

ঐক্যবোধের প্রয়োজনীয়তা

দ্রুত আর্থ-সামাজিক বিকাশের জন্য জাতীয় ঐক্যবোধের অপরিহার্যতার প্রতি কবিগুরু বিভিন্ন সময় আমাদের সচেতন করতে চেয়েছেন। বলেছেন, 'আজ আমাদের দেশটা যে এমন বিষম গরীব তাহার প্রধান কারণ, আমরা ছাড়া ছাড়া হইয়া নিজের দায় একলা বহিতেছি। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া কিছুই শক্ত নহে, মিলন ঘটাইয়া তোলাই কঠিন।' অবশ্য অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় শ্রেণি বা গোষ্ঠীস্বার্থের অপঘাতকে স্বীকার করে নিয়ে, রীতিমতো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীর মতো তিনি বলেছেন, 'বিকাশের অর্থই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ।'

কবিগুরুর জন্মবার্ষিকীতে উন্নয়ন চিন্তা ভাণ্ডারে তার মৌল অবদান স্বীকার করে, সমসাময়িক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশের জন্য প্রাসঙ্গিক কতিপয় বিষয়কে তাকে প্রণতি জানিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

০৩ মে ২০১৯
সমকাল

অর্থনীতি কীভাবে বৃদ্ধি পায়?

সৈয়দ ইউসুফ সাদাত

বাংলাদেশের অবিশ্বাস্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা সবারই জানা। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯৭ সালে ২.৯৬ শতাংশ ছিলো, যা বেড়ে ২০১৭ সালে ৬.০৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মাথাপিছু জিডিপি'র ছোট পরিবর্তনগুলো বার্ষিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অনুমানের সরল পদ্ধতিগুলো, যেমন ৬৯.৩, ৭০ বা ৭২ বিধিগুলো ব্যবহার করে (যা বিনিয়োগের দ্বিগুণ হওয়ার সময়কে অনুমান করার জন্য ব্যবহৃত হয়) দেখা যায় যে, মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ২.৯৬ হলে তা দ্বিগুণ হতে ২৪ বছর সময় লাগবে, কিন্তু যদি প্রবৃদ্ধির হার ৬.০৬ শতাংশ হয় তাহলে মাত্র ১২ বছর সময় লাগবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুদূরপ্রসারী আর্থ-সামাজিক প্রভাবের কারণে এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে কৌতূহল রয়েছে।

অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথের বর্ণনায় অর্থনৈতিক বিকাশের তত্ত্বের সূচনা খুঁজে পাওয়া যায়। স্মিথ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, শ্রমের বিভাজনই বর্ধমান উৎপাদনশীলতার স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়া শুরু করেছিলো, যা আরো বিপুল উৎপাদনের সুযোগ তৈরি করেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মূলধন সঞ্চিত হয়েছে, যা প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে সচল রেখেছে।

ডেভিড রিকার্ডো, থমাস ম্যালথাসের মতো অন্যান্য অর্থনীতিবিদগণ এবং পরবর্তীকালের ফ্র্যাঙ্ক র‍্যামসে, অ্যালিন ইয়াং, ফ্রাঙ্ক নাইট ও জোসেফ শাম্পেটার অর্থনৈতিক বিকাশের আধুনিক তত্ত্বগুলোতে অনেকগুলো মৌলিক উপাদান সরবরাহ করেছিলেন। এই ধারণাগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রতিযোগিতামূলক আচরণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ গতিশীলতার প্রাথমিক পদ্ধতি, আয় হ্রাসের ভূমিকা এবং নগদ পুঁজি ও দক্ষ মানব

সম্পদ সংগ্রহের সাথে তাদের সম্পর্ক, মাথাপিছু আয় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের মধ্যে আন্তঃসংযোগ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং এর প্রণোদনার জন্য একচেটিয়া শক্তির প্রভাব।

নিদারুণ মানসিক চাপের ঠিক পরে রয় এফ হ্যারোড এবং এভসিডোমার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এমন একটি মডেল প্রস্তাব করেছিলেন, যেখানে বর্ধিত সঞ্চয় এবং পুঁজির বিনিয়োগ ও উৎপাদনের অনুপাত হ্রাস করে, যার ফলে উৎপাদনশীলতা এবং প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তবে হ্যারোড-ডোমার মডেলটি একটি স্থির গুণাঙ্কের উৎপাদন ফাংশন ব্যবহার করেছিলো, যার সাথে মূলধন এবং শ্রমের মধ্যে কোনো বিনিময়যোগ্যতা ছিলো না। যার অর্থ মডেলটির অন্তর্নিহিত স্থিতিশীল ও অবিচল অবস্থা পরিমিতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিলো, যা সম্পূর্ণ অদ্ভুতভাবে নির্ধারিত হয়েছিলো। সুতরাং হ্যারোড-ডোমার মডেলটিতে অর্থনীতির জন্য প্রবৃদ্ধির স্থির অবস্থায় পৌঁছানো কোনো ছুরির কিনারায় কোনো বস্তুর ভারসাম্য বজায় রাখার মতো কঠিন ছিলো।

সোলো মডেল একটি পরিবর্তনশীল মূলধন-উৎপাদনের অনুপাত ঠিক করে দিয়ে হ্যারোড-ডোমার মডেলের ছুরির প্রান্ত সমস্যার সমাধান করে। পুঁজি এবং শ্রমিক নিয়োগের মধ্যে প্রতিস্থাপনের সম্ভাবনার সাথে উৎপাদনের নিওক্লাসিক্যাল ফাংশন উপস্থাপন করার বিষয়টি প্রবৃদ্ধি চলমান থাকার সাথে সাথে পুঁজি-উৎপাদন অনুপাতকে আলাদা করার একটি উপায় বলে দেয়। এ ছাড়া প্রতিটি ইনপুটে আয় হ্রাসের ধারণাটি সোলো মডেলের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়নের প্রতি জোর দিয়েছিলো। প্রথমত, মডেলটি শর্তসাপেক্ষে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বাভাস দেয়। এর অর্থ মাথাপিছু জিডিপির প্রারম্ভিক স্তরটি যতো কম হবে, দীর্ঘমেয়াদী বা স্থির অবস্থার তুলনায় তার প্রবৃদ্ধি ততো দ্রুত হবে। দ্বিতীয়ত, এটি আরো ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো যে, প্রযুক্তিতে অব্যাহত উন্নতির অভাবে মাথাপিছু জিডিপির প্রবৃদ্ধি অবশেষে বন্ধ হয়ে যাবে।

রবার্ট সোলোর এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের পরে ডেভিড ক্যাস এবং জালিং কুপম্যানস ফ্র্যাঙ্ক পি র‍্যামসের গ্রাহক আনুকূল্যের বিশ্লেষণকে সোলো মডেলের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন এবং এর মাধ্যমে সঞ্চয়ের হার নির্ধারণে একটি অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা করেছিলেন। র‍্যামসে-ক্যাস-কুপম্যানস মডেলে সঞ্চয়ের হার নির্ধারণ হয়েছিলো প্রতিযোগিতামূলক বাজার বিবেচনা করে মানুষের অনুকূলকরণের মাধ্যমে। এটি চেষ্টা করেছিলো এমন গ্রাহক ও সঞ্চয় নির্বাচন করতে যা তাদের উপযোগিতাকে সর্বাধিক করে একটি অসীম দিগন্তে নিয়ে যাবে, যা হবে আন্তঃসাময়িক বাজেটে সীমাবদ্ধ একটি বিষয়।

ক্যাস এবং কুপম্যানসদের গবেষণা ছাড়াও যেসব প্রবৃদ্ধির মডেল কাজের মাধ্যমে শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন উপস্থাপন করে সেসব মডেল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তবে ধীরে

ধীরে এমন মডেলগুলোর উপর থেকে জোর সরে যায়, যেগুলোতে দীর্ঘমেয়াদী মাথাপিছু প্রবৃদ্ধির হার বহির্মুখী প্রযুক্তিগত অগ্রগতির হারের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিলো। এভাবে অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধির মডেলগুলো উত্থিত হয়েছিলো, যেখানে প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারিত হয়েছিলো স্বয়ং মডেলগুলোর মধ্যেই। অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধির সাম্প্রতিক তত্ত্বগুলো আয় বৃদ্ধি, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম, মানব সম্পদ এবং প্রযুক্তি বিস্তারের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০১১ সাল থেকে প্রতি বছর ৬ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৮ সালে বন্যা এবং ১৯৯৯ সালে ঘূর্ণিঝড়ের পর ১৯৯৯ সালে প্রবৃদ্ধির হার ৫ শতাংশের নিচে নেমে যায়। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ারে হামলার পর ২০০২ সালেও প্রবৃদ্ধি নিম্নগামী হয়ে পড়েছিলো। ২০০৬ থেকে ২০০৮ এবং ২০১৪ সালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো, যেখানে ২০১১-১২ তে অর্থনীতি ধীরগতি হয়ে পড়ার আংশিক কারণ ছিলো পেমেন্ট ক্রাইসিসের ভারসাম্যহীনতা। এই অবনতিগুলো বেশিরভাগই প্রবৃদ্ধিকে হালকা ঝাঁকুনি দিয়েছে, কিন্তু বড় কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। বাংলাদেশের অর্থনীতির তথ্য থেকে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দ্রুত সংকট কাটিয়ে উঠেছে এবং এর উর্ধ্বমুখিতা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২০১৭ এবং ২০১৮ উভয় বছরেই ৭ শতাংশের উপরে ছিলো। বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২০৩০ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি বছরে প্রায় ৯ থেকে ১০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে কীভাবে এর সুবিধা ভাগ করা হবে তা এই প্রবৃদ্ধি প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। শেষ কথা হলো, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রয়োজনীয়, তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এটি যথেষ্ট নয়।

[*অনূদিত*]

১০ মে ২০১৯
দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস

Our incomprehensible obsession with GDP

Fahmida Khatun

Our obsession with Gross Domestic Product (GDP) seems to be growing every day while economists keep questioning its source, method, authenticity, etc.

There is no doubt that Bangladesh's economy has been doing far better than before. But this is not new. Every decade has given us one additional percentage of GDP growth in Bangladesh. For an economy which starts from a low level of growth but is making efforts to move forward, its growth rate will be higher than economies which have already crossed that trajectory and become advanced countries. Thus comparing our GDP growth with those countries is flawed.

While Bangladesh may exceed some of the advanced economies in terms of its GDP growth rate and size, it may still be behind in terms of addressing inequality and ensuring distributive justice. As it stands now, the top five per cent of the population possess about 29 per cent of national income while the bottom five per cent account for only 0.23 per cent of the national income. The pace of poverty reduction is slowing while the speed of the growth of the ultra-rich population is increasing. Inequality in consumption and asset ownership is also on the rise. Thus the distributional aspect is totally absent in the GDP concept.

The limitations of GDP are rooted in the way it is calculated. GDP refers to the goods and services produced in a country in a given year. That is all. It does not say anything more than that. It cannot say whether the quality of life has improved or not, whether everyone has received the benefit of that growth or not, whether it has reduced inequality or not, whether the growth is sustainable or not, and so on. Since GDP is the market value of goods and services, whatever is transacted in the market in exchange for money contributes to GDP. Herein lies the danger. The GDP calculation method does not care about the source of such contributions.

One of my favourite examples is the issue of environmental degradation. The intrinsic value of the environment is not taken into consideration as it does not have a market price. Infrastructural or industrial development may happen by wiping out forests and trees. Construction activities or industrial products will increase GDP. If those trees are sold in the market, even that would add to GDP. But what is the real cost of such development? If one takes into account the cost of environmental degradation and natural resource depletion, the sustainable growth rate or 'green' GDP would be much less than the estimated growth rate.

GDP also does not take into account the unpaid household activities performed by women. When my mother used to cook for us, she did not contribute to GDP even though without her care and domestic work, we could not have studied or worked outside and contributed to the economy. But had she sold the food she prepared, she would have added to economic growth! GDP is all about spending money in the economy. Thus when my father retired and was left with pension only, his contribution to GDP immediately fell.

This obsession with GDP overlooks the core problems of the economy. Private investment is stuck at around 23 per cent of GDP—inadequate for maintaining such a growth momentum and for creating enough jobs for the youth. Public investment is increasing mainly on physical infrastructure, while social infrastructure is being ignored. There is low investment in public education, and barely any monitoring of the quality of the mushrooming roadside private educational institutions

that provide certificates but cannot convert certificate-holders into useful human capital. Thus their employability is low despite a crying demand for skilled human resources.

With an allocation of two per cent of GDP towards education, one does not expect better. Healthcare receives even less than one per cent of GDP. Hence the poor facilities in public hospitals and clinics, particularly outside the capital, deprive larger communities of quality healthcare. People spend almost 72 per cent of their total health costs out of their own pockets. Out-of-pocket expenditure on health is highest in Bangladesh compared to other South Asian countries. Rule of law, social justice, safety and security are everyday concerns. While we boast about achieving many gender-related targets, violence against women and girls has become endemic. Numerous such incidents go unnoticed as they are not reported. Perpetrators get away with such heinous crimes by resorting to political power.

As I sign off writing this column, an alarming piece of news flashes on the screen. Bank defaulters have been rewarded with a spectacular rescheduling facility. They can delay their loan repayment by paying only two per cent down payment rather than the existing 10-15 per cent. They will have to pay only a maximum of nine per cent interest on their rescheduled loans, but the existing rate is 12-16 per cent. Their repayment tenure is 10 years with a grace period of one year. Burdened with soaring loan defaults, the banking sector is now taking a U-turn instead of solving the problems once and for all. This will only encourage willful defaulters. It risks putting pressure on the liquidity situation and net profit of banks. Such facilities may provide temporary breathing space for the defaulters, but this will have a negative impact on the banking sector.

So, what type of growth are we talking about? Because GDP growth is only a hazy number that does not address the fundamental aspects of economic development. This highly politicised number does not say much about the quality of life of all citizens.

19 May 2019
The Daily Star

প্রবৃদ্ধি এখন ভোগবৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে

ফাহমিদা খাতুন

গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, সামগ্রিক একটি সংস্কার না করে রাজস্ব আয়ে তেমন একটি উন্নয়ন ঘটানো যাবে না। এক দিকে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে আবার সেখানে সংস্কারও করতে হবে। অবশ্যই এর প্রযুক্তিগত ব্যবহারের মাধ্যমে এটি আদায় করা সম্ভব। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন নুর নাহার।

ড. ফাহমিদা বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শুধুমাত্র একটি অবকাঠোমোগত উন্নয়ন নয়। প্রতিষ্ঠানগুলো যে স্বাধীনভাবে কাজ করার যে ব্যবস্থা ও পরিবেশ দরকার সেটি তৈরি না হলে রাজস্ব আয় সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, যদি সত্যিকারভাবে খেলাপি ঋণ বাস্তবায়ন করতে হয়, তাহলে সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার পরিবর্তন না করে খেলাপি ঋণ আদায় করা যাবে না। শুধু মাত্র কথার কথা লক্ষ্যমাত্রা দিলাম এভাবে হবে না। দেখা যায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ আজকাল বড় বড় ঋণগুলো নেয় সেগুলো এই ভেবে নেয় যে আর পরিশোধ করতে হবে না। কারণ সেই প্রতিষ্ঠানগুলো যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেটি পারে না। এখানে একটি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা প্রভাব থাকে।

তিনি আরো বলেন, খুবই দুঃখজনক যে বাজেটে কৃষকের জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। এটি যে শুধু কৃষকের সমস্যা তা নয়। এটি সামগ্রিকভাবে বিশ্বেরও একটি সমস্যা। যে কৃষক আমাদের জন্য খাদ্যের যোগান দিচ্ছে তারা যদি প্রণোদনা না

পায়, উৎপাদনের যথাযথ মূল্য না পায়, তাহলে আমরা খাদ্যে যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। সেখানে আঘাত আসবে। অন্যান্য খাতও গুরুত্বপূর্ণ। গত ৩০-৩৫ বছর ধরে পোশাক খাতে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়েই আসছে। তিনি বলেন, প্রবৃদ্ধি এখন ভোগবৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের প্রবৃদ্ধি তো কর্মসংস্থান বাড়াতে পারবে না, বৈষম্য কমাতে পারবে না। প্রবৃদ্ধি তো বৈষম্য এটি শুধু সংখ্যার মধ্যেই আটকে থাকবে।

১৪ জুন ২০১৯
আমাদের সময়

প্রবৃদ্ধির কাহিনি যেন উন্নয়নের শত্রু না হয়

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ও অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন নতুন বাজেটের বিভিন্ন দিক, নানাজনের প্রতিক্রিয়া, বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও অর্থনীতির সামনের দিনগুলোর নানা দিক নিয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শওকত হোসেন ও প্রতীক বর্ধন।

প্রথম আলো: সরকার টানা ১১তম বাজেট দিল। এক সরকার কখনো এতগুলো বাজেট টানা দেয়নি। নিশ্চয়ই এর একটি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেট সম্পর্কে কী বলবেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটি যেমন ধারাবাহিকতার বাজেট, তেমনি নবসূচনারও বাজেট। এর আগে একই শাসক দলের অধীনে এতগুলো বাজেট আমরা দেখিনি। এবারের বাজেটের অভিনব ব্যাপারটি হলো, এটি যেমন নতুন সরকারের প্রথম বাজেট, তেমনি নতুন অর্থমন্ত্রীরও প্রথম বাজেট। আশা করেছিলাম, নতুন অর্থমন্ত্রী নিজের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখবেন। নীতিকাঠামোর ক্ষেত্রেও এতে একটি সন্ধিক্ষণ আছে: সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছর এটি, আছে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, অন্যদিকে ২০১৫ সালে সরকার বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বাক্ষর করে এসেছে। আবার একটি ছেদবিন্দুও আছে। এই দুইয়ের সম্মিলনেই আমরা বাজেট দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা রক্ষিত হলো, অভিনবত্ব পিছিয়ে গেল।

অভিনবত্বে মার খাওয়ার ব্যাপারটি হলো এ রকম যে আমরা ভেবেছিলাম, সম্প্রতি অর্থনীতিতে যেসব চাপ সৃষ্টি হয়েছে, বাজেটে তার একটি স্বীকারোক্তি থাকবে এবং তা

মোকাবেলার কৌশল থাকবে। আর সেই কৌশল রাজস্ব আদায় আর বরাদ্দ দেওয়ার মধ্যে সীমিত থাকবে না। সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য রাজস্ব আদায় ছাড়া যেসব প্রচলিত কৌশল আছে, তা ব্যবহার করা হবে। যেমন টাকার বিনিময় হার নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাজারমূল্য, খুচরা মূল্য নির্ধারণ করা, রপ্তানির ক্ষেত্রে যেসব বাধ্যবাধকতার মধ্যে কাজ করতে হয়, সেগুলো নির্ধারণ করা বা স্থানীয় সরকারকে আরো বড় পরিসরে ব্যবহার করা – এসব কৌশল একত্র করার চেষ্টা দেখলাম না। প্রস্তাবিত বাজেট শেষমেশ বরাদ্দের মধ্যেই সীমিত হয়ে গেল। চাপটা রাজস্বের উপরই পড়ল। অথচ বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে কম রাজস্ব আদায়কারী দেশগুলোর একটি।

অভিজ্ঞতা বলছে, বাংলাদেশের বর্তমান কাঠামোর মধ্যে যেটুকু করার ছিল, গত ১০ বছরে তা করা হয়ে গেছে। বলা যায়, প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে। আমরা এই কাঠামোর মধ্যে আটকে গেছি। অর্থাৎ, ২৫ শতাংশ রাজস্ব আদায় হবে না, আর বাজেট বাস্তবায়িত হবে ৮০ শতাংশের মতো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পার্থক্য বাড়ছে। অর্থাৎ প্রথমত, বাজেট বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো স্বীকার করা হলো না; দ্বিতীয়ত, সামষ্টিক অর্থনীতির কৌশল ঠিক করা হলো না; তৃতীয়ত, সংস্কারের পথে যাওয়া হলো না। ব্যাংক খাত, স্থানীয় সরকারের সংস্কার তো দূরের কথা, আমার গ্রাম, আমার শহরের মতো কর্মসূচি দিয়ে যে সমাজভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক অর্থনীতির বীজ উপ্ত হতে পারতো, তা-ও হলো না।

একই সঙ্গে বাজেটটি সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের সঙ্গে যুক্ত হলো না। মনে হয়, পরিকল্পনা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যে সমন্বয় দরকার, তা নেই। পাশাপাশি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন – এদের মধ্যে যে আন্ত ও অন্ত সমন্বয় দরকার, তা নেই।

প্রথম আলো: বর্তমান অর্থমন্ত্রী তো পরিকল্পনামন্ত্রী ছিলেন। ফলে আরো জোরালো সমন্বয় আশা করাটা কি বাতুলতা? আর ব্যক্তিবদলের ছাপ অর্থনীতিতে পড়ে না কেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শাহ এ এম এস কিবরিয়া কিংবা সাইফুর রহমানের আমলে অর্থনৈতিক বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ছিল। এই ভূমিকা গত ১০ বছরে ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই তা এখন উচ্চপর্যায় থেকে পরিচালিত হচ্ছে। অনেক সময় আবার পরিচালনা কেন্দ্র অদৃশ্য থেকেছে। আগের অর্থমন্ত্রীরা একটি প্রাতিষ্ঠানিক দল গঠন করতেন, অপ্রাতিষ্ঠানিক উপদেষ্টা থাকতেন। এখন অর্থমন্ত্রীর ভূমিকা ম্লান হওয়ার

পাশাপাশি পেশাজীবীদের ভূমিকাও সংকুচিত হলো। এমনকি জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকাও ম্লান। বাজেট আমলানির্ভর হয়ে গেল। বিভিন্ন স্তর থেকে উদ্ভাবনী চিন্তা নিয়ে এসে কীভাবে বাজেটে যুক্ত করা যায়, সেই চেষ্টা অর্থমন্ত্রী করেননি। অর্থমন্ত্রী অবয়বের দিকে যতটা নজর দিয়েছেন, অন্তরের দিকে ততটা দেননি।

প্রথম আলো: তাহলে সরকারের কী করার ছিল? আবার অনেকেই বলেন, অর্থনীতি তো ভালোই আছে, সমস্যা কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশ তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয়ে ভালো করছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলাদেশ কি ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে ভালো করছে? যথেষ্ট কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে? পুঁজিবাজারে ভালো করেছে? গরিব মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যে ভালো করেছে কি? তাই গড় দিয়ে বিচার করা কতটা ভালো হবে? যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক সংকট শুরুর আগের দিন পর্যন্ত মার্কিন সরকার বলেছে, এর চেয়ে ভালো অর্থনীতি আর নেই। সবচেয়ে ভালো অর্থনীতিরও কিছু চ্যালেঞ্জ থাকে। বিপর্যয় যেদিন ঘটে, সেদিনই বোঝা যায়। আশঙ্কার ব্যাপার হচ্ছে, বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির যে চলমান কিংবদন্তি, তা যেন আগামী দিনে তার উন্নয়নের শত্রু না হয়ে যায়।

সবকিছুরই একটি ব্যবহারজনিত ক্ষয় থাকে। বাংলাদেশেরও ১০ বছর ধরে যে ধারা চলে আসছে, তারও আছে। এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উন্নয়নের ধারার সঠিকতা, স্থায়িত্ব ও ফলাফল নিয়ে আলোচনার সময় এসেছে। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ এই হারে বাড়িয়ে ব্যক্তি বিনিয়োগের অভাব পূরণ করাটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। বিমানকে তো দু'টি ইঞ্জিন নিয়ে চলতে হয়। কিন্তু আমরা একটি ইঞ্জিন দিয়ে চলছি। আমাদের ধারণা ছিল, ব্যবসার ব্যয় কমালে বা সুদের হার কমালে ব্যক্তি খাত উৎসাহিত হবে। পুঁজিবাজারে প্রণোদনা দিলে ভালো বিনিয়োগ আসবে। কিন্তু তা হয়নি।

একসময় দেশে খাদ্যের দুর্ভিক্ষ ছিল। এরপর আমরা অবকাঠামোর দুর্ভিক্ষ দেখলাম। এটি কাটানোর জন্য বিদ্যুৎ, রাস্তা নির্মাণসহ নানা বড় প্রকল্প করতে শুরু করলাম। দেখা গেল, ১ হাজার টাকার জিনিস হাজার টাকায় উঠে গেল এবং তা যেন শেষ আর হয় না। আর এগুলো অভ্যন্তরীণ অর্থায়নে হওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগে চাপ সৃষ্টি হলো। এতে এত টাকা চলে গেল যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ আর বাড়ানো গেল না। ফলে আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এত বেশি মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম যে এটি যে আদতে আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রাগৈতিহাসিক ধারণা, তা ভুলে গেলাম।

অন্যদিকে আমাদের ঋণ বাড়ছে। বড় ঋণের স্বচ্ছতা নেই। ফলে দায়দেনা পরিশোধের টেকসই পরিস্থিতি আছে কিনা, সেটি দেখাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বরাদ্দের ক্ষেত্রে বলতে হয়, পাঁচটি খাত ৭০ ভাগ নিয়ে যাচ্ছে আর বাকি ১২টি খাত ৩০ শতাংশ। এর মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে - সেই ২ ও ১ শতাংশেই আটকা পড়ে রইলাম আমরা। অর্থনীতির ভাষায় বলতে হয়, সরকারের আন্তখাত ভারসাম্য রাখতে হবে। অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও তো দক্ষ মানবসম্পদ লাগবে, শিক্ষায় এই বরাদ্দ দিয়ে তো সেটি করা যাবে না।

অন্যদিকে, অবকাঠামো ও রপ্তানি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে আমরা কৃষিকে অবহেলা করলাম। পুরো বাণিজ্য শর্ত কৃষকের বিরুদ্ধে চলে গেছে। কৃষির যথেষ্ট যন্ত্রীকরণ না হওয়ায় উৎপাদনশীলতা কমেছে। কিন্তু তাতে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা কমেনি। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণেও কৃষি অবহেলিত হচ্ছে। ব্যাপারটি হলো, তৈরি পোশাক খাতের প্রতিনিধিরা যে রকম শক্তিশালী সংগঠন নিয়ে দর-কষাকষি করতে পারেন, কৃষক তা পারেন না। তার সেই অভিন্ন প্রতিনিধিও নেই। সামাজিকভাবেও কেন যেন কৃষকেরা হারিয়ে গেছেন। কৃষি নিয়ে গত শতকের আশি ও নব্বইয়ের দশকে যে পরিমাণ গবেষণা হতো, এখন তার লেশমাত্র নেই। সবাই শিল্পায়ন, অবকাঠামো ও রপ্তানি নিয়ে আলোচনা করে।

প্রান্তিক মানুষের কথাও গড় চিন্তার মধ্যে কোথাও নেই। জেন্ডার বাজেট, প্রবীণ বাজেট, শিশু বাজেট – সবই আছে, কিন্তু এই বাজেট কতটা বাস্তবায়িত হলো, তা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা নেই। যদিও এবার কিছুটা হয়েছে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বোর্ডকে দেওয়া সরকারের সহায়তা একদম কমে গেছে। কিন্তু প্রতিবন্ধী ও শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষের জন্য কিছু রাজস্ব পদক্ষেপ ছাড়া কিছু নেই। ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, হাওর অঞ্চলের মানুষ – এদের জন্য কিছু নেই। এসব কথার পরোক্ষ প্রতিফলন নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল। কিন্তু বাজেটে নেই। তবে ইশতেহারকে আমরা ভিত্তি ধরতে চাই।

আমরা যে রাজনীতির কথা বলি আর যে অর্থনীতির চর্চা করি, তার মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা। যে রাজনীতি অর্থনীতির দ্বন্দ্ব ধারণ করে না, সেই রাজনীতি টেকসই হবে না। বাংলাদেশের ইতিহাস তাই বলে। তবে এই দু'টিকে সংযুক্ত রাখতে পারত জবাবদিহিমূলক গণতন্ত্র, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার্যকর গণতন্ত্র।

প্রথম আলো: সরকার তো সমস্যার কথা স্বীকারই করছে না, বরং তার মধ্যে অস্বীকৃতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তো এর সমাধান কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: রাজনীতিবিদেরা অনেক সময় দুই স্তরে কথা বলে থাকেন। একটি কথা বলেন ভোটার ও নাগরিকদের আশ্বস্ত করতে, ঘরে গিয়ে তারা এর যৌক্তিকতা বুঝে সমাধানের চেষ্টা করেন। ব্যাপারটি যদি এ রকম হয়, তাহলে চিন্তা নেই। কিন্তু তারা যদি ঘরে গিয়েও তা বিশ্বাস করেন, তাহলে দুশ্চিন্তার কারণ আছে। তাহলে অস্বীকৃতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু অর্থনীতি নিজের গতিতেই চলবে। ব্যাংকের তারল্য চাহিদা পূরণের জায়গায় নেই, এ কথা অস্বীকার করে লাভ কী। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারি শিক্ষা যাচ্ছে না। সেই জায়গা নিয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা। এসব অস্বীকার করে লাভ নেই। তাদের বুঝতে হবে, এসব সমস্যা সমাধান করলে আগামী ১০ বছর ক্ষমতায় থাকার নিশ্চয়তা পাওয়া যেতে পারে। রেহমান সোবহানকে উদ্ধৃত করে বলতে চাই, 'আমার সমালোচক, আমার বন্ধু'। গুটি কয়েক মানুষ ছাড়া দেশের উন্নতি আমরা সবাই চাই। কেউ কারো চেয়ে দেশকে কম ভালোবাসে না। আর সমালোচনাকে সম্মানের সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে।

প্রথম আলো: বাজেটের ভালো দিক কী কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ভালো দিক অনেকই আছে। রাজস্ব আয়-ব্যয় কাঠামোতে বাস্তবতা আনার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০১৯-২০ এর প্রাক্কলনগুলো ২০১৮-১৯ এর নিচে, দেশজ আয়ের অনুপাতে। ঘাটতি অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিদেশি সাহায্য ব্যবহারের চেষ্টা ইতিবাচক মনে করি। প্রত্যক্ষ কর বাড়ানোর চেষ্টা ইতিবাচক। ভ্যাট আইনে স্তর অনেক বেশি থাকলেও তা চালু করা হয়েছে। তাও ঠিক আছে। বরাদ্দের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক দিক আছে। যুবকদের জন্য তেমন কোনো কর্মসূচি না থাকলেও তিন কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে। তবে এই সংখ্যা নিয়ে একটু সমস্যা আছে। এ ছাড়া জমি বিক্রি, বিদ্যুতের লাইনসহ নানা কাজে টিআইএন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে – প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ব্যবসায়িক ভাড়ার ক্ষেত্রে ভ্যাট অতিরিক্ত অঙ্ক হিসেবে ভাড়াটে দেবেন, নাকি বিদ্যমান ভাড়া থেকে কেটে নেওয়া হবে, এ নিয়ে বড় ধরনের সমস্যা হতে পারে।

প্রথম আলো: এবারের বাজেটকে আপনারা অর্থনৈতিক অপশাসনের সুবিধাভোগীদের বাজেট বলছেন। এটি কি নির্বাচনের ধরনের কারণে নতুন এক সুবিধাভোগী শ্রেণি তৈরি হয়েছে? আবার এবার কি বাজেট নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা বেশি হচ্ছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাজেটকে কেন্দ্র করে মানুষ জমে থাকা ক্ষোভ বা হতাশা প্রকাশ করেছে কিনা, আমরা জানি না, এ নিয়ে গবেষণা নেই। তবে আমাদের প্রতিক্রিয়ার কারণ হচ্ছে নির্বাচনী ইশতেহার। ইশতেহার দেখে আমাদের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল।

নতুন অর্থমন্ত্রী এসেছেন, সেটিও একটি কারণ। সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন কথায় আমাদের আস্থা তৈরি হয়েছিল। মনে হয়েছিল, তারা দিনবদল বা পরিবর্তন চান। কিন্তু না বদলানো মানুষের কাছে তারা জিম্মি হয়ে থাকছেন। এসব মানুষই ঋণ খেলাপ করছে, কর দিচ্ছে না, বিদেশে টাকা পাচার করছে, সরকারি প্রকল্পের ব্যয় বাড়াচ্ছে, নানা অপকর্ম করছে। সরকার এসব মানুষের পক্ষে কেন দাঁড়াবে? রাজনীতির অ আ ক খ দিয়ে এটি মেলানো যায় না। অথচ আওয়ামী লীগ ঐতিহাসিকভাবে কৃষক, ছোট উৎপাদক, বিকাশমান মধ্যবিত্ত ও পেশাজীবীদের পক্ষের দল ছিল। এখন কি তাহলে এই দলের শ্রেণিভিত্তি বদলে গেল? আবার এই দলের অর্থনৈতিক কর্মসূচি জনবান্ধব, বাস্তবায়ন মানুষের প্রতিকূলে – এই দ্বন্দ্বের সমাধান কীভাবে হবে? প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার মধ্য দিয়ে এই আলোচনা উঠে না এলে এই দ্বন্দ্বের নিরসন হবে না। তাহলে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের ভিত টেকসই হবে না। ২০৪১ তো দূরের কথা।

প্রথম আলো: সামনের ১০ বছরকে দৃষ্টিতে রেখে এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের উত্তরণের পথ কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আসছে। গতানুগতিকভাবে অর্থনীতিবিদদের প্যানেল তৈরি না করে বিভিন্ন পেশার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বহুপক্ষীয় কমিটি গঠন করে গত ১০ বছরের সফলতার মূল্যায়ন করা উচিত। তাদের কাজ হবে, অর্জিত সফলতা কীভাবে টেকসই করা যায় এবং এর ফলে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, তা সমাধানের পথ বাতলানো। তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নির্মোহভাবে এই কাজ করতে হবে। আর সে সময় সরকারের নির্বাচনী ইশ্‌তেহার ও এসডিজি সামনে রাখতে হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে আমরা সেই অর্থে সুযোগ হিসেবে নিতে পারি। এটির উদ্দেশ্য দোষ খোঁজা নয়, সফলতাকে টেকসই করার জন্য। সরকার যতটা চাইবে, নেবে; সবটা নিতে হবে, তেমন নয়। দলীয় চিন্তা থেকে নয়, জাতীয় চিন্তা থেকে এটি করতে হবে। সমমনা মানুষ নয়, বৈচিত্র্যপূর্ণ চিন্তার সমাবেশ ঘটাতে হবে এতে। এটি এ জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে অসহিষ্ণু মনোভাবের কারণে সব ধাক্কা খাচ্ছে। আমরা অর্থনৈতিক যুক্তি দিয়েই এসব বলছি। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তা বিচার করা হচ্ছে।

প্রথম আলো: আপনাকে ধন্যবাদ।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ।

২৩ জুন ২০১৯
প্রথম আলো

প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হতে পারে উন্নয়নের সহায়ক

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

রাহুল রাহা: *দর্শক, আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ ২৪-এর নিয়মিত আয়োজন 'জনতন্ত্র গণতন্ত্র' অনুষ্ঠানে। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রাজনীতি ও অর্থনীতি। আর আলোচনা করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো এবং প্রথম নির্বাহী পরিচালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। আপানাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে।*

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ।

রাহুল রাহা: যেহেতু দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, দর্শক বুঝতেই পারছেন, আমাদের প্রথম দৃষ্টি থাকবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে। আমরা রাজনীতি নিয়েও আলোচনা করব। আমরা যদি সময় পাই তবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করব। আর অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করলে সুশাসন নিয়ে আলোচনা হবেই। সেক্ষেত্রে উনার বক্তব্য এবং সরকারের বক্তব্য নিয়েও আমরা আলোচনা করব। শুরুতেই আমি যে প্রসঙ্গটি তুলতে চাই তা হলো, এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি, সরকারের বিভিন্ন যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, যাদের কাছে ২ লাখ কোটি টাকার উপর রয়েছে - রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও তাদের আলাদা করে টাকা আছে - তাদের টাকা আনা যায় কিনা, সরকার সেই চেষ্টা করছে। সরকার সড়কগুলোতে টোল বসাবে বলছে এবং বিভিন্নভাবে তারা টাকার দিকে নজর দিচ্ছে। একই সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বড় প্রকল্পগুলো চলছে। এর মধ্যেই আমরা সাম্প্রতিককালে কিছু রিপোর্ট দেখেছি যে প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ অন্যতম শীর্ষে

এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শীর্ষতম স্থানে। এগুলো কি বিপরীত, নাকি একটির সঙ্গে আরেকটি যুক্ত, এ ছাড়া এটি কি যৌক্তিক? আপনার কী মনে হচ্ছে?

চাপের মধ্যে অর্থনীতি

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ রাহুল। আমি অনেক দিন পরে টেলিভিশনে এসেছি, এই ধরনের আলোচনা করার অভ্যাস কমে গেছে। তাই আপনি আমাকে ঠিকঠাক পথ দেখাবেন, পরামর্শ দেবেন। গতবার বাজেটের প্রাক্কালে বাংলাদেশের অর্থনীতির যে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ছিল, সেটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছিলাম, বিগত এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশের সামষ্টিক বা সার্বিক অর্থনীতির পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি চাপের মধ্যে আছে। যে সময়টির কথা বলছি তখন কিন্তু বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারাতেই ছিল। আপনি বলছেন এই উচ্চ প্রবৃদ্ধির হারের সাথে সামষ্টিক অর্থনীতির, বিশেষ করে আপনি যে আর্থিক পরিস্থিতির কথা বললেন সরকারের, কোনো বৈপরীত্য আছে কিনা? সরকারের যে বড় কয়েকটি সমস্যার কথা আমরা বলেছিলাম তার মধ্যে একটি বড় সমস্যা হলো রাজস্ব পরিস্থিতি। বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ের হার এই অঞ্চলের মধ্যে সর্বনিম্ন এবং পৃথিবীতে সমধর্মী দেশের মধ্যেও যা সবচেয়ে কম, মাত্র ১০ শতাংশ। সম্প্রতি এতে বড় ধরনের উল্লম্ফন আমরা দেখিনি। অন্যদিকে সরকার কিন্তু ব্যয় বাড়িয়ে চলেছে। অর্থাৎ সরকারের আয় কম হলেও একদিকে যেমন ব্যয় বেশি হচ্ছে, তেমনি প্রবৃদ্ধিও বেশি হচ্ছে। এ জন্য এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা আগেও বলেছিলাম, সর্বশেষ জুন পর্যন্ত যে পরিস্থিতি তাতে এই বছরের রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশের কিছু বেশি, যেটি তার আগের বছর প্রায় ১৭ শতাংশ ছিল। অর্থাৎ রাজস্ব আদায় যে কম শুধু তাই নয়, রাজস্ব আদায়ের হারেও পতন ঘটেছে। সিপিডি'র হিসাব মতে আমরা প্রথমে বলেছিলাম, ৮৫ হাজার কোটি টাকার মতো কম হবে এবার। কিন্তু হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকার মতো কম হবে। সরকারের রাজস্ব পরিস্থিতি যেহেতু একটু দুর্বল, সেহেতু প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে এই আর্থিক ঘাটতি মেটানোর জায়গা কোথায়? সরকারের আর্থিক ঘাটতি মেটানোর জায়গাগুলোর মধ্যে একটি বড় ক্ষেত্র হলো অভ্যন্তরীণ ঋণ। আপনারা জানেন, সরকার সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে ঋণ নেয়। এই একমাসে জাতীয় সঞ্চয়পত্র বিক্রি বেড়েছে, কিন্তু গত বছরের জুলাই-আগস্ট মাসের তুলনায় কম। সঞ্চয়পত্র বিক্রির ক্ষেত্রে আমাদের সবারই এক ধরনের দ্বিধা থাকে। একদিকে এটি বিক্রির ফলে সরকারের ব্যয় বাড়ে - অন্য ঋণ নেওয়ার চেয়ে - আবার অন্যদিকে এর মাধ্যমে অনেক নিম্ন বা সীমিত আয়ের মানুষ সংসারের ব্যয় নির্বাহ করে থাকেন। সরকার এটি নিয়ে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকেন, আমরাও থাকি। এই পরিস্থিতিতে সঞ্চয়পত্র বাদ দিয়ে সরকার ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নেওয়া শুরু করবে।

ব্যাংকিং খাতের জন্য এটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই মুহূর্তে সবাই জানেন, ব্যাংকের নিজেরই তারল্য কম। ব্যাংক থেকে যারা টাকা নেন, তারা টাকা ফেরত দেন না। যদি সুযোগ পাই, ব্যাংকের ব্যাপারে আমি আলাদাভাবে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব।

ব্যাংকের টাকা নিতে গেলে ব্যক্তি খাতে যেই ঋণ দেওয়ার কথা, সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যাবে না। আর ব্যক্তি খাতে ঋণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হলে বিনিয়োগ বাড়বে না। তখন সরকারের জন্য আরেকটি রাস্তা খোলা থাকে, তা হলো বৈদেশিক সাহায্য। এখন বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে, যেমন জমি অধিগ্রহণ, সেটির তত্ত্বাবধান ঠিকঠাক করা, দরপত্র আহ্বান - এসবের মধ্যেই সমস্যা আছে। তখন শেষ পর্যায়ে সরকারের সামনে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে তাকে নতুন উৎস থেকে টাকা নিতে হয়। সরকার তথাকথিত অলস টাকা নিয়ে আসতে চাচ্ছে। এখন টাকা তো অলস নয়, যে প্রতিষ্ঠানগুলো এসব টাকা রেখেছে, তারা তো কোনো না কোনো ব্যাংকে রেখেছে, ওই ব্যাংক কাউকে না কাউকে তারল্য দিচ্ছে। সেহেতু এদিক থেকে দেখলে অলস একটি তথাকথিত শব্দ। আপনি টোলের কথা বলেছেন, এর মধ্যে আরো সম্প্রতি যেটি হয়েছে শুনেছেন এক সময়ে বলা হয়েছে, ব্যাংকে আর পুঁজি দেওয়া হবে না। এবং সম্প্রতি ঈদের মধ্যেও টাকা-পয়সা দেওয়ার ক্ষেত্রে, চামড়া কেনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল। আমরা যেটি বাজেটের আগেও বলেছি, আরো অনেকেই বলবে, সরকারের তারল্য সংকট হচ্ছে কিনা। আসলে সরকার এখন একধরনের আর্থিক চাপের মধ্যে আছে এবং আমি এই আর্থিক চাপের উৎসগুলো বললাম।

প্রবৃদ্ধির আখ্যান

রাহুল রাহাঃ তাহলে প্রবৃদ্ধি কীভাবে হচ্ছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ প্রবৃদ্ধির দু'টি ব্যাখ্যা আছে। একটি ব্যাখ্যা আছে পরিসংখ্যানগতভাবে। পরিসংখ্যানগতভাবে আমরা দেখিয়েছি, এই প্রবৃদ্ধির জন্য যে ধরনের অনুঘটক লাগে, যে সমস্ত অনুষঙ্গ লাগে সেগুলো অনুপস্থিত। অন্য কথায়, বিদ্যমান অনুষঙ্গ বা অনুঘটকের সঙ্গে এই প্রবৃদ্ধি মেলে না। যেমন গত বছর ব্যক্তি খাতে ঋণ প্রবাহ সাম্প্রতিককালের মধ্যে সবচেয়ে নিচে নেমে গেছে – ১১-১২ শতাংশ। কিন্তু প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৪-১৬ শতাংশ, মুদ্রা নীতির মাধ্যমে যা পূরণ করা যায়নি। আগের বছর আমদানি ভালো ছিল, এই বছর আমদানি আগের চেয়ে কমে এসেছে। তাহলে যদি পুঁজিপণ্য আমদানি না হয়, তবে প্রবৃদ্ধি কী দিয়ে হচ্ছে? গ্যাস ও বিদ্যুতের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমরা একই চিত্র দেখছি। তাহলে এই প্রবৃদ্ধির উৎস কী? ব্যাখ্যাটা এরকম

দেওয়া হয় যে আমরা আগের চেয়ে বেশি উৎপাদনশীল হয়েছি। সম্প্রতি আমরা দেখেছি যে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ স্থবির হয়ে গেছে। সে জন্য পরিসংখ্যানগত ধাঁধা এর মধ্যে রয়ে গেছে। আর যদি অন্যভাবে দেখেন, তাহলে বলতে হয়, দেশে ব্যাপক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হচ্ছে । ফলে দেখা যাচ্ছে, বিনিয়োগ করলে উৎপাদন হয়, কিন্তু কর্মসংস্থান হয় না। কারণ হলো আপনি প্রযুক্তির নতুন ব্যবহার করছেন, তা সেটি গার্মেন্টস বা অন্য খাতে হোক, এটি একটি বড় জিনিস।

রাহুল রাহাঃ তাহলে প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে আপনার কাছে কী সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমাদের এই ব্যাপারে সংশয় আছে।

রাহুল রাহাঃ অর্থমন্ত্রী বলেছেন, আমরা যে টাকা নেব বলেছি তা যে ব্যাংক থেকে নেবো, তা নয়। যে টাকা বিনিয়োগ করা আছে তা থাকবে, আমরা শুধু হিসাব নিকাশ নিচ্ছি। এই জায়গায় অন্যরা প্রশ্ন তোলে, সিপিডি'র ব্যাপারে বিশেষ করে সরকারের তরফ থেকে যারা প্রশ্ন তোলে, সেই প্রশ্নটি আমিও করতে চাই। যখন বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছিল, রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছিল, তখন আপনারা বলেছিলেন, অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ ধংস একটি কঠিন শব্দ। সেটি হয়তো বলিনি। আমরা শুধু বলেছিলাম যে পদ্মা সেতু করলে টাকার টান পড়বে। কিন্তু পদ্মা সেতু করা যে প্রয়োজন, সে ব্যাপারে তো কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু কীভাবে করা হবে, কীভাবে অর্থায়ন করা হবে, সে ব্যাপারে বক্তব্য থাকতেই পারে। একটি পরিস্থিতিতে আমরা জাতীয় অর্থায়ন করেছি, তারপরও ঋণ আছে। কিন্তু আমরা তখন বলেছি, আপনার সীমিত অর্থ যদি আপনি এদিকে দেন, তাহলে অন্য জায়গায় দিতে পারবেন না। এ জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয় বাড়েনি। শিক্ষায় বরাদ্দ এখনো বাজেটের সেই ২ শতাংশ এবং স্বাস্থ্যে ১ শতাংশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এটি তো আপনি চোখের সামনে দেখছেন। গত ১০ বছরে অবকাঠামো খাতে যত ব্যয় হয়েছে, সেই অনুপাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে তত ব্যয় হয়নি।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন টেকসই হয় না

রাহুল রাহাঃ অবকাঠামোর সুবিধা কী আমরা পাচ্ছি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ পৃথিবীতে এখন উন্নয়নের একটি মডেল খুব চালু হয়েছে, কিছু কিছু দেশে তা দেখা যাচ্ছে। এর সঙ্গে আবার রাজনীতিও সংশ্লিষ্ট আছে। সেই উন্নয়নের

মডেলটা হলো, আপনি শুধু রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ দ্বারা তাড়িত হবেন, অবকাঠামোর দৃশ্যমান উন্নয়ন হবে এবং এর মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি বাড়বে। কিন্তু এই উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা হলো, এর মাধ্যমে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ হয় না, কর্মসংস্থান হয় না এবং অবকাঠামোর সুবিধাটা আসতে যে সময় লাগে, টাকাটা তার অনেক আগেই শোধ করতে হয়। টাকা পরিশোধের সময় এবং অবকাঠামো থেকে সুবিধা পাওয়ার সময়, এই দু'টির মধ্যে পার্থক্য আছে। সে জন্য এই সমস্ত দেশ অনেক ক্ষেত্রে খুব দ্রুত দেনার দায়ে পড়ে যায় এবং তারপর সে আর ওই প্রবৃদ্ধির ধারা টেকসই রাখতে পারে না। সম্প্রতি এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো টার্কি বা তুরস্ক। খুব সম্প্রতি তুরস্কের প্রবৃদ্ধির হার কমে গেছে। এমনকি দেশটির শাসক দল নির্বাচনে রাজধানীতেই হেরে গেছে এবং দল ভাগ হয়ে গেছে। এটি একটি বড় ধরনের সমস্যা। উন্নয়নের এই মডেলের নানা দিক দৃশ্যমান, উন্নয়ন থাকবে কিন্তু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ থাকবে না, তাহলে এই মডেল টেকসই হবে না। এটি এসডিজি বা বৈশ্বিক উন্নয়ন মডেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে না। যারা শুধু প্রবৃদ্ধির কথা চিন্তা করে না, দেশের চিন্তাও করেন, তাদের কাছে এটি একটি প্রাগৈতিহাসিক ধারণা।

ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও নতুন মধ্যবিত্ত

রাহুল রাহা: আমরা যখন রাস্তার দিকে তাকাই তখন দেখি নতুন নতুন গাড়ি প্রতিনিয়ত নামছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কার গাড়ি?

রাহুল রাহা: যার গাড়িই হোক। বাংলাদেশের জনগণের গাড়িই।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশে দুই ধরনের জনগণ আছে, এক জনগণের গাড়ি আছে, আরেক জনগণের গাড়ি নেই।

রাহুল রাহা: বাজারে গেলে যে পরিমাণ জামা-কাপড় দেখা যায় বা মানুষ যে পরিমাণে বিদেশ সফর করছে এই পরিস্থিতিতে অর্থনীতির অবস্থা কেমন বলবেন, যেখানে একজন রিকশাওয়ালার আয়ও দৈনিক ১০০০-১২০০ হয়ে গেছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি আপনাকে বলছি, বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি বিকাশমান অর্থনীতি এই ব্যাপারে দ্বিমত নেই। সুতরাং আপনি বা আমি কেউই এটি নিয়ে তর্ক করছি না যে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিকাশমান নয়। এখানে দু'টি বিষয় আছে, এই বিকাশটা

সমধর্মী কিনা, সবাই সমানভাবে পাচ্ছে কিনা এবং দ্বিতীয়ত হলো এই বিকাশটা কী অব্যাহতভাবে টিকিয়ে রাখতে পারব কিনা।

রাহুল রাহাঃ মানে আপনি বৈষম্যের কথা বলছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমি শুধু আপনাকে বলছি, আপনি দেখছেন বাংলাদেশে এখন মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটছে। এই মধ্যবিত্তের হাতে ব্যয় যোগ্য অর্থ আসছে সে জন্য তারা ঈদে বাজার করতে পারে, ভ্রমণ করতে পারে, দেশের ভেতরে বা বাইরে। কিন্তু এই বিকাশমান অর্থনীতিতে দু'রকমের সমস্যা হয়, একটি হলো এই নতুন বিকাশমান মধ্যবিত্তের নিচে একটি অনেক বড় অবিকশিত নিম্নবিত্ত এবং হতদরিদ্র রয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, এই বিকাশমান যে মধ্যবিত্ত, তারা জামা-কাপড় কিনতে পারবে, কিন্তু মানসম্মত শিক্ষা পাবে না, মানসম্মত স্বাস্থ্য পাবে না, মানসম্মত সুপরিবহণ পাবে না। এটি হলো সমস্যা। এগুলোর মধ্যে যদি আপনি ভারসাম্য এনে উন্নয়ন করতে না পারেন, তাহলে এই বিকাশমান মধ্যবিত্তই কিন্তু আরব বসন্ত ডেকে নিয়ে আসবে। তারা যখন চাকরি পায় না এবং এখন আমরা জানি, সাধারণ যে বেকারত্বের হার, শিক্ষিতদের মধ্যে এই বেকারত্বের হার তারচেয়ে ২-৩ গুণ বেশি। কারণ বাংলাদেশ হলো একটি অদ্ভুত দেশ, এখানে পড়াশোনা করে যে, চাকরি ছাড়া থাকে সে।

রাহুল রাহাঃ আপনি একটি অংশের কথা বলছেন যারা মধ্যবিত্তের ঠিক নিচে, এরা একটি বিশাল অংশ। এটির সংখ্যা কত হতে পারে ১৭ কোটি লোকের দেশে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ ১৭ কোটি লোকের দেশে অর্ধেক লোকই তো এরাই। আপনারা আমরা যেভাবে চলি, এটিতো খুবই সীমিতসংখ্যক লোকের অবস্থা, ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে।

রাহুল রাহাঃ আপনার ও আমার মধ্যেও পার্থক্য আছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ সে জন্য আমি যেটি বলছি যে আমরা শুধু ওটুকু দেখি, বাকিটা দেখি না। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবার জন্য জিডিপির মাত্র ১ শতাংশ কেন থাকবে? বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষা নেই।

রাহুল রাহাঃ সামাজিক সুরক্ষা নেই বলে কী বোঝাচ্ছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ সামাজিক সুরক্ষার তো ব্যবস্থা নেই।

রাহুল রাহা: তাহলে বাজেটে যে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে সেটি কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সবমিলিয়েই তো সেই ১/২ শতাংশ। আমারা যারা ব্যক্তি খাতে কাজ করি, আমাদের কী বীমা আছে? মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষগুলোর জীবনে দেখা যায়, একটি অসুখে পুরো পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সেই চিকিৎসার জন্য সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা আছে কী? এই যে শিক্ষার কথা আমরা বলি, যে শিক্ষা দিচ্ছে সেই শিক্ষা দিয়ে তো আমরা চাকরি করতে পারছি না। তার মানে হলো, গুণমাণসম্পন্ন শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে না।

রাহুল রাহা: আমরা প্রথম আলো খুললেই দেখি, বাংলাদেশি ছেলে মেয়েরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় খুব ভালো করছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটির মানে কি এই যে, ৩ জন ছেলে ভালো করা মানে গড়ে ৩ লাখ ছেলে যারা পাশ করে, তারা কি একই গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা পাচ্ছে? প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে ঠিক, কিন্তু শিক্ষকদের মান সম্পর্কে আমরা ভালোমতোই জানি, তারা কী অবস্থায় আছেন। বিষয়টা হলো, আমরা যে উন্নয়নের মডেলের মধ্যে আছি, এই মুহূর্তে তার সুফল আমরা কিছু পেলেও একটি বড় সমস্যা হলো, যদি প্রবৃদ্ধি হয় এত বেশি, তাহলে কর আদায় হয় না কেন? তার মানে হলো, কর তাহলে কেউ দেয় না। অথবা আপনি আদায় করতে পারেন না, দু'টির একটি অথবা আপনার প্রবৃদ্ধির সংখ্যাটিই ঠিক নেই। আপনাকে যে কোনো একটি মানতে হবে। যদি প্রবৃদ্ধির সংখ্যা ঠিক থাকে, তাহলে আয় হয়েছে, আর আয় হলে কর ঠিক থাকার কথা। কর গেল কোথায়? কর আদায়ের হার কমে যাচ্ছে কেন? তাহলে এটি কি শুধুই প্রশাসনিক দুর্বলতা? যদি প্রশাসনিক দুর্বলতা হয়, তাহলে প্রশাসন কেন পারছে না? তাহলে বিষয়টি হলো, প্রশাসনে কী এমন কেউ প্রভাব বিস্তার করছে যার ফলে এই লোকগুলো কর ফাঁকি দিয়ে দেশের টাকা বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা জেনে বুঝে তা সহ্য করছি। সেক্ষেত্রে ঘটনাটা তো আবার রাজনৈতিক অর্থনীতিতে ফিরে যাবে। যে পরিবর্তন আমরা চাচ্ছি, সে পরিবর্তনে মানুষগুলোর কী প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি। ব্যাংকিং খাত এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। ব্যাংকিং খাতের অবস্থা ব্যাখ্যা করতে ইংরেজি একটি শব্দ ব্যবহার করতে হয়, যাকে বলা হয় *সিস্টেম ফেইলিউর*, অর্থাৎ পুরো কাঠামোটা যখন পর্যুদস্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে ব্যাংকিং খাত হলো তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা সিপিডি থেকে উদ্যোগ নিয়েছি, নাগরিকদের মধ্য থেকে কমিশন বানাব, এর উপরে আপনারা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পাবেন এটি। এবারের নতুন অর্থমন্ত্রী এসে বলেছিলেন, খেলাপি ঋণ আর বাড়বে না, কিন্তু তারপর আবার ১৮-২০ হাজার কোটি টাকা বেড়ে গেছে। অর্থায়নের ক্ষেত্রে সঞ্চিতির ঘাটতি রয়েছে। এই মুহূর্তে সঞ্চয়ের হারের মধ্যে পার্থক্য

আছে। এই মুহূর্তে মানুষ ব্যাংকে টাকা রাখতে ভয় পাচ্ছে, আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করে, সুরক্ষাটা কোথায়? কোনো কারণে যদি ব্যাংকের লালবাতি জ্বলে তাহলে আমি কত টাকা পেতে পারি? বাংলাদেশে ব্যাংকের যে স্কিম আছে সেগুলো সম্পর্কে বলি, সেখানে ১ লাখ টাকার কথা বলা আছে। এটি কেন হলো? অথচ আপনি মনে করছেন, সুদের হার কমাতে পারলে হতো এবং সেটিও আবার হুকুম দিয়ে কমাবেন। পৃথিবীতে কি কেউ হুকুম দিয়ে সুদের হার কমাতে পারে বাজার ও অর্থনীতিতে? এটিকে এক অংকের ঘরে আনতে হবে। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এটি কেন হয়েছে? কারণ, যারা এই ধারণাটা নীতি নির্ধারকদের কাছে উপস্থাপন করছেন তাদের স্বার্থ এর সঙ্গে যুক্ত। কারণ ব্যাংকিং খাতে সুদের হার সমস্যা নয়, যাদের দায় দায়িত্ব আছে, তাদের সেটি পালন না করাটাই সমস্যা। বাংলাদেশ ব্যাংক দেখভাল করে না, সরকার নিজের টাকা নিজে দেখে না, যারা টাকা নেয়, তারা ফেরত দেয় না, পুরো সিস্টেমটাকে এখন আমরা বলতে পারি স্টেইট ক্যাপচার, অর্থাৎ এক ধরনের রাজনৈতিক দুর্নীতি, যেখানে ব্যক্তিস্বার্থ রাষ্ট্রীয় স্বার্থের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। অর্থাৎ পুরো কাঠামোকে কব্জা করে নিয়েছে এক ধরনের গোষ্ঠী। সেই গোষ্ঠীটা টাকাও ফেরত দেবে না।

রাহুল রাহা: আমরা দেখতে পাচ্ছি নানারকম রেমেডিয়াল ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি কথাটা শেষ করে আসি ওখানে। প্রবৃদ্ধির যেই পরিসংখ্যান আমরা দেখি তা যদি সত্যও হয়, তবে তার দু'টি বড় সমস্যা আছে। একটি হলো এই প্রবৃদ্ধি সবাই সমানভাবে ভোগ করছে না, বিশেষ করে গরিব শ্রেণি পাচ্ছে না, কারণ সামাজিক অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ কম। আর দুই নম্বর হলো, এটি টেকসই হবে কিনা। টেকসই না হওয়ার জন্য যে বড় বড় ২/৩ টি জায়গা তা হলো ফুসফুসের মতো। ফুসফুস তো দু'টি, একটি হলো ব্যাংকিং খাত, আরেকটি হলো পুঁজিবাজার। একটি ঋণ দেয়, আরেকটি পুঁজি দেয় – দু'টিই কিন্তু অকার্যকর হয়ে আছে। এখন এটির ফলে আমরা দেখছি, সরকার রাজস্বও পাচ্ছে না। এসব কারণে উন্নয়নকে টেকসই করা খুবই কঠিন হবে।

সংস্কার প্রয়াস

রাহুল রাহা: সে জন্য রেমেডিয়াল ব্যবস্থা কী হতে পারে? আপনি কোনো রেমিডিয়াল ব্যবস্থা দেখেন কিনা?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ, আমি দেখি। ব্যাপারটি হলো, এই সরকারের প্রথম দিকে ২০১০-২০১২ সাল পর্যন্ত সংস্কারের ভালো উদ্যোগ ছিল। ২০০৯ সালে যখন সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন তার যে উদ্যম, আগ্রহ ও এমনকি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, সেটি খুবই

ইতিবাচক ছিল। ক্রমান্বয়ে আমরা দেখলাম, সরকার এক ধরনের উন্নয়ন উপাখ্যানের আত্মতুষ্টির মধ্যে চলে গেল। উন্নয়ন উপাখ্যানের আত্মতুষ্টি তার শত্রুতে পরিণত হচ্ছে। কারণ অর্থনীতি এমন একটি জিনিস যেখানে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং তার সমাধান করতে হয়, কিন্তু সমস্যা যদি স্বীকার না করেন, অস্বীকারের মনোভাব রাখেন, তাতে নিজেরই ক্ষতি বৃদ্ধি হয়। ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখেন, তারা কীভাবে কাজ করে। সেক্ষেত্রে আমার চোখে সমাধান হলো, বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে সরকারকে সংস্কার করতে হবে। সরকার নির্বাচনের সময় যে ইশতেহার দিয়েছে, তা-ই করতে বলছি। আমরা তো অন্যকিছু বলছি না। আমরা বলছি, সরকার গঠনের আগে শাসকদল যে নির্বাচনী ইশতেহার দিয়েছে, যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেগুলো করুক। সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ব্যাংকিং খাতে যদি সমস্যা থাকে, সেগুলো তারা উদঘাটন করবে। কিন্তু তারা ব্যবস্থা নেয় না কেন? প্রত্যক্ষ কর বাড়াবে বলে, রাজস্ব আদায় বাড়াবে বলে, বিদেশের টাকা যদি কেউ নিয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলেছে, সরকার আরো বলেছে, আলোচনা-পর্যালোচনা ছাড়া ব্যবসায়ী বা রপ্তানিকারকদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে না। কোথায় এসব তো করা হলো না। এই বাজেটেও আলোচনা ছাড়া বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে, নামগুলো আপনারা সবাই জানেন। সরকার তার ইশতেহারের প্রতি অনুগত থাকছে না? কারণ হলো, এই ইশতেহার বাস্তবায়ন হলে যে পরিবর্তনটা হবে এবং যে পরিবর্তন আমরা চাই, সেই পরিবর্তন হলে সুবিধাভোগী গোষ্ঠী, ঋণ খেলাপি, কর খেলাপি ও টাকা পাচারকারীদের বিপদ। যারা ১০ টাকার প্রকল্পকে ২০০ টাকার বানিয়ে টাকা বানাচ্ছেন, এরা তখন স্থান পাবেন না। এরা অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি, যারা রাজনীতিকে কব্জা করেছে। এরা আবার অনেক সময় বলেন, বিরাজনীতিকরন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার – এগুলোই সবচেয়ে বড় বিরাজনীতিকরন। রাজনীতিবিদদের বদলে বা রাজনীতির বাইরের এ রকম ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী যখন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে, তখন এটিই তো বড় রাজনীতি। যে সমস্ত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, সেই সিধান্তগুলো কি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে।

রাহুল রাহা: তাহলে আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, এটি ১/১১-এর চেয়েও বেশি হচ্ছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না, সেটির চেয়ে বেশি কিছু হচ্ছে না। আমি বলতে চাই, যখন রাজনীতিবিদেরা নিজস্ব প্রক্রিয়ায় মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে দল বা মন্ত্রীসভায় বা সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আলোচনার ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণ করে না এবং সেটি যদি অন্য গোষ্ঠী করে যারা রাজনৈতিক জবাবদিহির বাইরে, তখনই এসব সমস্যার সৃষ্টি হয়।

রাহুল রাহা: একটি প্রশ্ন করতে চাই, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ক্ষমতায়। মুক্তিযুদ্ধের একটি আলাদা চেতনার ব্যপার আছে। আপনি কী মনে করেন যে এই গোষ্ঠীর মধ্যে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর, আর ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর এখানে কী অন্যান্য গোষ্ঠীও ঢুকে পড়েছে এবং তারা এক কাতারে চলে এসেছে? সবকিছুর একটি প্রতিক্রিয়া কী এসব?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যে মানুষেরা নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে দাবি করছে দেখি, তাদের দেখে সভা-সমিতিতে নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে আজকাল। কারণ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আমাদের মতো মানুষ, যারা ১৯৭১ সালের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং প্রগতিশীল রাজনীতি ও গণতন্ত্রের পক্ষে তৈরি হয়েছি, তারা যখন দেখি যে ধরনের মানুষ ইদানীং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি হিসেবে নিজেদের দাবি করে, তখন বিব্রত হই। সেজন্য আমি বঙ্গবন্ধুর ১০০তম জন্মবার্ষিকী পালন করবো, স্বাধীনতার ৫০ বছর করবো, কে কীভাবে পালন করবে, সেটিই এখন দেখার বিষয়। কারণ, স্বাধীনতার যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলাম, সেই স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধুর প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করাই অনেক বড় ব্যাপার। আর কিছু মানুষ তাদের জীবনজীবিকাকে দেশের গড় মানের চেয়ে অনেক উপরে নিয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এখানে একটি বৈপরীত্য আছে। আপনি যখন বলেন, স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ক্ষমতায় আছে, নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক দল হিসেবে তারা আছেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে যারা আছেন, তারা যে সবাই স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি, এটি কী বলতে পারবেন? একটি জিনিস খুব দুঃখ থেকে বলছি, যারা ১৯৭১-এর পক্ষের শক্তি, স্বাধীনতার মূলনীতিতে বিশ্বাস করে, ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিশ্বাস করে, এটি তো তাদের প্রতিদিন জোর গলায় বলতে হবে না; মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত শক্তিরা দেশের জন্য কাজ করে যায়, তারা নিজেদের ইতিহাস জানেন। যদি তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাহলে কিন্তু বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

রাহুল রাহা: পরিবর্তন জগতের ধর্ম। মানুষের পরিবর্তনের সঙ্গে সবকিছু পরিবর্তন হয় এবং বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। এখন সমাজতন্ত্রের কথা তো বলা চলবে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যদি পরিবর্তনের ধর্মই মানবেন তাহলে মানতে হবে যে আপনিও পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছেন। অন্যরা যেমন পরিবর্তিত হবে, আপনিও তেমনি পরিবর্তিত হচ্ছেন কিনা? ১৯৭২ এর রাজনীতি যদি আমরা মানি, তাহলে যেসব কৌশলগত কারণে মানুষকে সুবিধাদি দিই, সেগুলো এসবের সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ, এই বিষয়গুলো দেখতে

হবে। পরিবর্তনের অর্থ এই নয় যে মৌলনীতি থেকে আপনি সরে যাবেন। এটি আরো অনেক জটিল বিতর্ক।

রাহুল রাহা: আমাদের দেশে এই মুহূর্তে অনেকগুলো সংকট দেখতে পাচ্ছি, এর মধ্যে অন্যতম হলো রোহিঙ্গা সংকট। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, ভারতের এনআরসি নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিচ্ছে। কাশ্মীরের ঘটনা নিয়ে একটি ধর্মীয় উদ্বেগ আছে, কিন্তু সেটি আমাদের থেকে অনেক দূরে হলেও আমাদের উপর এর ছাপ পড়ে।

রোহিঙ্গা ও ভূরাজনীতি

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কাশ্মীরের ঘটনা শুধু ধর্মীয় উদ্বেগ নয়, এটি মানবাধিকারেরও বিষয়।

রাহুল রাহা: বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক একটি উদ্বেগ পৃথিবীর বড় বড় শক্তিগুলোর মধ্যে আছে। সেই জায়গাটিতে বাংলাদেশের অবস্থা কী বলে মনে করছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রথম যখন আমরা রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আলোচনা করি, যখন আমরা তাদের আশ্রয় দেই, তখন আমরা বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছিলাম। এক নম্বর চ্যালেঞ্জ হলো, এদের থাকা, খাওয়ার খরচ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিদেশি দাতাগোষ্ঠীরা দ্রুত অবসাদের মধ্যে চলে যাবে এবং তারপর এটি দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের কাছে চিন্তার বিষয় ছিলো, অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি মিলিয়ে এরা আমাদের কী ধরনের সমস্যার মধ্যে ফেলে দেবে। সেটি স্থানীয় যারা আশ্রয় দিয়েছে সেখান থেকে শুরু করে সারা দেশে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করবে। তৃতীয়ত, এতে আমাদের জলবায়ুকেন্দ্রিক বড় ধরনের সমস্যা হবে, স্থানীয় পরিবেশ নষ্ট হবে, গাছ কাটা পড়বে ইত্যাদি। চতুর্থত, এতে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক ধরনের হুমকি সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে ইরাক ও সিরিয়াতে আইএসএস পরাজিত হচ্ছে। ফলে ওই শক্তি অনেকটা মরিয়া হয়ে উঠবে, বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে বা নতুন শাখা খুলবে, ইংরেজিতে যাকে বলে যে *ক্রিয়েটিং নিউ এসেটস*, এসব আমাদের জন্য অশনি সংকেত। এসব সমস্যাই কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে। আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে মনে করেছিলাম যে বিশ্ব আমাদের এত প্রশংসা করেছে এবং তারা হয়তো আমাদের পাশে থেকে এই সমস্যার একটি টেকসই সমাধান বের করবে। সেটি কিন্তু আমাদের আঞ্চলিক রাজনীতি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সম্মুখ উপলব্ধি করাতে পারে নি। এটি মানতে হবে এবং আমরা মনে করি নি যে আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর আমাদের চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকতে পারে, সেটি

যেমন রাশিয়ার ক্ষেত্রে সত্য, চীনের জন্যও সত্য, এমনকি তা ভারতের জন্যও সত্য হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যদিও একাধিকবার জাতিসংঘে রোহিঙ্গা বিষয়ক ভোটে জিতেছে, কিন্তু কার্যকরভাবে উপ-আঞ্চলিক সমাধান এখানে কেউ দিতে পারছে না। এমনকি কফি আনান যে রোহিঙ্গাদের জন্য *সেইফ জোন* বা নিরাপদ জায়গা সৃষ্টির প্রস্তাব দিয়েছেন, সেটিও আমরা বাস্তবায়ন করতে পারছি না। এখন এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে তারা আর ফেরত যাচ্ছে না বা যেতে চাচ্ছে না। আর রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে বিভিন্ন ধরনের নাশকতা এমনকি খুনোখুনির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে; চলছে মাদকের ব্যবসা, অস্ত্রের ব্যবসা ইত্যাদি। আর তারা প্রকাশ্যভাবে যে শক্তি প্রদর্শন করছে তাতে এমন একটি আশংকা তৈরি হয়েছে যে স্থানীয় সমাজের সঙ্গে তাদের বড় ধরনের দাঙ্গা পর্যন্ত হয়েছে। পৃথিবীতে এমন নজির আছে। ফিলিস্তিনে এক রাতের মধ্যে ৫ হাজার মানুষ মেরে ফেলা হয়েছে। সেহেতু এই রোহিঙ্গা বিষয়টি এখন খুবই সংবেদনশীল হয়ে পড়েছে। আর সরকার যেহেতু এখন একটু কঠিন কথা বলা শুরু করেছে, আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা, যে আমরা তাদের এভাবে সারাজীবন রাখতে পারব না, ভালো না লাগলে এদের চলে যেতে হবে। এ রকমের শক্ত কথা যখন বলা হবে এবং বেসরকারি কিছু প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে – হয়তো সঠিকভাবে – তখন স্থানীয় মানুষও এক ধরনের ইঙ্গিত পাবে যে রোহিঙ্গারা এখানে আর বাঞ্ছিত নয়। রোহিঙ্গারা এখন যদি কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন কিন্তু আমরা আরেক ধরনের সমালোচনার মুখে পড়ব। এই যে দু'জন মারা গেছে ক্রসফায়ারে, আরো যদি কিছু ঘটে, তাহলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এটি বড় বিষয় হয়ে যাবে যে বাঙালিরা এখন এরকম করছে। সুতরাং, সরকার এখন খুবই জটিল ও নাজুক পরিস্থিতিতে পড়েছে। সরকারের এই অবস্থা আমাদের অনুধাবন করতে হবে। সরকার একদিকে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করতে চাচ্ছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক চাপও রাখতে চাচ্ছে, কিন্তু এটিকে পুরোপুরি আন্তর্জাতিকীকরণ করছে না। আমি মনে করি, সরকার যে নীতি নিয়েছে, তা সঠিক। রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে সরকার যে মৌলিক অবস্থান ও নীতি নিয়ে এগোচ্ছে, আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থা, এটিই ঠিক আছে, কিন্তু এর থেকে যদি কোনো বড় ধরনের উদ্যোগ না আসে, বিশেষ করে মিয়ানমারের পক্ষ থেকে, তাহলে আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির অবনতি হবে।

রাহুল রাহা: চীন তো একটি মধ্যস্থতা করতে চেয়েছে। চীনের ভূমিকাকে আপনি কীভাবে দেখছেন? ভারতের ভূমিকাই বা কী এখানে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনারা লক্ষ্য করছেন যে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ভারত ও চীন মিয়ানমারের প্রতি বেশি সংবেদনশীল। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয়

ইউনিয়ন যে ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে, মানে এর পরের পদক্ষেপ তো হলো স্যাংশন বা নিষেধাজ্ঞা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, সেই নিষেধাজ্ঞা আগেও ছিল, যেটি আং সান সুচি ক্ষমতায় আসার পরে শিথিল করা হয়েছে। সেই জায়গায় এই দুই দেশের পক্ষ থেকে সমাধানের সূত্র আসবে কিনা, কারণ তারাও নিজেদের পারস্পারিক রেষারেষির মধ্যে আছে কিনা, সেটিও দেখার বিষয়।

রাহুল রাহা: দেশ হিসেবে বাংলাদেশ একটি জটিলতার মধ্যেই আছে। নৈতিকভাবে বাংলাদেশ এখানে ঠিক জায়গাতেই আছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তিনটি জিনিস দেখতে হবে। মানবতার দিক থেকে তাদের আশ্রয় দেওয়া ঠিক ছিল, আমি নিজে দু'বার শরণার্থী হয়েছি, সুতরাং আমি জানি শরণার্থী কী জিনিস, তাই তাদের আশ্রয় দেওয়া ঠিক ছিল। দ্বিতীয়ত, আশ্রয় দেওয়ার পর তাদের ফেরত পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক আঞ্চলিক উদ্যোগ নিয়েছে, সেটিও সঠিক বলে আমি মনে করি। এখন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে তাতে কিছু দোষ-ত্রুটি হচ্ছে ঠিক, সেটি যে তাদের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে তা বলবো না, কিন্তু আমি বলতে চাই, এখন একটি নতুন স্পর্শকাতর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যেটি স্থানীয়ভাবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে, দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। এটি আর শরণার্থী সংকটের মধ্যে থাকছে না, এর সঙ্গে অন্যান্য জিনিস যুক্ত হচ্ছে, বিদেশিরা কিন্তু এক বছর আগে থেকে বলছে, এদের তোমরা রেখে দাও। বিদেশি এনজিও, দাতাসংস্থা, জাতিসংঘ – সবারই একটি অবস্থান, সেটি হলো, এরা আর ওই দেশে যেতে পারবে না, আপনারা এদের অধিগ্রহণ করুন।

রাহুল রাহা: যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাটা কী এদিকে? চীনের ভূমিকা কী এদিকে এমন পর্যায়ে আছে যে যুক্তরাষ্ট্র এদিকে কিছু করে উঠতে পারছে না?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আসলে যতখানি না এটি মিয়ানমারের বিষয়, তার চেয়ে অনেক বেশি হলো একজন আরেকজনের উপর কতটা প্রভাব রাখতে পারবে, সেখানে মিয়ানমার কার পক্ষে থাকবে, এটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ অনেক বেশি সফট স্টেইট অর্থাৎ নমনীয় দেশ। মিয়ানমারের চেয়ে আমাদের কথা বলার জায়গা অনেক বেশি। এটিই আরো সমস্যা সৃষ্টি করছে। সরকার কিছু হার্ড লাইন নিচ্ছে, সেটিকেও আমি অন্যায় মনে করছি না। সার্বিকভাবে সরকার যেটি করছে, এটিই ঠিক। এদিকে এদের রাখতে হবে, নাকি অন্যদিকে পাঠাতে হবে, এসব নিয়ে দ্বিপাক্ষিক সমস্যা থাকবে। মনে রাখতে হবে আরেকটি গোষ্ঠী আছে, একবার আমি চট্টগ্রামে আলোচনা করেছিলাম, তখন একটি

গোষ্ঠী বলেছিলো, এদের অস্ত্র দিয়ে ফেরত পাঠাতে হবে। এটি তো আরেক ধরনের হঠকারী ব্যাপার হবে।

রাহুল রাহা: একজন মার্কিন সিনেটারও বলেছিলেন যে.........

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ওখানে দখল করে এদের পাঠাবে।

রাহুল রাহা: প্রধানমন্ত্রী নিজেই এটির প্রতিবাদ করেছিলেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি মনে করি, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পন্থাগুলোর মধ্য দিয়েই বাংলাদেশকে অব্যাহতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যদি বলেন, শেষ বিচারে কী হবে, তবে বলব, আমি তাদের ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম দেখছি। বাংলাদেশ থেকে যেমন লাখ লাখ বিহারি পাকিস্তানে ফিরে যায় নি, যেভাবে তারা ক্রমান্বয়ে এই দেশের মানুষ হয়ে গেছে, রোহিঙ্গাদেরও হয়তো সেরকম হবে।

রাহুল রাহা: আমরা নিউজ ২৪-এ গত পরশু দিন এটি নিয়ে একটি স্টোরি করেছিলাম যে বিহারিরা নিজেদের বাংলাদেশি ভাবতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। নতুন প্রজন্ম তো সেটিই করে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই মুহূর্তে দেখার ব্যাপার হলো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি যেন না হয়, সামাজিক বিশৃঙ্খলা যেন না হয়।

রাহুল রাহা: সে ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের ভাসান চরে স্থানান্তরের বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যারা ভাসান চরের ব্যাপারে অসুবিধা বোধ করেন – আমি ভাসান চরের পুরো পরিস্থিতি জানি না – কিন্তু তাদের মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশেও অনেক হতদরিদ্র মানুষ আছেন, যাদের ভাসান চরের জমিটুকুও নাই। রোহিঙ্গাদের এটি তো দ্বিতীয় অধ্যায়, এর আগে আরেকটি ছিল, তখন একটি বড় সমস্যা হয়েছিলো যে রোহিঙ্গাদের যে পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য দেওয়া হতো, তার পাশের বাড়িতে আমার বাঙালি নাগরিকের মাথাপিছু আয় তার অর্ধেকও নয়। এটি কেমন করে আপনি টেকাতে পারবেন, এখানে শরণার্থীদের মাথাপিছু ব্যয় প্রতিবেশীর মাথাপিছু আয়ের চেয়ে বেশি। এটি আরেক ধরনের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে।

রাহুল রাহা: আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি। আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই, যুক্তরাষ্ট্রের কথা বললাম, চীনের কথা বললাম, এই যে 'ট্রেড ওয়ার' চলছে, এর সুবিধা কী বাংলাদেশ নিতে পারছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তাহলে আবার প্রথম কথায় ফিরে আসি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন একটি মন্দার দিকে ক্রমান্বয়ে এগোচ্ছে বলে কথা হচ্ছে। পুরো ইউরোপের অর্থনীতি ব্রেক্সিটসহ নানা কারণে স্তিমিত হয়ে পড়েছে, নানাকিছু ঘটছে, ইয়েমেন থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে, ইরানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের দুই ধরনের উত্তেজনা হচ্ছে, অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় যে জাপান, কোরিয়া, রাশিয়া মিলে এক ধরনের সমীকরণ হচ্ছে, এগুলো দেখে চিন্তা করে যে আমরা একটি কৌশল গ্রহণ করব, সেটি করার মতো সামগ্রিকতা দেশে বিরাজ করছে না। এটির জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তা, কাঠামো ও পরিবেশ দরকার, সেই পরিবেশ এই মুহূর্তে নেই। সেটি থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটিই হলো আমাদের আক্ষেপের জায়গা। আপনি যদি এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে যেতে চান এবং সেই মানুষটি যদি আমাদের সবচেয়ে আদরণীয়, পূজনীয় ও শ্রদ্ধার মানুষও হন এবং তারপরও যদি ব্যক্তির উপর প্রতিষ্ঠান কাজ না করে, তাহলে ওই মানুষটিও কিন্তু অকার্যকর হয়ে যাবেন। এ জন্য প্রতিষ্ঠান কার্যকর করাটা খুবই জরুরি এবং সেজন্য এই প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম চালাতে হলে নিয়ম নীতির মধ্যে থাকতে হবে।

রাহুল রাহা: আপনি সরকারের পাঁচটি চ্যালেঞ্জ কী কী মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি তো অন্য বিষয়ে বলতে পারি না, শুধু অর্থনীতির কথা বলতে পারি। রাজস্ব আদায় এখন এক নম্বরে। দ্বিতীয়ত বলব, ব্যাংকিং খাতের কথা। তৃতীয়ত, বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে টাকার যে বিনিময় হার, সেটি আরেকটি বড় জায়গা। মেগা প্রকল্পের অর্থায়ন এবং ক্রমশ ঘনায়মান দায় দেনা পরিস্থিতি আমার কাছে একটি বড় জিনিস। কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে যেটি আমার কাছে মনে হয়, আমাদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে গুণমান সম্পন্ন, বিশেষ করে বিকশিত মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্তের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া একটি বড় বিষয়।

রাহুল রাহা: সেক্ষেত্রে কি সরকারের ৫টি শক্তি জাতীয় কিছু কি আপনি দেখতে পান।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ, সরকারের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো, এমন একজন সরকার প্রধান আছেন, যিনি এসব বিষয়ের জ্ঞান রাখেন এবং তিনি এসব বিষয়ের ব্যাপারে উদ্যোগী।

তার একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তার একটি রূপকল্প আছে, দেশকে ভালোবেসে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার একটি বড় ভূমিকা আছে। এটিই তো আমি একটি বড় শক্তি হিসেবে দেখি। দ্বিতীয়ত, আমি শক্তির জায়গা দেখি, পুরো পৃথিবীর বাংলাদেশের প্রতি একধরনের সৌহার্দপূর্ণ আচরণ আছে, এটি একটি বড় শক্তি। এখানে উদ্যোগী মানুষ আছেন, নতুন প্রজন্ম যারা আসছে, তারা অনেক বেশি সৃষ্টিশীল, দেশকে নিয়ে তারা নতুনভাবে চিন্তা করে, তাই যুব সমাজকে আমি বড় শক্তি হিসেবেই দেখি। আর তা ছাড়া শ্রমিক, কৃষক যারা রেমিট্যান্স আয় করছে, তাদের পুরোনো প্রথাগত শক্তি আছে। যে জায়গায় এগুলো মানুষকে অনেক শক্তিশালি করে, ওই জায়গায় চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে নিয়ে যাবে, এই দু'টিকে যে সেতুবন্ধন করবে, সেই জায়গায় আমি সমস্যা দেখি। আমি এই জায়গাটা দেখি, কারণ একটি সক্রিয় প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি দরকার। যদি প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি না থাকে, তাহলে এই প্রতিযোগিতার সুযোগগুলো আমরা কাজে লাগাতে পারবো না।

রাহুল রাহা: আপনি যেখানে শেষ করলেন, আমাদের যেখানে থামতে হচ্ছে, আমাদের সেখানেও প্রশ্ন আছে এবং এটি নিয়ে হয়তো আমরা সময় পেলে অন্য একদিন আলোচনা করবো। সেটি হলো, প্রতিযোগিতার পরিস্থিতি কেন নষ্ট হলো এবং এর জন্য দায়ী কে? কিন্তু আজকে আর সেই সময় নেই। অসংখ্য ধন্যবাদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। আমার ধারণা অর্থনীতি, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও আমাদের সক্ষমতা দুর্বলতা নিয়ে একটি সামগ্রিক আলোচনা হলো। আমরা প্রত্যাশা করি, একটি প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই পারে বাংলাদেশের উন্নয়নের রাজনীতি ও গণতন্ত্রের রাজনীতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। আমাদের এখন আর পিছিয়ে থাকার সময় নেই, তবে আমাদের দুর্বলতার জায়গা কোথায় সেটি শুনতে হবে। আমাদের কাজ করতে হবে এবং যেখানে সরকার কাজ করে চলেছে, সেখানে সহযোগিতা করার জন্য সবাইকে সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এই আশা রেখে শেষ করছি প্রিয় দর্শক। সবাই ভালো থাকবেন।

জনতন্ত্র গণতন্ত্র
নিউজ ২৪
৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯

২০২০ সালে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জহিরুল আলম: *সুপ্রিয় দর্শক, আপানদের স্বাগত জানাই প্রতি রাতের নিয়মিত টক শো 'এই সময়ে'। আমি জহিরুল আলম। প্রিয় দর্শক, প্রায় বিদায় নিতে চলেছে ২০১৯। কেমন গেছে বছরটি – এ নিয়ে নানারকম আলোচনা হবে আজ। খুব মোটা দাগে যদি দেখি, পেঁয়াজসহ নিত্যপণ্যের দাম, ভেজাল খাদ্য, বায়ু দূষণ, ডেঙ্গুর ভয়াবহতা, নুসরাত, রিফাত, বুয়েটে আবরার হত্যাকান্ড, নানা রকম গুজব, পদ্মা সেতুতে শিশুর মাথা থেকে শুরু করে গণপিটুনিতে হত্যা, ভোলায় ধর্ম অবমাননার গুজব, লবণ সংকটের গুজব, ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান, বালিশ-পর্দা কান্ড, সড়ক নিরাপত্তা আইন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা ও দুর্নীতির অভিযোগ, ডাকসু নির্বাচন ইত্যাদি। আর অর্থনৈতিক অঙ্গণে আমরা রেমিট্যান্সের উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেখছি, যদিও রপ্তানি আয়ে দেখছি নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি। সঙ্গে আছে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি ও বহুল আলোচিত আয় বৈষম্য। বছর জুড়ে খেলাপি ঋণসহ নানা কারণে ব্যাংকিং এবং আর্থিক খাতে যে অস্থিরতা, সেটি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আর রাজনীতিতে ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচন, নতুন সরকার গঠন, সংসদে বিএনপির যোগদান, খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য ও জামিন, আওয়ামী লীগের কাউন্সিল, এরশাদ পরবর্তী জাতীয় পার্টির ভবিষ্যৎ নিয়েও আছে নানা ভাবনা। আন্তর্জাতিক অঙ্গণে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, মিয়ানমারের গণহত্যার বিচার, ভারতের নাগরিক পঞ্জি ও নাগরিকত্ব আইন সংশোধনী নিয়ে উত্তেজনা – এসবই আমাদের বড় খবর। সঙ্গে তো আরো অনেক বিষয় আছেই।*

জহিরুল আলম: আজকে এই বছরটি কেমন গেল, সামনের দিনগুলোতে আমরা কী প্রত্যাশা করি, সে বিষয়ে আলাপ করার জন্য স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে। স্বাগত আপনাকে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ, আপনি কেমন আছেন?

জহিরুল আলম: ভালো আছি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই যে আপনি যে এতবড় তালিকা দিলেন, এতে আপনি নিজে কী দেখেন? এই তালিকা যখন আপনি প্রণয়ন করলেন, তখন আপনার মনের ভাব কী হলো?

জহিরুল আলম: মিশ্র। সব কিছু মিলিয়েই এই তালিকা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভালো-মন্দ সকলই। তিনি বলেছেন না, 'যে আমারে দেখিবারে পায়/অসীম ক্ষমায়/ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি/এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি'। সুতরাং একটি বছরে আমরা সবকিছু ভালো দেখবো এমন নয়, সবকিছু মন্দ দেখবো, তাও আবার নয়। কিন্তু আমরা একটি নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ আপনার কাছ থেকে চাই। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তো বটেই, একজন নাগরিক হিসেবেও আপনি রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে বলবেন আশা করি। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে। ২০১৯ সালে এবং সামনের দিনগুলোতে আমাদের জন্য কী চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ অপেক্ষা করছে, তা জানবার চেষ্টা করব।

একটি নতুন সরকার গঠিত হয়েছে ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে এ সরকার ক্ষমতায় এসেছে। সেগুলো বেশ জোরালোও ছিল। বছরব্যাপী তার কতটা সরকার পূরণ করতে পেরেছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জহির, খুব সুন্দর তালিকা আপনি তৈরি করেছেন। যে একটি বিষয় খুব একটি আসেনি, আমি সেটি উল্লেখ করতে চাই। সেটি হলো, সম্প্রতি, বিশেষ করে এই বছরে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে নারী শ্রমিকরা যে অত্যাচারিত হয়ে দেশে ফিরেছেন। এই বিষয়টিও আপনি হয়তো এই তালিকায় নিতে পারেন ।

জহিরুল আলম: নিশ্চয়ই।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: গত বছরের শেষে নির্বাচন হয় এবং নতুন সরকার গঠিত হয়। নতুন সরকার যেটি গঠিত হয়েছে, সেখানে পুরোনো প্রথিতযশা বা স্বীকৃত প্রবীণ রাজনীতিবিদেরা সেই অর্থে নেই। একটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে, প্রচুর নবীন রাজনীতিক বা তৃণমূল ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতারা স্থান পেয়েছেন। এতে অনেকের মনে হয়েছিল, তারা হয়তো অনেক অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্যের চঞ্চলতা ও উৎসাহ নিয়ে কাজ

করবেন। বিশেষ করে যেহেতু একটি সুলিখিত ও উচ্চাভিলাষী নির্বাচনী ইশতেহারের পরিপ্রেক্ষিতে এই সরকার গঠিত হয়েছে। প্রথমত বলতে হবে, এখন পর্যন্ত এই মন্ত্রী পরিষদ যথার্থতার চিহ্ন রাখতে পারেনি। এই চিহ্নটা না রাখতে পারার কী কারণ, সেটি অবশ্য বিশ্লেষণের বিষয় – এটি কি তাদের উদ্যোগের অভাব, নাকি অভিজ্ঞতার অভাব, নাকি সক্ষমতার অভাব। এগুলো নিয়ে আলোচনা হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা হলো, এখন পর্যন্ত মন্ত্রীসভা সামগ্রিকতায় যে খুব দেশের বা জাতির নিয়ন্ত্রণে আছে, এটি আমাদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে না। তুলনামূলকভাবে প্রবীণ ব্যক্তিরাও আছেন, দু-একটি জায়গায় তারা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, দেশের ভেতরে ও বাইরে, সব মিলিয়ে আপনি সেটি দেখতে পারেন। তারাও বিভিন্ন বিকাশমান সমস্যা মোকাবেলার ক্ষেত্রে খুব বিজ্ঞজনোচিতভাবে এগোচ্ছেন, সেটিও মনে হচ্ছে না। আমার কাছে যেটি এই মুহূর্তে চিন্তার বিষয় সেটি হলো, সমস্যা বাংলাদেশে ছিল, থাকবে, হয়তো বাড়তেও পারে, কমতেও পারে; কিন্তু নাগরিকদের জন্য আস্থার জায়গাটা হলো, রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। রাজনৈতিক নেতৃত্বের যে প্রতিনিধিত্বশীল কাঠামো, তারা কতখানি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে এবং প্রত্যাশার দিকগুলোতে তারা কতখানি নজর দিতে পারছে। প্রথমত, আপনার এই হিসাব থেকে মনে হয়, অনেক ক্ষেত্রে আমরা যথোপযুক্তভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দিয়ে এগুলো মোকাবেলায় সফল হইনি।

জহিরুল আলম: দক্ষতার ব্র্যান্ডিং করা যায় কি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দক্ষতার বিষয়টি তো সামগ্রিকতায় বিচার হয়। তার পেছনে শিক্ষা থাকে, পেশাদারী জীবনের অভিজ্ঞতা থাকে, পড়াশোনাসহ অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহ বা অভিজ্ঞান থাকে। পাশাপাশি তার একধরনের নেতৃত্বের অধীনেও কাজ করে তার এই জিনিসগুলো প্রকাশ পেতে পারে। দুঃখজনক হলো, নবীনদের তো বটেই, প্রবীণদের ক্ষেত্রেও এই জিনিসগুলো প্রকাশিত হয়নি।

জহিরুল আলম: আপনার আলোচনা ডাইভার্ট হবে কিনা জানি না। এই যে সর্বশেষ রাজাকারের তালিকা...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি শুধু মন্ত্রীদের নাম নিতে চাচ্ছি না। আমার মনে হয়, আপনারা এক একটি সমস্যা দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন। বাজার ব্যবস্থায় আপনি দেখতে পারেন, এটি শুধু বাণিজ্যের বিষয় নয়, শুধু পেঁয়াজের বিষয় নয়। এটি সামগ্রিক বাজার ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং সামনের দিনে তার পরিস্থিতি, উৎপাদন, বাজার বিপণন ইত্যাদিতে দেখা যাবে। দ্বিতীয়বারের মতো কৃষকরা আবার ধান চাষ করে মার খাবে

কিনা, সেটি বড় বিষয়। এর আগের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, এক বছর যদি কৃষক মার খায়, পরের বছর সে আবার বেশি করে উৎপাদন করে, ওখানে কম থাকাতে পরের বছর চালের দাম পায়। গত বছরের মার খাওয়ার পরে এবার সে পাবে কিনা, আমরা সেটি বুঝে উঠতে পারছি না। কিছুদিন আগে পাটকল শ্রমিকেরা আন্দোলন করলেন, মৃত্যুবরণ করলেন দু'জন, কিন্তু তাদের ব্যাপারে সুচিন্তিত নীতিমালা নেই। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বা পাট সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। চামড়ার ক্ষেত্রেও একইভাবে দাম কীভাবে পড়ে গেল, সেটি আমরা দেখলাম।

তারপর স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ডেঙ্গুর কথা বলতে পারবেন। আপনি জলাবদ্ধতার কথা বলতে পারেন, সুপেয় পানির অভাবের কথা বলতে পারেন। ওয়াসার পানি নিয়ে কত আলোচনা, এর বাইরে যদি আপনি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যান দেখবেন, একের পর এক বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে। যতই আমরা বলি সেটি তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, কিন্তু ওই আগুনের তাপ তো আমার গায়ে লাগছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি আমাদের যে ধরনের অবহেলা, এর পরিণামে দেশ ও জাতি কীভাবে মূল্য দেবে, সেটি বোঝার ব্যাপার আছে। এদিকে রাজস্ব আদায় হচ্ছে না। বিদেশীরা আগামী মাসে বাংলাদেশিদের নিয়ে বসবে। অর্থাৎ গত ২/৩ বছরে যে সমস্যাগুলো জমে ছিল – আমার অন্তত আকাঙ্খা ছিল – নতুন সরকার নব উদ্যমে সেগুলো মোকাবেলা করবে। কিন্তু যে বছরটি গেল, তার মর্মার্থ বোঝাতে তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছিলাম। ১০০ দিনের মাথায় সরকারকে উদ্যম ও উৎসাহহীন মনে হয়েছিল, সেই পরিস্থিতি যেন বারবার ফিরে আসছে। অর্থাৎ তথাকথিত আত্মতৃপ্তির যে গল্প আমরা তৈরি করেছি, আমরা কেন যেন তার কাছে জিম্মি হয়ে আছি, ফলে চলমান সমস্যাগুলো আমরা দেখছি না। এর সঙ্গে দেখেন নারী নির্যাতন কী হারে বেড়েছে। এটি বলতেও কুণ্ঠা লাগে, এরকম মুক্ত পরিবেশে আমরা কীভাবে আমাদের মেয়েদের, মায়েদের ও বোনদের প্রতি অত্যাচার করছি। এই অত্যাচারের সুরাহা হচ্ছে না। আপনি বলতে পারেন, একটি হত্যার বিচার হয়েছে, অন্য আরেকটি ঘটনার বিচার হয়তো আরো দ্রুত হবে, কিন্তু ঘটনা তো ঘটে যাচ্ছে, কিছু থেমে থাকছে না। সে জন্য কথা হচ্ছে, সমাজে নৈতিক বৈকল্য আসছে কিনা?

আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরের দিকে এগোচ্ছি, অথচ সমাজে নৈতিক বৈকল্য সৃষ্টি হচ্ছে। এটির সবচেয়ে বড় প্রকাশ হলো, নাগরিকেরা একধরনের অনীহা বা ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যালিয়েনেশান, অর্থাৎ বিচ্ছিনতাবোধ তৈরি হচ্ছে। এই বিচ্ছিনতা বোধ, এক ধরনের নৈতিক বৈকল্য, এই অনীহা-অবহেলা সমাজের সামাজিক পুঁজি বাড়তে দেয় না। পৃথিবীতে সমাজ শুধু অর্থনীতির পুঁজি দিয়ে এগোয় না। শুধু বিনিয়োগ করলে বা কর্মসংস্থান করলে হয় না, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা কী থাকে

এবং এই সম্পর্ক কীভাবে রাষ্ট্র যত্ন করে সামনের দিকে নিয়ে যায়, আমরা সন্তানের সামনে কী ভাষা ব্যবহার করি, রাজনীতিবিদেরা কী ভাষা ব্যবহার করেন, শিক্ষক কী ভাষা ব্যবহার করেন, আপনি-আমি কী ভাষা ব্যবহার করি – এগুলোর উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সেই জায়গায় কোথায় যেন অস্বস্তি আছে।

জহিরুল আলম: এটি তো স্বাভাবিক ঘটনা, বিভিন্ন বিষয়ে সব সময়ে স্বস্তি থাকবে এমন নয়। অনেক বিষয়ে, অনেক ক্ষেত্রেই অস্বস্তি আছে। আপনি একটু আগে বলছিলেন, আমরা এক ধরনের আত্মতুষ্টির বলয়ে বা বৃত্তের মধ্যে জিম্মি হয়ে আছি। সেখান থেকে বেরোতে পারছি না। এই আলোচনা কী শুধু কঠিন, অপ্রিয়, অবন্ধুসুলভ সমালোচনা, নাকি একধরনের হুইসেল ব্লোয়িং?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই ধরনের আলোচনা করতে পারা, এই ধরনের আলোচনা ধারণ করা এবং এই ধরনের আলোচনা ব্যবহার করা সমাজের শক্তির লক্ষণ। যে সমাজ ভিন্নমত ধারণ করতে পারে না, সেই সমাজ টেকে না। পৃথিবীব্যাপী দক্ষিণপন্থী জাতিয়তাবাদী উত্থান আমরা দেখছি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এমনকি আমাদের প্রতিবেশী অঞ্চলে। কিন্তু আমি মনে করি, ভিন্নমত ধারণ করতে পারে না বলে এসব টেকসই হবে না। আমি এই বিশ্বাস থেকে আপনাকে বলতে পারি, হবে না কারণ হলো, মানুষ ভিন্নমতের, বহুমতের ভিত্তিতে উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশে বসবাস করতে স্বস্তি বোধ করে। আপনি যে বললেন বেশি স্বস্তি থাকে বা কম স্বস্তি থাকে। বেশি স্বস্তি থাকে ওই জায়গায়। যখন আপনি কাউকে মতের ভিন্নতার কারণে পদানত করতে চান, তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান, তখন আপনি নিজেরই ক্ষতি করেন। এটিই হলো ইতিহাসের শিক্ষা। আর সে জন্যই উদার বহুত্ববাদের কামনা করি। সে বহুত্ববাদ হতে হবে ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্বিশেষে। কোনো দেশ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ শাসন করে অগ্রগতি টেকসই করতে পারবে না। এটি হলো উন্নয়নের ব্যাকরনের অংশ। আমরা সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার কথা বলি, আগে আমরা বলতাম দারিদ্র্য বিমোচনমুখী উন্নয়ন লাগবে, এখন বলি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন লাগবে। মানে আপনি দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারেন, কিন্তু প্রচুর মানুষ এর বাইরে থেকে যেতে পারে, বিমোচিত হয়েও দরিদ্র থাকতে পারে। এখন আপনি বলছেন, শুধু দারিদ্র্য বিমোচন করলে হবে না, তাকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে, সমাজে জায়গা দিতে হবে। তাকে প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেটি আবার লোক দেখানো অন্তর্ভুক্তি নয়, কার্যকর অন্তর্ভুক্তি হতে হবে।

জহিরুল আলম: কিন্তু বেঞ্চমার্কটা কতটুকু হলে আপনি অন্তর্ভুক্তি মনে করবেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যদি বলি আমি সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিলাম, কিন্তু আমি এমন কিছু কথা বলেছি, যেগুলো যৌক্তিক। অন্তত ১০ টার মধ্যে আপনি যদি দু'টিও নিয়ে থাকেন, তাহলে আমি অন্তর্ভুক্ত হয়েছি বলে মনে করব।

জহিরুল আলম: মানে আমার কথা শোনা হয়েছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শুধু কথা শুনলে হবে না, নোটও নিতে হবে। আর যদি ১০ মিনিট আপনার জন্য বরাদ্দ থাকে, আপনি বলে গেলেন ১০ মিনিট, তারপর আমার কাজ আমি করলাম, তাহলে তো আর হলো না। এই যে অন্তর্ভুক্তি সেটি হলো দেশ ও জাতিকে একত্র করা। গত বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায়, একধরনের বৈকল্য এসেছে, নৈতিক বৈকল্য, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা কিছুটা বেড়েছে, নিরাপত্তাহীনতার বোধ অনেক ক্ষেত্রেই বিস্তৃত হয়েছে। এর সঙ্গে আপনি যদি বলেন, আগামী বছর স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপন করব, তাহলে জাতি হিসেবে আমার একতাবোধ কতখানি সংহত হয়েছে, সেটিও দেখতে হবে। ব্যাপারটি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী আমি নিঃসন্দেহে পালন করব। এটি আমার কাছে বড় ঘটনা। আমি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে কী অর্ঘ নিয়ে যাব? আমি তো একটি নিবেদন নিয়ে যাব, একটি তো অর্ঘ নিয়ে যাব। আমি কী এই উপাচার দেব যে আপনার জন্য আমি এটি নিয়ে এসেছি নেতা, এমন একটি জাতিকে নিয়ে এসেছি, যে জাতি গত ৫০ বছরে আগের চেয়ে বেশি সংহত, উন্নত ও সামাজিকভাবে আমি অনেক বেশি বিকশিত ও মানবতাসম্পন্ন। এই কথাটা বলার পরিস্থিতি নিয়ে আমি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে যেতে চাই।

জহিরুল আলম: কিন্তু যেদিন আমরা বলব, অর্থনীতির অঙ্গনে আমরা বেশ ভালো করেছি বা আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছি, সেই উন্নয়নের চিত্র কী আমি অস্বীকার করতে পারি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: একদমই না। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে, দরিদ্র মানুষের হার কমছে, তারপরও ২০ শতাংশ মানুষ দরিদ্র (তথ্য সংশোধিত)। ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে যদি ৩ কোটির বেশি মানুষ দরিদ্র থাকে, সেটি কম নয়। আমাদের মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে, শিশু মৃত্যুর হার কমেছে। বাংলাদেশের গড় আয়ু এখন

পৃথিবীর গড়ের চেয়ে বেশি, আমরা তিন বেলা খাওয়ার মতো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি, আমরা পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক প্রস্তুতকারক দেশ, প্রবাসী আয়ে শীর্ষ ১০-এ(সংশোধিত) আছি। এগুলো কে অস্বীকার করবে? এগুলোতো বাংলার মানুষের সৃষ্টি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সৃষ্টি, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ৩ কোটির বেশি মানুষ গরিব থেকে যাবে, যাদের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার স্বাভাবিকের ২/৩ গুণ, যারা প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের চিকিৎসা ছাড়া সন্তান প্রসব করাবেন। দেশে শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার ৪০ শতাংশের উপরে, এরা সেই গরিব ঘরের ছেলে-মেয়ে। তারা শুধু চর এলাকা থেকে এসে বিকাল পর্যন্ত থাকতে পারে না, না খেয়ে থাকতে হয় বলে এবং স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম এখনো সবার কাছে পৌঁছেনি বলে। আমরা যখন সফলতার কথা বলি, তখন আমি যেন বিস্মৃত না হই যে আমাদের পথ এখনো অনেকটা বাকি।

জহিরুল আলমঃ আমরা ৫০ বছরে উপনীত হয়েছি, আমরা বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী পালন করতে যাচ্ছি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমাদের ৫০ বছরের যে সাফল্য, পৃথিবীর যে কোনো উন্নয়নশীল দেশের জন্য তা ঈর্ষণীয়। এ কথা যখন আমি বলি, তখনো আমার অনেকটা পথ যেতে হবে, সুতরাং সে কথা বলার অধিকার আপনি কেড়ে নিতে পারেন না। যার জন্য করেছি তারা যেমন আছে, যার জন্য করতে পারিনি, তারাও আছে। প্রবৃদ্ধির কথা যদি বলি, যেই প্রবৃদ্ধি হোক না কেন, তার ভাগ পেল কে? তার সবচেয়ে বড় ভাগ নিয়ে গেল কে? কত কোটি টাকা ব্যাংকে ফেরত যায় নি?

জহিরুল আলমঃ ১ লাখের বেশি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ সেটি প্রবৃদ্ধির টাকা। ১০-১৫ শতাংশ মানুষ শুধু কর দিচ্ছে, যারা দিচ্ছে তারা যথেষ্ট পরিমাণে দিচ্ছে না, ২০০ কোটি ডলার করে বছরে বাইরে চলে যাচ্ছে। ওটা কার টাকা? আপনি ব্যাংকের টাকা ফেরত দেন না, কর দেন না, আপনি টাকা পাচার করেন ইত্যাদি। এই টাকা কোথায় যায়? তাহলে আমি এই মানুষগুলোর নাম জানি, আমি জানি পানামা পেপারসে কার নাম আছে, তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেই কেন। আমি কীভাবে আপনার ক্যাসিনো অ্যাকশনে আস্থা পাব বলেন? এই ক্যাসিনোতে যে টাকা আছে, সেটিও তো প্রবৃদ্ধির টাকা। তাহলে প্রবৃদ্ধির টাকা আমার গ্রামের কৃষক বা বিধবা মহিলা অথবা অনাথ শিশুর কাছে পৌঁছাতে পারত। বাকি যে ৩ কোটির বেশি মানুষের কথা বলেছি, তারাও দারিদ্র্য থেকে বেরোতে পারত, যদি এই প্রবৃদ্ধির টাকা আমরা সেদিকে প্রবাহিত হতে দিতে পারতাম।

জহিরুল আলম: ড্রাইভ এগেইন্সট করাপশ্যান (দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা) এটি কতটা অর্থবহ লেগেছে আপনার কাছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ক্যাসিনোতে যেটি হচ্ছে, সেটি তো রোগ নয়, উপসর্গ। ওই মানুষেরা কারা? সেই মানুষেরা সরকারের সঙ্গে ব্যবসা করে, ঠিকাদার, এরা রাজনীতির অংশীদার হিসেবে পুঁজি নিয়ে চলে। ওদের তো প্রভু আছে, প্রভুরও প্রভু আছে। আপনি ভৃত্যদের নিয়ে যদি এত আলোচনা করেন, তাহলে প্রভুদের কী হবে?

জহিরুল আলম: উনাদের সব সংযোগ পুঁজি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: উনাদের সংযোগ পুঁজি। আর যদি আপনি ধারাবাহিকভাবে কাঠামোতে পরিবর্তন না আনেন, সমাজব্যবস্থার যে কাঠামো প্রতি মুহূর্তে দারিদ্র্য সৃষ্টি করে, যে মানুষ সক্ষমতা পায় না, যে মানুষ চাকরি পায় না, উদ্যোক্তা হতে পারে না, সেই সমাজ থেকে দারিদ্র্য কোনো দিনও যাবে না। এ কারণে সবচেয়ে উন্নত দেশেও দরিদ্র মানুষ থাকে, রাস্তার ধারে সেতুর নিচে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকে। যে ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত কলুষিত পুঁজি তৈরি করে, কালো টাকা তৈরি করে, অসৎ ব্যবস্থা যেটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই ব্যবস্থার মধ্যে আপনি ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান দিয়ে আমাকে কী বোঝাচ্ছেন, আমি বুঝি না। ক্যাসিনোতে যে টাকাটা এসেছে, সেই টাকার উৎস যদি আপনি ধরিয়ে দিতে পারতেন, তাহলে বুঝতাম, এটি বড় ব্যাপার। এগুলো আমার কাছে উপসর্গ, সমস্যা নয়।

জহিরুল আলম: কিন্তু এটিকে সূচনা হিসেবে দেখা যায় না?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটিকে সূচনা হিসেবে দেখা যেতে পারে, এটি তো পুরোনো তরিকার বিষয়। সেদিন শুনলাম, দুর্নীতি দমন কমিশন হাজার হাজার মামলা করেছে। বাংলাদেশে তো হাজার হাজার মামলার দরকার পরে না।

জহিরুল আলম: মানি লন্ডারিং মামলা।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনার দরকার হলো পাঁচটা মানুষকে নমুনা হিসেবে, সবচেয়ে বড় হিসেবে স্বীকৃত যারা – এই সমাজে তসরুফ বা দুর্নীতি করে – যাদের সবাই চেনে, তাদের ধরা। দুর্নীতি দমন কমিশন শুধু উনাদের চেনে না, বাকি দেশ-জাতি উনাদের চেনে? আপনি পাঁচটা লোককে যদি উদাহরণস্বরূপ শাস্তি দিতেন, তাহলে বাকিরা বার্তা পেত। এখন কী বার্তা পাচ্ছে? এখন আপনি আলু, মুলা, কলা ব্যবসায়ীদের নিয়ে

আলোচনা করবেন, যে কেরানীরা আছে, তাদের নিয়ে আলোচনা করবেন, হয়তো সিপাইদের নিয়েও আলোচনা করবেন, কিন্তু এদের তো পিতা আছে, প্রভু আছে। আপনি পিতা ও প্রভুদের কাছে পৌঁছাতে পারবেন না। কারণ, আপনিও যদি ওই কাঠামোর অংশ হয়ে যান, তখন *হু উইল মনিটর দা মনিটরস*। যে এটির ব্যবস্থা দেখবে তাকে কে দেখবে? সে জন্য আমি বলছি, এগুলোর প্রশাসনিক বা টেকনিক্যাল সমাধান নাই। এর চরিত্র রাজনৈতিক।

জহিরুল আলমঃ রাজনৈতিক বায়ুমন্ডল সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ রাজনৈতিক সমাধানের জায়গাটি হলো, সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি এটি উপলব্ধি করতে না পারেন বা উনারা যদি এটি মনে না করেন যে, দুর্নীতি মুখে নয় কাজের মধ্য দিয়ে দূর করতে হবে, তাহলে এটি আমার জন্য উপকারী। এটি জনমানুষের আস্থা পেতে কাজে দেবে। আমি এমন একটি কিছু করে যাব, যাতে সেই কাজের মধ্য দিয়ে দিয়ে ইতিহাস আমাকে মনে রাখে। ফলে সবাই আমাকে ভালোবেসে নির্বাচনে ভোট দেবে। মানুষ নির্বাচনে ভোট দেবে – এই আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে, তাহলে একধরনের পরিস্থিতি হয়তো সৃষ্টি হতে পারে।

জহিরুল আলমঃ একটি তো ধারণা হয়েছে যে মানুষ ভোটবিমুখ হয়ে গেছে, কিন্তু আগামী দিনগুলোতে মানুষের ভোটকেন্দ্রিক হওয়ার সম্ভাবনা আপনি দেখছেন কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আবার ওই শব্দগুলো বলি, আমি একটি নৈতিক বৈকল্য দেখছি, আমি যে একটি সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দেখছি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের জনসম্পৃক্ততার অভাব দেখছি, এটির একটি বড় কারণ হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন না হওয়া। প্রবৃদ্ধির একটি বড় বিষয় হলো রাষ্ট্র পরিচালনায় মানুষের মতামত স্থান পাওয়া, যে রাষ্ট্র আমার কথা গ্রহণ করছে, দুই পয়সা হলেও নিচ্ছে, সে যদি মনে করে আমি বিবেচ্য নই, তখন এই বিচ্ছিন্নতা বাড়তে থাকে। এই বিচ্ছিনতা তখন রাতের অন্ধকারে ফেসবুকে বা সামাজিক মাধ্যমে কটু মন্তব্য হিসেবে আসবে।

জহিরুল আলমঃ সে জন্য কী বলাটা কমে গেছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ না, আমি মনে করি যে সামাজিক সক্রিয়তা থেকে যায়। আমরা ছোটবেলায় কোনো কিছু যদি অন্যায় মনে করেছি, তার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছি, একধরনের ঝুঁকি নিয়েছি। অনেক সময় বেঠিকভাবে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে।

জহিরুল আলম: শিক্ষার্থীরা তো নেমেছে কোটাবিরোধী আন্দোলনে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ, একটি ফল তো তারা পেয়েছে। একটি আইন পেয়েছেন তারা। ভালো হোক, মন্দ হোক, প্রত্যক্ষ ফলাফল তো আমরা পেয়েছি। গণজাগরণ যখন হয়েছিল, তখন তার সঠিক ফলাফল আমরা পেয়েছি। আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পেরেছি এবং তাদের শাস্তি হয়েছে। আমি যেটি বলতে চাচ্ছি, আপনি যখন সামাজিক সক্রিয়তা দেখান, ধারাবাহিকভাবে দেখান, একটি যৌক্তিক কারণের মধ্যে দেখান, তখন সমাজে পরিবর্তন আসবে। এমনকি সবচেয়ে বিরস সরকারও এটি শুনতে বাধ্য হয়। আমার সেই অভিজ্ঞতা আছে। নির্বাচন যাই হোক না কেন, সামাজিক আন্দোলনগুলো ফলাফল নিয়ে আসছে। তাই এই জায়গায় আমি উৎসাহ বোধ করি। নতুন যুব সমাজে আমি উৎসাহ বোধ করি। এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর বয়স ২৪ বছরের নিচে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এরা পুরো দায়িত্ব নেবে। আমি চাই এই ছেলে-মেয়েগুলো যেন নির্বিকার না থাকে, তারা যেন নৈতিক বৈকল্যে না ভোগে, তারা যেন বিচ্ছিন্ন না থাকে, তারা যেন বাংলাদেশকে নিজের মনে করে আগামী দিনে নেতৃত্ব দেয়। এটিই আমাদের প্রত্যাশা। স্বাধীনতার ৫০ বছরে, বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবসে এটিই প্রত্যাশা।

জহিরুল আলম: একটি বিষয় আপনি শুরুতেই বলছিলেন যে আমাদের প্রতিবেশী দেশের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নানাভাবে প্রভাবিত করে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: পাশের বাড়িতে আগুন জ্বলবে, আপনার গায়ে আঁচ লাগবে না, তা তো হয় না। প্রতিবেশী দেশে সম্প্রতি তিনটি বড় বড় ঘটনা ঘটেছে, যার প্রভাব একভাবে না হয় আরেকভাবে আমাদের দেশেও পড়বে – নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়। একটি ঘটনা হলো কাশ্মীর, কাশ্মীরের যে সার্বভৌমত্ব ছিল, সেটি বাতিল করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় নাগরিক পঞ্জি করে বেআইনি ভাবে বিভিন্ন মানুষকে চিহ্নিত করা এবং তৃতীয়ত, বিশেষ কিছু অমুসলিম ধর্মাবলম্বীকে নাগরিকত্বের সুবিধা দেওয়া। এই তিনটি কাজই সঠিক হয় নি। আমি ব্যক্তিগতভাবে তিনটিকেই অযৌক্তিক মনে করি। এটির প্রয়োজন ছিল না। যে ভারতকে আমরা জানি বা চিনি, সেই অসম্প্রদায়িক ভারতবর্ষের সঙ্গে এটি যায় না। এই তিনটি কাজই বাংলাদেশের জন্য – অভিঘাত বলুন, সাম্প্রদায়িকতা বলুন বা ভারতবিরোধী চেতনার কথা বলুন – আমাদের গণতান্ত্রিক ঈপ্সার কথাই বা যদি বলুন – সবক্ষেত্রেই অপকারী হয়েছে বলে মনে করি। বর্তমানে ভারতের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক, তাতে সরকার নিঃসন্দেহে একটু অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছে। মন্ত্রীদের যাওয়া বন্ধ করা হয়েছে, পানি নিয়ে আলোচনা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু এটি তো বন্ধ রাখা যাবে না, এখন না হোক তো পরবর্তীকালে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক চালু রাখতে হবে। এই

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক চীনের অবস্থানসহই মেনে নিতে হবে, আবার তার চেয়ে বৃহত্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারত মহাসাগরে অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিত থেকেও সেটি বিবেচিত হবে।

জহিরুল আলম: আপনি বললেন যে পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে আমরা মুক্ত থাকব না। আঁচ তো লাগবেই। কিন্তু আমরা তো চাই কোনো প্রতিবেশী, বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে টানাপোড়েন না হোক।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটি বুঝতে হবে যে আপনি যদি এটিকে শুধু তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে গাঁ বাচিয়ে বের হয়ে যেতে পারতেন, তাতে অসুবিধা ছিল না। কিন্তু পারছেন না তো। যখনই তারা কিছু মানুষকে আমাদের সীমান্তে ঠেলে দেবে এবং তাদের যদি নাগরিকত্ব প্রশ্নাতীতভাবে বাংলাদেশে না হয়, তখন তো আপনি সমস্যায় পড়বেন। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সেখানে নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়িক সমস্যা আছে বলে তারা চিহ্নিত করেছেন, কিছু সমস্যাতো আছেই, এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। সেই সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আপনি যদি ব্যবস্থা না নিতে পারেন, তাহলে আরেক ধরনের সমস্যা হবে। আপনি যদি মনে করেন, কাশ্মীরের মানুষের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে এবং বাংলাদেশের মানুষ যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তারা যদি সংহতি জানাতে চায়, আপনি তখন কী করবেন? ভারতে দেখলাম একদল সংহতি জানাতে চেয়েছিল অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল ছাত্রদের সঙ্গে, আরেকটি প্রগতিশীল গোষ্ঠী তাদের মেরে বের করে দিয়েছে। আপনি তো এটি থেকে বের হতে পারলেন না, সামাজিক দ্বন্দ্ব তো আমার মধ্যেও চলে এলো। এই সামাজিক দ্বন্দ্ব তো নিরসন করতে হবে।

জহিরুল আলম: কিন্তু এটি কি শুধু আঁচের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে বলে আপনি মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার সমস্যা তো অন্য জায়গায়। সেটি হলো, যদি আপনি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হন, তাহলে বিষয়টি আপনি মুক্তভাবে আলোচনায় নিয়ে আসবেন। এটিকে আপনি টেবিলের নিচে রাখতে পারবেন না। আপনি যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হন, তাহলে সেটি সংসদে আলোচনার বিষয়, মন্ত্রীপরিষদে আলোচনার বিষয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এটি নিয়ে রাজনীতি না করে জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করবে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

জহিরুল আলম: এটি কি জাতীয় স্বার্থে? নিরাপত্তার কোনো কোনো বিষয় নিয়ে কী উন্মুক্ত আলোচনা করা উচিত নয়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: পৃথিবীতে কোন জিনিসটা আছে, যেটি নিরাপত্তার নামে আপনি ড্রয়ারে ভরে রাখতে পারেন?

জহিরুল আলম: কিছু পুলিশ সদস্য ভারতে তথ্য পাচারের জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কেউ যদি বেআইনি কাজ করে থাকে, সেটির জন্য আইনে ব্যবস্থা আছে। ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। এটি যে ভারত বিরোধিতা করে সেও বলবে, যে ভারতের স্বপক্ষে বলে, সেও বলবে। আর আমি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কথাটা বলছি। আমি বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনে করি, ভারতের সাথে সম্পর্কটা গুরুত্বপূর্ণ। এটিকে স্থিতিশীল ও ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে যদি এরকম পরিস্থিতি হয়, তখন অস্বস্তিতে দরজার পেছনে না গিয়ে মুক্তভাবে আলোচনা করা উচিত; আমি অন্তত তাই মনে করি। উনারা তো আমার দেশ নিয়ে আলোচনা করতে কার্পণ্য করেন না, তাহলে আমার আলোচনা করতে সমস্যাটা কী, আমাকে নিয়ে যে আলোচনাটা হয়েছে, অন্তত সেটুকু নিয়ে? সেই আলোচনা তো আমি করতেই পারি।

জহিরুল আলম: সেটি আপনি দেখেন না?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সেটি আমি দেখছি না। আমি একধরনের পলায়নপর পরিস্থিতি দেখছি। হয়তো আলোচনার শেকড়টা কী হবে, কোনটাকে আমার সূচনাবিন্দু করতে হবে, সেগুলো জানা নেই। এগুলো আপনাকে আমার প্রথম আলোচনায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। মন্ত্রীপরিষদকে আমরা যেভাবে আকাঙ্ক্ষা করি, প্রত্যাশা করি, সমসাময়িক বিষয় মোকাবেলা করার জন্য তাদের যে অভিজ্ঞতা, নিজস্ব মতামত প্রকাশের ক্ষমতা, রাজনৈতিক চিন্তা ও দক্ষতা – এই জায়গাটাকে আমি বড় মনে করি।

জহিরুল আলম: নতুন বছরে পরিবর্তনের সূচনা হলে কেমন হবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নেত্রী তো সব সময় মন্ত্রীপরিষদকে নতুনভাবে দেখতে পারেন। একটি বছর গেছে, দলের সম্মেলন হবে, নেত্রী সেখানে চিন্তা করতেই পারেন, এটি তার এখতিয়ারের বিষয়। আমরা নাগরিক হিসেবে বলতে পারি, কীভাবে এই বিষয়গুলো দেখছি।

জহিরুল আলম: ক্ষমতাসীন দলটি সম্পর্কে আপনার কি মতামত? এই দলটি দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল, দীর্ঘসময় ধরে শাসন করছে এই

দেশকে। কিন্তু সম্প্রতি যেসব ঘটছে তাতে দলের মধ্যেই কিছু আলোচনা উঠেছে, কিছু সুবিধাভোগী, কিছু অনুপ্রবেশকারী জেঁকে বসেছে। নানাভাবে দলের ইমেজ ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা চলছে। এখন নতুন একটি কাউন্সিলে তারা যাচ্ছেন, সংসদে তারা দারুণভাবে শক্তিশালী, সেই পরস্থিতিতে দলটিকে আপনি কী অবস্থায় দেখেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা যেভাবে পরিচালিত হয়, সরকার যেভাবে পরিচালিত হয়, তা এককেন্দ্রিক। মন্ত্রীপরিষদের কথা বললাম, কিন্তু আসলে তো এই মন্ত্রীপরিষদ সরকার প্রধানেরই মন্ত্রীপরিষদ। একইভাবে দলের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। ব্যাপারটি শেষ পর্যায়ে দলের চিন্তা চেতনার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। সম্প্রতি দুর্নীতির বিরুদ্ধে, বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের বিরুদ্ধে, বিভিন্ন বড় বড় কেন্দ্রীয় নেতা, ছাত্র সংগঠনের নেতাদের বিরুদ্ধে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, আমার মনে হয়, জনগণ এতে উৎসাহিত হয়েছে। জনগণ এটি ইতিবাচকভাবে দেখে, আমিও ইতিবাচকভাবে দেখি। একধরনের চেতনা নিঃসন্দেহে আছে, যার ফলে এসব হয়েছে, সেটি রাজনৈতিকভাবেই আসুক বা প্রশাসনিকভাবে আসুক, আসছে। আমি আগেও বলেছি, যারা এসব ঘটাচ্ছে, তারা একটি ব্যবস্থার প্রতিভূ, ব্যবস্থাটা কিন্তু অন্য জায়গায়। এখন রাজনৈতিক নেতৃত্বের বোঝার ব্যাপার আছে, আমি ওই ব্যবস্থাকে শাসনের ভিত্তি মনে করি নাকি ওই ব্যবস্থা ভাঙলে শাসনের ভিত্তি আরো শক্তিশালী হবে, মানুষের কাছে আরো বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

জহিরুল আলম: কিন্তু এর মধ্যে তো ঝুঁকি আছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে ঝুঁকি ছিল না? উনাকে তো দেশদ্রোহিতার বিচারেও নিয়ে যেতে পারতো, তাই না? ২৬ মার্চের পর ঝুঁকি ছিল না? মুজিবনগর সরকার যখন গঠিত হয়, তখন ঝুঁকি ছিল না? সেনাবাহিনী যখন স্বাধীনতা যুদ্ধে এসেছে, ঝুঁকি ছিল না? এরশাদবিরোধী আন্দোলনে আমাদের ঝুঁকি ছিল না? তখন বন্দুক নিয়ে আমাদের পেছনে লোকজন গিয়েছে না?

জহিরুল আলম: কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তো ফিজিক্যালি এলিমিনেইট করে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ২১ অগাস্টের ঝুঁকি নিয়ে নেত্রী বের হয়ে এসেছেন, তাই নয় কি? সেটিও তো ঝুঁকির মধ্যে ছিল। আমি যেটি বলতে চাই, আপনার আমার সঙ্গে একজন নেতার তফাৎ কোথায়। আমি এমন সম্ভাবনা দেখি, এটি আপনার টক শোতে বলে চলে

যাব, আর নেতা এই সম্ভাবনাটা দেখে ঝুঁকি নিয়ে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নেতা সম্ভাবনাটা দেখে ঝুঁকি নিয়ে, নেতৃত্ব দিয়ে মানুষকে ওই জায়গায় পৌঁছে দেবে। আমরা শুধু ওই জায়গাটা দেখতে পাবো, নিয়ে যেতে পারবো না। সেটি পারবেন নেতা। নেতার ঝুঁকি নেওয়ার সক্ষমতাই হলো নেতৃত্ব। আমি এই নেতৃত্বের কাছে সেটিই প্রত্যাশা করি।

জহিরুল আলম: সরকারি দল নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি আজকে বেশ জটিল আলোচনা করছেন।

জহিরুল আলম: না না জটিল কিছু না, এসব আমাদের জানার মধ্যেই। আপনার কাছ থেকে আমি শুধু দৃষ্টিভঙ্গিটা জানতে চাই। এই যে বিরোধী রাজনৈতিক দল সংসদে এবং সংসদের বাইরে যারা আছে বা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, আপনি যদিও নাম ধরে আলোচনা করছেন না, তারপরও এই বিষয়গুলো এ বছর বেশ আলোচনার মধ্যে ছিল। তারা সংসদে যাবে কি যাবে না, এ নিয়ে দোদুল্যমানতা ছিল, তাদের নানা ধরনের বক্তব্য বিবৃতি থাকে, প্রতিদিনই তারা কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলছে। এই বিরোধী রাজনৈতিক পরিস্থিতি আপনি কীভাবে দেখেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার দৃষ্টিতে খারাপ। উনাদের একটি অপদার্থ রাজনৈতিক বিরোধিতার মধ্যেই পর্যবসিত থাকতে দেখি। রাজনৈতিক দল যখন আন্দোলন, সংগ্রাম বা জনগণের সামনে উপস্থিত হয়, তখন তাদের প্রথমে যে বিষয়টি তুলে ধরতে হয় সেটি হলো, তাদের বিকল্প চিন্তা কী। বাংলাদেশকে আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যেসব সামাজিক সমস্যার কথা একটু আগে আপনাকে বললাম; নৈতিক বিকৃতি বলেন, বৈকল্য বলেন, সামাজিক পুঁজির অভাবের কথা বলেন বা রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে যে ঘাটতির কথা বলছি সে কথা বলেন, সেগুলো পূরণে উনারা কী বিকল্প দিয়েছেন? আমি একটি সাধারণ উদাহরণ দিই। ২০০০-২০০৬ সাল পর্যন্ত ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। আমি এখন পর্যন্ত শুনিনি, উনারা এ নিয়ে আক্ষেপ করেছেন বা দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিকল্প চিন্তা হিসেবে কীভাবে বাংলাদেশেকে দুর্নীতিমুক্ত করবেন, সে কথা বলেন নি। উনাদের সময় যে জ্বালানির ঘাটতি হয়েছিল, সেটির ব্যাপারেও উনারা আগামী দিনে কী চিন্তা ভাবনা করছেন, তাও বলেননি। অর্থাৎ সামগ্রিকতায় তারা বিকল্প উন্নয়ন চিন্তা হাজির করেননি। সম্প্রতি নির্বাচনের প্রাক্কালে আমি দু'টি মাত্র শব্দ শুনেছিলাম। একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র বা রেইনবো সোসাইটি হবে। তারপর এটিকে কেউ আর ভেঙে তাৎপর্যটা বোঝাতে পারল না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিকল্প চেতনা দিয়ে আমাকে উজ্জীবিত করতে না পারেন, ততক্ষণ রাজনীতি শক্তিশালী হতে পারবেন না।

জহিরুল আলম: তাহলে উনারা করছেন কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি বলব, মানুষ নেতাকে সামনে দেখতে চায়। একজন নেত্রী জেলে আছেন বিভিন্ন কারণে, ঠিক নাকি বেঠিক, সে বিচার আমার করার দরকার নেই, জামিন উনার পাওয়া উচিত কী উচিত না, সে বিচারেও আমি গেলাম না। কিন্তু মানুষ ভবিষ্যতে ভরসার জায়গাটা দেখতে চায়। এই ভরসার জায়গাটা থাকতে হবে। তৃতীয়ত, সংগঠনের ব্যাপার আছে। যখন উনাদের ভোটকেন্দ্রে যেতে অসুবিধা হলো, উনারা তো সেভাবে মানুষকে উৎসাহিত করে নিয়ে আসতে পারলেন না। নেতৃত্বের কাছে ভরসা থাকতে হবে, এমন একটি কর্মসূচি থাকতে হবে, যে কর্মসূচিতে আমি উৎসাহিত বোধ করি এবং এমন একটি সাংগঠনিক শক্তি থাকতে হবে, যেটি আমাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসবে। শুধু মনকে বের করলে হবে না, শরীরকেও বের করে আনতে হবে। এরকম একটি জায়গায় যেতে হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, উনারা এই জায়গায় খুব বেশি সৃষ্টিশীল সমাধান দিতে পারছেন না, কারণ উনারা হয়তো বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্বে আটকে আছেন; যে দ্বন্দ্ব উনাদের অস্তিত্ব সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই যে উনারা দায়িত্ব পালন করছেন না, এটি জাতীয় দুর্ভোগ হিসেবে এসেছে। উনারা বলেন, অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বলেন, ডান-বাম মিলিয়ে, দেশের মধ্যে যদি গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা চর্চার অভাব হয়, সেটি যার দোষেই হোক, আমরা কেউ তার কুফল থেকে রেহাই পাব না। দেশের মধ্যে যদি প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি না থাকে, প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি না থাকে, তাহলে সমাজে মেধার বিকাশ ঘটবে না। আমরা উন্নতি করতে পারব না। আপনি প্রসঙ্গটি বিএনপির পরিপ্রেক্ষিতে তুললেন, কিন্তু আমি এটিকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখি। বিএনপির দায় আছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেশের রাষ্ট্র পরিচালনা এমন একটি পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছে, যেখানে বিকল্প রাজনৈতিক মতামত বা ভিন্ন রাজনৈতিক মতামতের স্থান আমরা এই মুহূর্তে দেখছি না।

জহিরুল আলম: একটু অর্থনৈতিক বিষয়ে আপনার কাছে শুনব। ২০১৯ সালের অভিজ্ঞতা থেকে ২০২০-কে আপনি কীভাবে দেখছেন বা ২০২০ সালে আমরা কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হব, সেই চ্যালেঞ্জগুলো কী বা সুযোগগুলো কী, সেটি একটু জানবো। যেমন, আপনি শুরুতেই বলেছেন, খেলাপি ঋণ নিয়ে উদ্বেগ আছে, ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা নিয়ে উদ্বেগ আছে, শেয়ার বাজার নিয়ে উদ্বেগ আছে, রপ্তানিতে যে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি চলছে, তাও মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। সঙ্গে অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে উদ্বেগ তো আছেই। রাজস্ব আহরণের কথাও আপনি বলেছেন, পরিস্থিতি খুব খারাপ, উন্নয়ন কর্মসূচির অবস্থাও খারাপ। সিপিডিসহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানও এসব কথা বলছে। এসব পরামর্শ বা আলোচনা কীভাবে নেওয়া হয় বা কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কিনা।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: একটি কথা আমি সব সময়ে বলি, কথাটা আমি আবার বলি, সেটি হলো যে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির আলেখ্য প্রচারিত হয়েছে, সেই প্রবৃদ্ধির আলেখ্য আমাদের উন্নয়নের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। প্রথমত হলো, এই প্রবৃদ্ধিমুখী উন্নয়ন এখন আর পৃথিবীতে খুব বেশি গ্রহণযোগ্য নয়। এর সঙ্গে মানবসম্পদ, গণতান্ত্রিক অধিকার ইত্যাদি অনেক বিষয় যুক্ত। আর এই প্রবৃদ্ধি যে হয় তাতে কার উন্নয়ন বেশি হয়, সেহেতু প্রবৃদ্ধি নির্ভর আলোচনা এখানে খুব বড় বিষয় নয়।

জহিরুল আলম: তাহলে আমরা কেন এই আখ্যান তৈরি করি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যিনি বলেন, যারা বলেন, এটির উত্তর হয়তো তারা দিতে পারবেন। আমি এই প্রশ্ন করি না। এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যা থেকেই যায়, সবচেয়ে উন্নত দেশেও থাকে, দেখেন ভারতের প্রবৃদ্ধি শ্লথ হয়ে গেছে। ফলে এটি কাঠামোগত সমস্যা, চক্রাকার নয়। চক্রাকার সমস্যা হলো, আপনার উত্থান হয়, পতন হয়। কাঠামোগত সমস্যাটা হলো এমন কিছু অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব, যার ফলে পুরো জিনিসটাই আপনাকে পেছনে টেনে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশ এই কাঠামোগত শ্লথ অবস্থার দিকে যাচ্ছে কিনা, সেটিই হলো বিষয়। সেটির কারণ হলো, যেখানে আপনি উন্নতি করতেন, সেই জায়গাটা নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আপনার মাথাটা ছাদে ঠেকে গেছে কিনা। ছাদটাকে যদি আর একটু উঁচু না করেন, সংস্কারের মাধ্যমে তখন আপনি আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারবেন না, সেটি আপনাকে চেপে ধরবে। কর ব্যবস্থার সংস্কার আপনি করেননি, প্রতক্ষ্য কর আহরণ করতে পারেন না, নতুন ভ্যাট কার্যকর করতে সমস্যা হচ্ছে। ফলে কর আদায় কম। এত প্রবৃদ্ধি, কিন্তু কর আদায় তো বাড়ে না। প্রবৃদ্ধি যদি হয়, তাহলে কর কোথায় গেল? এই মুহূর্তে ব্যাংকিং খাতের পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে ঋণ প্রবাহ স্মরণাতীতকালের সবচেয়ে কম। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ নেই। নয় বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। কর্মসংস্থানের কথা বলছেন, বাংলাদেশে যে যত পড়াশোনা করে, সে তত বেশি বেকার থাকে। যত বেশি আপনি শিক্ষিত, তত বেশি আপনার বেকারত্বের হার। যদি সাধারণভাবে ১০ শতাংশ হয়, তাহলে শিক্ষিত বেকারের ভেতরে ৩ ভাগের ১ ভাগের মতো, ২৫ শতাংশের উপর। আপনি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেখেন, সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখেন, আগে বৈদেশিক আয় ও অন্যান্য মিলিয়ে ৫ শতাংশের মধ্যে বাজেট ঘাটতি রাখতে পারতেন। এবার আপনি রাখতে পারবেন না। পুঁজি বাজার নিয়ে কথা আর না-ই বললাম। আমরা সবাই জানি, পুঁজিবাজারে কীভাবে চুরি হয়। একটির পর একটি আজেবাজে কোম্পানিকে বাজারে জায়গা দিচ্ছেন, তারা টাকা তুলে মানুষকে পথে বসিয়ে বের হয়ে চলে যাচ্ছে। কীভাবে আপনি এই কোম্পানিগুলোকে টাকা দিচ্ছেন? টাকা পাচার করা, মধ্যবিত্তের উপার্জন হরণ করা, এত বড় কৌশল অন্য

দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা জানি না। তারপর আপনি কিছু টাকা ব্যাংক বা সরকার থেকে এনে দেবেন, ওটা কিছুক্ষণের জন্য উঠবে, আবার ওখানে উৎসাহিত হয়ে কিছু টাকা বিনিয়োগ করবেন, আবার ওটা পড়ে যাবে। আপনার টাকা চলে যাবে।

সাধারণ ব্যাপার হলো, সরকার যদি ব্যাংকিং খাত ও পুঁজি বাজারের সংস্কার করতে না পারে, তাহলে রাজস্ব আদায়ে সরকারের পক্ষে আগামী দিনে টেকসই উন্নয়ন করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। ২০২০ সাল সরকারের জন্য বড় ধরনের ক্রান্তিকাল বলব না, তবে প্রণিধানযোগ্য বছর আসছে বলে আমার মনে হয়।

জহিরুল আলম: কিন্তু এর বিপরীতমুখী আশাবাদও কী নেই? যেমন ধরেন মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন। আমরা ১০০ টা অর্থনৈতিক অঞ্চল করছি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মেগা প্রকল্পের ফলে তাৎক্ষনিকভাবে ঋণের বোঝা বাড়ছে। দায়-দেনা বাড়ছে। গত দুই বছরে সন্তোষজনক অবস্থানে থেকে দায় দেনার ক্ষেত্রে সরকার চাপের মুখে যাচ্ছে। বৈদেশিক দায় দেনাও এর মধ্যে চলে যাচ্ছে। ১০ টাকার জিনিস আপনি হাজার টাকা দিয়ে তৈরি করছেন, ফলে দায় দেনা তো আরো বাড়বে। এর প্রভাব আসবে দীর্ঘমেয়াদে। ১০০ প্রকল্পের কথা যে বলেন, ১০ টাও তো চালু করতে পারিনি আমরা। অর্থনীতির দিক থেকে ২০২০ সালকে আমি নজরে রাখার মতো বছর বলে মনে করি। নীতিপ্রণেতা হলে আমি নিঃসন্দেহে চিন্তার মধ্যে থাকতাম।

জহিরুল আলম: কী করতেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটির চটজলদি সমাধান নেই। এত বছরের জমে থাকা আমাদের অনেক করণীয় রয়ে গেছে। আমাকে আরেক জায়গায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী? আমি এক নম্বরে বলতাম ব্যাংকিং খাত, একে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার না করলে সমাধান নেই। দ্বিতীয়ত, রাজস্ব আদায়। সরকারের আয় যদি না বাড়ে, তাহলে সরকারের কিছু করার ক্ষমতা সীমিত হয়ে যাবে। আরেকটি হলো পুঁজি বাজার।

জহিরুল আলম: সামগ্রিকভাবে ২০২০ সালের এই সময়ে যখন আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে কথা বলব, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে, তখনকার বাংলাদেশকে আপনি কীভাবে দেখেন? আপনি তো অনেক আশা ব্যক্ত করেছেন। সেই বাংলাদেশের চিত্রটা কেমন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই ৫০ বছর উপলক্ষে এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ পৃথিবীর নজরে থাকবে। বাংলাদেশ বিভিন্ন কারণে পৃথিবীর নজরে ইতিমধ্যে আছে। ভালো কারণে আছে, খারাপ কারণেও আছে। সবচেয়ে বড় সূচক যেটি হবে সেটি হলো, রাষ্ট্র নাগরিককে কী নজরে দেখে। নাগরিক বলতে আমি সব নাগরিককে বোঝাচ্ছি। পিছিয়ে পড়া নাগরিকদের কথা একটু বেশি বলছি। রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্কটাই যেন সবচেয়ে বড় হয়ে উদ্ভাসিত হয়। আমাদের দেশে নাগরিক অধিকার সম্মান করা হয়, যে নাগরিক অধিকারের অর্থ হলো, কথা বলা এবং বার্ধক্যে সেবা পাওয়ার অধিকার। এরকম একটি মানবিক সমাজে থাকার আগ্রহ আমাদের আছে। আমরা পুরোপুরি সেখানে যেতে পারিনি তা ঠিক, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু এই ব্যাপারে পুরো দেশ ও জাতি একমত যে আমরা এরকম একটি মানবিক, অসম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল বাংলাদেশ চাই। যেটি হয়তো শহীদদের মনেও ছিল।

জহিরুল আলম: এই বাংলাদেশের জন্য রোহিঙ্গা সংকট কতখানি বিপজ্জনক?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশের জন্য আগামী বছরে রোহিঙ্গা সংকট এবং ভারতের সাথে সম্পর্ক – এই দু'টি জিনিস একসঙ্গে থাকবে। রোহিঙ্গা সংকট একটি ফ্লুইড সিচ্যুয়েশন। আমার যেটি চিন্তা হয় সেটি হলো, আমাদের সামাজিক শান্তি যেন বিনষ্ট না হয়। ১০ লাখের উপর মানুষ যদি কোনো কারণে ওই বেড়া ভেঙে বের হয়, তাহলে চিন্তা করে দেখেন, বাংলাদেশের কী হবে? সেনাবাহিনীও কি তাদের এক জায়গায় রাখতে পারবে কিনা?

জহিরুল আলম: আমরা তো তাদের রিলোকেইট করতে চাই ভাষান চরে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সে আলোচনা শেষ, আজ আর এ নিয়ে কথা না বলি। আর ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তো চলমান ব্যাপার। এটিকে গতিশীলভাবে দেখতে হবে, এটি থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ আমাদের নেই। তাই এ নিয়ে মুক্তভাবে আলোচনা করে জাতীয় স্বার্থের অবস্থান থেকে ব্যাপারটি বিবেচনা করতে হবে। শক্তি সঞ্চয়ের জন্য নাগরিক ও অন্যান্য শক্তির সাথে আলোচনায় বসতে হবে।

জহিরুল আলম: ধন্যবাদ, ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আপনাকে। দর্শক আজকের এই সময়ে এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।

এই সময়ে, এনটিভি
১৯ ডিসেম্বর ২০১৯

সামগ্রিক মূল্যায়ন ২০১৯

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জিল্লুর রহমান: *দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা চ্যানেল আই দেখছেন, তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তৃতীয় মাত্রা দেখার জন্য। প্রিয় দর্শক ২০১৯ সালের শেষপ্রান্তে আমরা, সামনে নতুন একটি বছর, নানারকমের সমস্যা ও উত্তাপের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ নতুন বছরকে ধারণ করে নেবে। এই উত্তাপ দেশের ভেতরে যেমন আছে, দেশের বাইরে থেকেও তেমন আছে। গোটা বিশ্ব জুড়েই একধরনের অস্থিরতা। বিশ্ব জুড়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা টানাপোড়ন, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এসব নানা বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের আজকের অতিথি সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্বাগতম আপনাকে স্টুডিওতে।*

প্রথমেই জানতে চাইব, এই বছরটিকে আমরা বিদায় জানাচ্ছি, ২০১৯ প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের মানুষের জন্য কেমন গেল – রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে। অর্থনীতিবিদ হিসেবে অর্থনীতির বিষয়টি আপনার কাছ থেকে বেশি শুনতে চাইব।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ, যে কোনো বিকাশমান, উন্নয়নশীল ও স্বল্প আয়ের দেশে প্রতি বছরই কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং প্রতি বছরই ধারাবাহিকভাবে এসব প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের চেষ্টা করা হয়। এই বছরে দু'টি জিনিস সামনে এসেছে, তিনটিও হতে পারে। বড় একটি বিষয় হলো, অর্থনীতিতে সম্প্রতি বিনিয়োগের যে শ্লথ অবস্থা ছিল, তার গতি বাড়াতে পারলাম কিনা এবং সেটির সঙ্গে সংযুক্ত কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন – এগুলোও আমার কাছে বড় মনে হয়। এটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নতুন যে জিনিসটি গত বছর আবির্ভূত হয়েছে তা হলো বাজার ব্যবস্থায় অস্থিরতা। অর্থাৎ সরকার তার প্রত্যক্ষ ও

পরোক্ষ নীতি দিয়ে বাজারকে স্থিতিশীল রাখা এবং বিশেষ করে মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার যে সাফল্য গত কয়েক বছরে অর্জন করেছিল, তা এ বছর কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন হয়েছে। সন্দেহ নেই। এর সঙ্গে এসেছে সামাজিক অস্থিরতা। নারী নির্যাতনের মতো বড় একটি বিষয় এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ফলে সমাজে এক ধরনের নৈতিক বৈকল্য বা বিচ্ছিন্নতার বোধ বেড়েছে। বিনিয়োগ বলেন, বাজার বলেন বা মানসিক পরিস্থিতি বলেন, এসব ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে দেশের অন্যান্য অগ্রগতি ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। যেমন, ক্রমান্বয়ে পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হচ্ছে, অনেক রাস্তাঘাটের উন্নতি হচ্ছে বা মানবসম্পদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে প্রচুর অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে। সেই আনন্দ বা তুষ্টি এই ধরনের যন্ত্রণা বা অস্বস্তিকে সম্পূর্ণ ঢেকে দিতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। আর এর বাইরে আছে এক ধরনের রাজনৈতিক শূন্যতা, দেশের মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে, এই রাজনৈতিক শূন্যতা কিন্তু আরো অনেক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। এটি আমলাতন্ত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, আমাদের নাগরিক সমাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। এই রাজনৈতিক শূন্যতা উদ্যমী, প্রতিযোগিতামুখী ও মেধাভিত্তিক সমাজ বা রাষ্ট্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক ধরনের পিছুটান হিসেবে কাজ করেছে। আপাতদৃষ্টিতে একধরনের স্থিতিশীলতা থাকলেও এই শূন্যতাা যেন পাশাপাশি ছায়ার মতো আছে। দেশটা যদি কায়া হয়, তবে শূন্যতাা ছায়া। এই কায়া ও ছায়ার কিছুটা মায়ার মধ্যে আমরা ২০১৯ সালে ছিলাম।

এর বাইরে সম্প্রতি আরো কিছু ঘটেছে। একটি হলো রোহিঙ্গা সমস্যা। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গাম্বিয়ার উদ্যোগ, আন্তর্জাতিক আদালত ইত্যাদি দেখছি। পাশাপাশি জাতিসংঘের এক ভোটাভুটিতে আমাদের বড় ধরনের বিজয় এসেছে। তারপরও সমস্যাটা প্রকৃত অর্থে দূর হচ্ছে না। এটি একটি চলমান সংকট হিসেবে আমাদের সঙ্গে থেকে যাচ্ছে, আগামী বছরের জন্যও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য। সম্প্রতি যে জিনিসটির আরো প্রভাব অনুভূত হচ্ছে তা হলো আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যেসব ঘটনাবলি ঘটছে সেগুলো। প্রতিবেশীর ঘরে যদি আগুন লাগে এবং সেই আগুন যদি আমার এদিকে নাও আসে, তবু এর উত্তাপ থেকে আমার মুক্তি নেই। আমার প্রতিবেশীর ঘরের আগুনের উত্তাপ আমাদের দেশে সম্প্রতি অনুভূত হচ্ছে, আগামী দিনে কী হবে, সেটি চিন্তার ব্যাপার। সংক্ষেপে বললে, আমাদের অর্জনগুলোর পাশাপাশি এক ধরনের অস্বস্তি নিয়েই বছরটি শেষ হচ্ছে। সেই অস্বস্তিটা রাজনৈতিকভাবে আছে, সামাজিকভাবে আছে, অর্থনৈতিকভাবে আছে, পররাষ্ট্রনীতিতেও একভাবে আছে। মনে রাখতে হবে, এটি ছিল নতুন সরকারের ভিত্তি বছর। সাধারণত রাজনৈতিক চক্রে দেখা যায়, প্রথম ভিত্তি বছরটি শক্তিশালী হওয়ার কথা, তাতে উদ্যম থাকে, উদ্যোগ থাকে, উত্তেজনাও থাকে; কিন্তু সেটি কোনোভাবে প্রতিভাত হয় নি।

মন্ত্রীসভার কার্যক্রম

জিল্লুর রহমান: কিন্তু কেন সেটি মনে হয় নি? একেবারেই নতুন একটি মন্ত্রীসভা, নতুন নতুন মুখ। কেন মনে হচ্ছে হলো না? তার মধ্যে এখানে অনেক তরুণ আছেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়ে আমি ব্যক্তিগত মন্তব্য করতে চাই না। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মন্ত্রীসভা তার উপস্থিতি আমাদের জানান দিতে পেরেছে বলে মনে হয় না। অনেক মন্ত্রী যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে যথোপযুক্তভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড দিয়ে যোগ্যতার সঙ্গে সমর্থন দিচ্ছেন, এমনটিও মনে হচ্ছে না। কী কারণে হচ্ছে না, তা আমি ভেবে দেখার চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয়, বাংলাদেশের ইতিহাসে যতগুলো মন্ত্রীসভা কাজ করেছে, যতটা আমি কাছ দেখে দেখেছি, তার মধ্যে এই মন্ত্রীসভাটি অনেক বেশি নিরীহ। মানে এর ভালো করার ক্ষমতা কতখানি আছে আর খারাপ করার ক্ষমতা কতটুকু আছে, তা বলতে পারছি না। সাধারণত মন্ত্রীসভায় আমরা দু'ধরনের বড় যোগ্যতা দেখি। একটি হলো, আপনি একজন বড় ধরনের নেতা, মানুষের সঙ্গে উঠে, বসে, চলে এক ধরনের কর্তৃত্ব নিয়ে আপনি আসেন, প্রশাসন আপনাকে সেভাবে সম্মান করে এবং রাজনৈতিক মন্ত্রী হিসেবে আপনার যে দর্শন, তা বাস্তবায়ন করেন। আরেক ধরনের মন্ত্রী আছেন, যারা কোনো না কোনো পেশায় বুৎপত্তি লাভ করেছেন, তারা নিজেদের সেভাবে উপস্থাপন করতে পারেন এবং সেই যোগ্যতার ভিত্তিতে কারিগরি সমাধান বা টেকনিক্যাল কাজগুলো করেন। তাদের এ ধরনের সামাজিক, পেশাজীবী ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি থাকে, এই পরিচয় তাদের কারিগরি সমাধানগুলো বাস্তবে রূপায়ন করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে, ফলে আমলাতন্ত্রে সেই চাপটি থাকে। বর্তমানে এই দু'টি যোগ্যতার কথা বিবেচনা করলে দেখবেন, কোনোটিই এই মুহূর্তে নেই। হতে পারে উনারা নবীণ, তাহলে এটি বিনিয়োগ হচ্ছে, হয়তো উনারা পাঁচ বছর পরে কোনো একটি সময়ে সেরকম হবেন, তা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারবো না। কিন্তু এই মুহূর্তের পরিস্থিতির কথা যদি বলেন, তাহলে আগে সমস্যা বুঝতে হবে। এই বাজার ব্যবস্থা দিয়েই তো আমি বললাম। এখন পাটকল শ্রমিকদের কথা যদি বলি, শিক্ষকদের কথাও মাঝে মধ্যে আসছে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলী আমরা দেখছি; অর্থাৎ সমস্যা আগে থেকে অনুমান করতে হবে। এটি দূরদৃষ্টির ব্যাপার, ব্যাপারটি রাজনৈতিক ও পেশাগতও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, যে মুহূর্তে একটি অপ্রত্যাশিত সমস্যা আসে, সেটি মোকাবেলায় আপনি তাৎক্ষনিকভাবে ব্যবস্থা নিতে পারেন কিনা। পরবর্তীকালেও যদি হয়, কোনো সিদ্ধান্ত যদি আপনি ঘোষণা করেন, সেটিকে আপনি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করে রাখতে পারেন কিনা। তবে অনেকেই পরিহাস করে বলেন, আপনি যে প্রত্যাশাটা করছেন, সেটি আবার প্রত্যাশিত

কিনা। কারণ হয়তো এমনভাবেই একটি মন্ত্রীসভার অবয়ব এবং তার প্রচলন উচ্চ পর্যায় থেকে চিন্তা করা হয়েছে। যেহেতু আমরা অনেক বেশি এককেন্দ্রিক একটি রাজনৈতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে গেছি, সেহেতু একটি *এক্সিকিউটিভ প্রিমিয়ারশিপ নট দ্য পার্লামেন্টারি প্রিমিয়ারশিপ*-এর মধ্যে এক্সিকিউটিভ বা চিফ এক্সিকিউটিভ – এই ভিত্তিতা একটু অন্যভাবে দাঁড়িয়েছে। সেটির ফলাফল কী মন্ত্রীসভার চলন বলনে বোঝা যায়। অথবা তাদের যে জনসমক্ষে তেমন একটি দেখাও যায় না, সেটি বড় বিষয় বলে মনে হয় আমার।

প্রবৃদ্ধির সামঞ্জস্যহীনতা

জিল্লুর রহমান: আপনি যেমনটা বলছিলেন, অনেক রকমের মেগা প্রকল্প হচ্ছে, দৃশ্যমান কিছু উন্নয়ন হচ্ছে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের অবকাঠামো উন্নয়নের কথাও বললেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এসব উন্নয়নের সুফল মানুষ পাচ্ছে কিনা বা মানুষ বোধ করছে কিনা যে কিছু একটি হচ্ছে। আরেকটি প্রশ্ন, আমরা যে প্রবৃদ্ধির হিসাব পাই সেটি ৮ শতাংশের উপরে। পাশাপাকিনানা ধরনের উন্নয়ন বাংলাদেশে হচ্ছে, আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেটের কথাও আমরা বিভিন্ন সময় শুনি ও দেখি। কিন্তু অর্থনীতির অন্যান্য দিক যদি আমরা মিলিয়ে দেখি, আমরা যদি পুঁজিবাজারের দিকে তাকাই, ব্যাংকিং খাতের দিকে তাকাই, যদি রপ্তানি, তৈরি পোশাক খাত বিবেচনা করি – এগুলোর সঙ্গে প্রবৃদ্ধির হার ঠিক মেলে না। এই যে মেলে না, অর্থনীতিবিদ হিসেবে এর ব্যাখ্যা কী আপনার কাছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রথম কথা হলো, যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয় প্রবৃদ্ধির, সে পরিসংখ্যান নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছি, শঙ্কা প্রকাশ করেছি। এখন বলতে পারেন যে সংখ্যা কত হবে? কিন্তু সেটি বলার মতো ক্ষমতা, তথ্য-উপাত্ত আমাদের মতো মানুষের হাতে নেই।

জিল্লুর রহমান: আপনারা কি অর্থনীতিবিদ হিসেবে বা সিপিডি থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জাতীয় আয় পরিমাপ করার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিসংখ্যান ব্যুরোর। এটি করার জন্য যে পরিমাণের জাতীয় জরিপ করতে হয়, যে অর্থ, প্রসাশনিক জনবল দরকার হয়, সেগুলো আর কারো নেই। এটি কেবল তাদেরই আছে। কথা হচ্ছে, শরীর যদি আপনার ভালো থাকে, তাহলে আপনার শরীরের উষ্ণতা একটি পর্যায়ে থাকবে। আপনার শরীর যদি ভালো থাকে, তাহলে আপনার ঘাম হওয়ার কথা নয়;

আপনার শরীর যদি ভালো থাকে, তবে আপনার হেঁটে এখান থেকে ওখানে যেতে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা নয়। আমরা এই লক্ষণগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি। একটি সুস্থ মানুষের কী কী লক্ষণ থাকা উচিত? অর্থাৎ ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি যদি হয়, তাহলে আপনার কর আদায়ের হার কত হওয়ার কথা ছিল? বাংলাদেশ এই মুহূর্তে কর আদায়ের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্নের কাতারে। এমনকি নেপালের চেয়েও আমরা পিছিয়ে আছি। তাহলে এত যদি প্রবৃদ্ধি হয়, প্রবৃদ্ধি তো আয়েরও হিসাব, তাহলে ওই আয়ের টাকায় কর আদায় হলো না কেন? তাহলে কী প্রবৃদ্ধির আয় নেই, নাকি কর যাদের দেওয়ার কথা, তারা দিচ্ছেন না? নাকি আগের চেয়েও কম দিচ্ছেন? তাহলে প্রশাসনের যোগ্যতা, দক্ষতা কোথায় গেলো? দ্বিতীয়ত, প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ গত ৪/৫ বছর যাবৎ স্থবির হয়ে আছে। তাহলে বাড়তি বিনিয়োগ কোথায়? শুধু রাষ্ট্রের বিনিয়োগ দিয়ে কী এত বেশি প্রবৃদ্ধি করা সম্ভব? এখানে রাষ্ট্রের বিনিয়োগ মোট দেশজ আয়ের ৬/৭ শতাংশের মতো, আরো ২৩ শতাংশের মতো রয়ে গেছে (এই পরিমাণ প্রবৃদ্ধির জন্য)। সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ ছাড়া কেমন করে হলো? আমাদনি হলো না পুঁজি পণ্য। তাহলে আমদানি ছাড়া আপনি কি দিয়ে উৎপাদন করলেন? কর্মসংস্থানের হিসাব দেখছি, কর্মসংস্থান নেই। ১০ বছরের মধ্যে এবার ব্যক্তি খাতে ঋণ প্রবাহ সবচেয়ে কম। তাহলে একটি মানুষের সুস্থতার যে লক্ষণগুলো, সে লক্ষণগুলো তো আমরা মেলাতে পারছি না। সে জন্য বলছি, আমাদের মতো ছোট ডাক্তার না দেখিয়ে বড় ডাক্তার দেখান। এখন বড় ডাক্তারের কাছে এ সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে যান, মানে আপনার স্বাস্থ্যের পরীক্ষার যেসব ফলাফল, সেগুলো আপনি অন্য কাউকে দেখান এবং জিজ্ঞাসা করেন, এগুলো সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। সে জন্য আমরা সিপিডি'র পক্ষ থেকে বলেছি যে মুক্ত আলোচনা দরকার: এসব তথ্য-উপাত্ত কীসের ভিত্তিতে আপনি দিচ্ছেন, কোন ধরণের জরিপের ভিত্তিতে, কোন বছর তা করা হয়েছে, কত মানুষের মধ্যে, এরপর আপনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এখন বলতে পারেন যে তথ্য অধিকার আইনের অধীনে আপনারা এগুলো চান না কেন? এটি চাওয়া যায়। কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে আশা করছি, সরকারের পক্ষ থেকে এটি করা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে এটি করার জন্য এখনই ভালো সময়। কারণ হলো প্রথমত, একজন মন্ত্রী মহোদয় এসেছেন। এটি নিঃসন্দেহে উনার মাথায় আছে যে কী ভিত্তিভূমির উপর দাড়িয়ে উনারা আগামী দিনের সরকার পরিচালনা করবেন। উনার জন্য যদি ভিত্তিভূমিটা কৃত্তিমভাবে উঁচু হয়, তাহলে তো উনার আরো উঁচু অবস্থানে যেতে হবে। সেটি বাস্তবসম্মত কিনা, তা উনাকে চিন্তা করে দেখতে হবে।

আরেকটি বিষয় হলো, আমাদের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আসছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কী কী ছিল এবং তার কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, হিসাব করে

আমরা দেখিয়েছি। একমাত্র প্রবৃদ্ধির হার ছাড়া, আর বোধহয় রেমিট্যান্স ছাড়া সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আর কোনো লক্ষ্যমাত্রাই পূরণ হয়নি, বিশেষ করে বৈদেশিক বিনিয়োগের কথা বলতে হয়। তাহলে আপনি চিন্তা করে দেখুন, যারা সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করেছিলেন, তারা কতটা অনুমানের ভিত্তিতে মডেলিং করেছিলেন, একটির সঙ্গে আরেকটির আন্তসম্পর্কের ভিত্তিতে এটি করেছিলেন তারা। অর্থাৎ ১০/১২ বিলিয়ন বৈদেশিক বিনিয়োগ হলে, ২ বিলিয়ন বৈদেশিক সাহায্য আসলে, ৪০ বিলিয়ন রেমিট্যান্স আসলে আর ওইদিকে যদি ৪০ বিলিয়ন রপ্তানি আয় আসে, তাহলে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। এগুলো কিছুই হলো না, কিন্তু ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়ে গেল। ফলে নতুন করে শুধু অর্থনীতির প্রয়োগ নয়, অর্থনীতির তত্ত্বকেও আমাদের ভালো করে চিন্তা করে দেখতে হবে। এটি হলো একটি দিক। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হচ্ছে না। ৮ শতাংশ না হলেও ৭ শতাংশ হয়তো হয়েছে। কিন্তু তাতেও বিশেষ রকমফের হচ্ছে না। লক্ষ করে দেখবেন, আগে যদি আমরা ১০০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি করতাম, তাহলে যে হারে দারিদ্র্য বিমোচন হতো, এখন তার চেয়ে কম হচ্ছে। তার মানে হলো, আয় দরিদ্র মানুষের পকেটে কম যাচ্ছে, বেশি যাচ্ছে অন্য কোথাও। আগে একক প্রবৃদ্ধি করলে যে পরিমাণ কর্মসংস্থান হতো, এখন সে পরিমাণ কর্মসংস্থান হচ্ছে, না বিশেষ করে শিক্ষিত যুবকের কর্মসংস্থান হচ্ছে না। তাহলে বুঝতে হবে, এমন ধারার প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, যেখানে মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় হচ্ছে না। আমরা এটিও দেখছি যে সামাজিক উন্নয়নে যেখানে বাংলাদেশের এত অগগ্রতি, যেটি প্রায় গত ১০/১২ বছরে হয়েছে, সেখানেও এক ধরনের স্থবিরতা দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, আমাদের শিক্ষা খাতের বাজেট জিডিপির ২ শতাংশ এবং স্বাস্থ্য খাতের বাজেট ১ শতাংশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। একটি আধুনিক দেশ, যারা নিজের খরচে এত বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যদিও ১০ টাকার প্রকল্প হাজার টাকায় হচ্ছে, সেটি আরেক বিষয়, সেখানে দেশের মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে এত স্বল্প বিনিয়োগ কেন হচ্ছে? ব্যাপারটি হলো, এই বরাদ্দ বাংলাদেশের গরিব ও গরিবতম মানুষের জন্য ব্যয় হওয়ার কথা। কারণ, সচ্ছল মধ্যবিত্ত বা শহুরে মধ্যবিত্তের ছেলে মেয়েরা সরকারি স্কুলে যায় না, সরকারি হাসপাতালেও যায় না। তাহলে সরকারি হাসপাতাল এবং সরকারি স্কুল যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তারা কিন্তু গুণগত শিক্ষা বা চিকিৎসা পাচ্ছে না। তারা কি পাচ্ছে? ওই যে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ১০০/২০০ টাকা করে যে ৪০/৫০ শতাংশ গরিব মানুষকে দেওয়া হয় সেটি। ফলে আমাদের গড় আয়ু বাড়ছে, বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু এখন ৭২ বছর এবং সেটি পৃথিবীর গড় আয়ুর সমান হয়ে গেছে বা তার চেয়েও বেশি, আমাদের তুলনীয় দেশের চেয়ে নিঃসন্দেহে বেশি। কিন্তু এই গড় আয়ু থেকে দূরে যে মানুষটা ছিল, সে আরো দূরে চলে গেছে কিনা, তা দেখার বিষয়। অর্থাৎ গড় আয়ু যে হারে বাড়ছে, এই নিচের দরিদ্রতম মানুষটার জীবনকাল ওই হারে বাড়ছে কিনা, তার

রোগ ব্যাধি ওই হারে কমছে কিনা, তার শ্রেণির মাতৃমৃত্যু হার সেই হারে কমছে কিনা। মাতৃমৃত্যু হার তাহলে উপর দিকে কমছে অনেক, কিন্তু নিচের দিকে সেই হারে কমছে কিনা। অর্থাৎ সমাজের মধ্যে একধরনের বিভাজন আমরা লক্ষ করছি। বাংলাদেশ এখন সবচেয়ে বেশি ধনী উৎপাদনের দেশ হিসেবে পৃথিবীতে পরিচিতি পেয়েছে। দ্রুততম ধনী সৃষ্টির জায়গা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে সে। এটি টাকাতে বা ডলারেও হতে পারে। আপনি দেখবেন, আয়ের এক ধরনের কেন্দ্রীভবন হচ্ছিল, এখন সম্পদেরও কেন্দ্রীভবন আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর ভোগের ক্ষেত্রে এই বিভাজনটা তুলনামূলকভাবে কম, কারণ হলো, সরকারের পক্ষ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন কর্মসূচি আছে, সেটির উপকার কিন্তু অনেক মানুষ পাচ্ছে।

আমরা একটি মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যদিও এখনো নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের কাতারেই আমরা আটকে আছি। মধ্যম আয়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যে কাঠামো থাকে, যে সামাজিক নিরাপত্তা থাকে, একটি মানুষ অসুস্থ হলে বা তার চিকিৎসা দরকার হলে, শিক্ষা দরকার হলে যে ধরনের নিরাপত্তাবোধ তার মধ্যে থাকা উচিত, এখানে তার অভাব আছে। প্রবীণ জনসংখ্যা বাড়ছে, এখন সেই প্রবীণ মানুষদের অসহায়ত্ব নিবারণ করার জন্য রাষ্ট্রের যে দায়িত্ব নেওয়ার কথা, সেগুলো আমাদের এখানে নেই। কিছু উন্নতি আমাদের নিঃসন্দেহে হচ্ছে, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওই উন্নতির পরিমাপে আমাদের কিছু সমস্যা আছে, উন্নতির সুফল বণ্টনেও সমস্যা আছে। এই উন্নতি ধরে রাখার যে প্রক্রিয়া, তাতে প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতিও আছে।

সরকারের উদ্যম ও উদ্যোগ

জিল্লুর রহমান: এই যে সংকট, এর মূল কারণগুলো কী বলে আপনি মনে করেন? আর যে কাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলো চলে, যেমন ধরেন পুঁজিবাজার ও ব্যাংকিং, এগুলো সম্পর্কে স্বয়ং অর্থমন্ত্রী বলছেন, এসব নাজুক বা নিয়ন্ত্রনের বাইরে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি বারবার বলছি, ২০০৯ সালে যখন এই সরকার প্রথম আসে, তখন প্রথম ২/৩ বছর আমরা অনেক উদ্যোগ দেখেছিলাম এবং আমাদের মতো একটি দেশে ঠিক মতো এগোতে গেলে সবচেয়ে বেশি যেটি দরকার, সেটি হলো প্রতিনিয়ত সংস্কার। এক জায়গায় থাকতে হলেও আপনাকে দৌড়াতে হয়। ওই যে আমি বলেছি উদ্যোগহীনতা ও উদ্যমহীনতা, এটি হলো সেই দৌড়, আমরা যা আর দেখছি না। সরকার যেহেতু সংস্কার করল না, সেহেতু রাজস্ব আদায় হলো না, রপ্তানিতে আমাদের যে ব্যয়, যেমন বন্দর ইত্যাদির ক্ষেত্রে, সেই ব্যয় আমরা কমাতে পারলাম না। সম্প্রতি সূচকের

কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সবচেয়ে বড় যেটি হয়েছে, আমি যেটি সব সময় বলি, সেটি হলো, মানুষের দেহে দু'টি ফুসফুস থাকে, অর্থনীতির দু'টি ফুসফুস হলো পুঁজিবাজার ও ব্যাংকিং খাত। একটি তাকে মূলধন দেয়, আরেকটি দেয় ঋণ। এই দু'টিরই এখন যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতিতে কোনোভাবেই ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ চাঙা করা সম্ভব নয়। এদিকে রাজস্ব আদায়ও হচ্ছে না। স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে না। এটি কেন হলো না? প্রথমত, আমার মনে হয়, এই যে অদক্ষতার পরিবেশ, সেই পরিস্থিতিতে যারা রাজস্ব দেন না, তারাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হন। রাজস্ব না দিয়ে সেই টাকা তারা বিদেশে পাচার করে, আবার যারা ব্যাংকের টাকা দেন না, তারা বিদেশে বাড়ি ঘর কেনেন, এখানে যারা পুঁজিবাজারে ফাটকাবাজি করে, তাদের শাস্তি হয় না। এই গোষ্ঠী সরকারের নীতি প্রণয়ন ব্যবস্থা অনেকটা জিম্মি করে ফেলেছে। এটি গোপন বিষয় নয়। এটির জন্য দুদকের দরকার হয় না, এটির জন্য প্রশাসনেরও দরকার পড়ে না, চোখের সামনে মানুষ এসব দেখেছে। সম্প্রতি ক্যাসিনো কাণ্ডের মধ্য দিয়ে তার কিছুটা ধরা পড়েছে। ইংরেজিতে এটিকে বলে টিপ অব দ্য আইসবার্গ, আইসবার্গ বা বরফ খণ্ডের মাথার কিছুটা ধরা গেছে, নিচটুকু আর ধরা পড়েনি।

অর্থাৎ একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর কাছে রাজনীতি, নীতি ও প্রশাসন জিম্মি হয়ে গেছে। আমি মনে করি না, রাজনৈতিকভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ এর মধ্যে সার্বভৌমভাবে কাজ করতে পারছেন। ইংরেজিতে যেটিকে সার্বভৌম কার্যকর বলে, মানে আপনি একজন নির্বাচিত ও রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধি হলে আপনাকে মুক্তভাবে জনগণের কথা বলা এবং প্রকাশ করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে। উনারা সেই পরিস্থিতির মধ্যে আর আছেন কিনা, তা দেখার বিষয়। এখন আপনি এরপরও প্রশ্ন করলেন যে এরকম কেন হলো? এর একটি বড় কারণ হলো, যে সমাজে প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি নেই, সেই সমাজে প্রতিযোগিতাপূর্ণ অর্থনীতি থাকতে পারে না। যে সমাজে প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি হয় না, সেই সমাজ মেধা উদ্যোগের ভিত্তিতে আধুনিকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। এটির অভাব বা শূন্যতার কারণে একসময় আমাদের অর্জনগুলো টেকসই হতে পারবে না। অর্থাৎ যেকোনো সময় এমন হতে পারে, আমরা আবারও সেই আগের জায়গায় ফেরত যেতে পারি। ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে যদি কখনো বিপর্যয় নেমে আসে, যদিও আমি এখানে আতঙ্ক তৈরি করতে চাচ্ছি না, কিন্তু ব্যাপারটি হলো, বিপর্যয় যদি ঘটে, তাহলে এটির অভিঘাত কার গায়ে লাগবে, সেটি বলাই বাহুল্য। আমি মনে করি, প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতির অভাবে জবাবদিহির যে জায়গাটা ছিল, সেটি দুর্বল হয়ে গেছে। আর সে কারণে জনপ্রতিনিধিদের যৌক্তিকভাবে যে কথাটা প্রশাসন বা অন্যের কাছে বলার কথা ছিল, সেটি উনারা বলতে পারছেন কিনা, তাও এখন সংশয়ের বিষয়।

প্রতিযোগিতাহীন রাজনীতি ও বিরোধী দলের দীনতা

জিল্লুর রহমান: এই যে নানা কিছুর অনুপস্থিতি, যেমন প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতির অনুপস্থিতির কথা আপনি বললেন, এই জায়গায় অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তি যারা ক্ষমতার বলয়ের বাইরে আছে, তারা নিজেদের সংযুক্ত করছে না কেন বা নাগরিক সমাজের ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ইংরেজিতে আরেকটি শব্দ আছে, *ডাবল জিওপার্ডি*, মানে দু'টি বিপদ যখন একসঙ্গে আসে। ক্ষমতার বাইরের যে রাজনৈতিক শক্তির কথা বলেন, তারাও যে খুব উপযুক্ত-দক্ষ, তা তো নয়। আপনি রাজনৈতিক ক্ষমতার বাইরে যদি থাকেন এবং যেহেতু রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা নেই, সেহেতু ওই প্রতিযোগিতায় আসার জন্য যে ধরনের প্রণোদনা তাদের দরকার, সেটি নেই। তারপরও তাদের যেটি বোঝার ব্যাপার সেটি হলো, এই পরিস্থিতিতে তারা কি ধরনের বিকল্প আমাদের সামনে হাজির করবেন, সেটি। এই যে ব্যাংকিং খাতে এত বড় সমস্যা, আপনি কী শুনেছেন বিরোধী দল – যে কোনো বিরোধী দলের আমি বলছি ডান, বাম, মধ্য যাই বলেন – রূপকল্প দিয়েছে। তারা কী বলছে, এভাবে আমরা ব্যাংকিং খাতকে দুর্নীতিমুক্ত করব। তারা কী দুর্নীতি বিমোচন করার জন্য বলেছেন যে, আগে আমাদের এই অপরাধ হয়েছে, এবার সেগুলো হবে না, এখন আমরা এভাবে দেশ চালাব। এই কথাটা তো কেউ বলছেন না। বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্র মানুষগুলো চরাঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল ও খরাপ্রবণ এলাকায় বসবাস করছে, তাদের জন্য আমার এসব চিন্তা হচ্ছে। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য এ হলো আমার *ব্লু প্রিন্ট*। এসব কথা যদি না বলতে পারেন, তাহলে কিন্তু তাদের উপর আস্থা আসে না। আরেকটি কথা হলো, এই সমস্যাটি শুধু উনাদের নয়, এটি জাতীয় সমস্যা। যে কোনো দেশে যদি একটি গঠনমূলক, প্রতিযোগিতাসক্ষম, সাংগঠনিকভাবে সবল ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের অধীনে বিরোধী দল না থাকে, তাহলে সরকারের পক্ষেও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। ওই যে বলছি রাজনৈতিক শূন্যতা, সেই রাজনৈতিক শূন্যতার অংশ তো উনারাও, তাই উনাদের এই সমস্যা জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এটি হলো *ডাবল জিওপার্ডি*। এক জায়গায় আমরা কেন্দ্রীভূত, আরেক জায়গায় আমি দেখছি, তাদের বিশেষ যোগ্যতা নেই।

জিল্লুর রহমান: এরকম পরিস্থিতিতে নাগরিক সমাজের ভূমিকাও খুব একটি দেখা যায় না। বুদ্ধিজীবী বলেন, গণমাধ্যম বলেন, তাদের ভূমিকা কী, অতি সাধারণ নাগরিকদেরও কণ্ঠস্বর নেই। বলা হয়, মানুষের আর আগের মতো যে কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ করা

বা রাজপথে নামার উৎসাহ নেই। দেখা যাচ্ছে, ডাকসুর ভিপি নুরু কয়দিন পর পর মার খাচ্ছেন, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন। আর কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ডাকসুর ভিপি নুরুকে অবশ্যই সাধুবাদ দিতে হবে, প্রশংসা করতে হবে। আমি তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। যাক, এখন তো এটি মৌলিক বিষয়। দেখুন, পুরো সমাজের মধ্যে প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ থাকবে না, প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা থাকবে না, কিন্তু নাগরিকেরা এর মধ্যেই বিরাট বীরত্ব দেখিয়ে ফেলবে, এটি আশা করা অন্যায়। এটি সামগ্রিক পরিস্থিতিরই একটি ভিন্ন প্রকাশ। যে সুবিধাভোগীদের কথা বললাম, সেই সুবিধাভোগীরা যেমন মিডিয়ায় থাকতে পারে, তেমনি নাগরিক সমাজেও থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত আছে ঝুঁকি। আমরা ষাট ও সত্তরের দশকে রাজনীতি করেছি, তখন বড়জোর আমাকে একটি লাঠির বাড়ি দিত, কিন্তু এখন তো চাপাতি দিয়ে কোপানো হয়। এখানে ঝুঁকির পরিমাণটা কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে। এখন মধ্যবিত্ত দেখবে, তার কী আছে, এবং সে এত বড় ঝুঁকি নেবে কিনা। আমি মনে করি, বাংলাদেশে যে মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটছে তা ইতিবাচক, গত ৫০ বছরের মধ্যে এটি ঘটেছে। কথা হচ্ছে, যে মধ্যবিত্ত স্বাধিকার আন্দোলন করেছে, বন্দুক নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছে, এমনকি যে স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, সেই মধ্যবিত্তের সঙ্গে এই মধ্যবিত্তের কিছুটা পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যেও একটি জাতিগত রূপ আছে, অর্থৎ এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের। অন্য দেশের এই বিকাশমান মধ্যবিত্ত দাবি করে, আমার ছেলে-মেয়েটা স্কুলে যাবে, কিন্তু শিক্ষকের মান ভালো না কেনো? সে সার্টিফিকেট পায়, কিন্তু ইন্টারভিউতে টেকে না কেন? এটি হলো একটি। অন্যদিকে সে বলবে, আমি সরকারি হাসপাতালে যেতে পারি না, কিন্তু আমি ১০ টাকা বেশি খরচ করতে রাজি আছি, তবুও আমি ভালো স্বাস্থ্য সেবা চাই। আমাকে কেন বার বার হয় রিকাশায় উঠতে হবে, না হয় এমন একটি বাসে যেতে হবে, যেখানে নারীরা উঠতে পারেন না, শিশুদের নিয়ে মায়েরা যেতে পারেন না – এ রকম গণ পরিবহন কেন থাকবে? আমার কেন একটি আধুনিক গণ পরিবহণ থাকবে না, যেটির খরচ দিতে আমি রাজি আছি। সে বলবে, কেন আমাকে দুর্নীতিতে ঢুকতে হবে, আমি কেন ঠিক মতো ট্যাক্স দিতে পারব না; কর দেওয়ার ক্ষেত্রে যেটুকু বলি, সেটুকু সদ্বিশ্বাসের সঙ্গে গৃহীত না হয়ে কেন হয়রানি করা হবে? অন্যান্য দেশে যে বিকাশমান মধ্যবিত্ত এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, সেসব দেশে পরিবর্তন দ্রুততর হয়েছে। যদি এই মধ্যবিত্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, সে যদি মনে করে আমি একা একা ভালো থাকব, আড়ালে-আবডালে নিরীহভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেব, তখন আর সে এই পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করেছি, দ্বন্দ্ব যখন বাড়তে থাকে, তখন এক সময় সামাজিক

আন্দোলন হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন তখন হয় না, রাজনৈতিক আন্দোলন তখন সামাজিক আন্দোলন দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। বাংলাদেশেও তার লক্ষণ আমরা দেখেছি। বাংলাদেশে গণজাগরণ মঞ্চ আমরা দেখেছি, যেখানে তারা সফলতা পেয়েছে, তাদের জন্য আমরা রাজাকারদের বিচার করতে পেরেছি। একইভাবে দেখেন, ছাত্ররা যে রাস্তায় নেমে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন করেছে, এর জন্য একটি আইন তো আমরা করতে পেরেছি। আর এই যে আপনি এখন ডাকসুর কথা বললেন, এ নিয়ে অনেক কিছুই হলো, কিন্তু তারপরও যে এখন ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে একটি সুস্থ ধারা আনা দরকার, সে ব্যাপারে চেতনা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। আমি কিন্তু ওরকমভাবে হতাশ নই। আমি মনে করি, ঝুঁকির জায়গাটা আছে, আবার সামাজিক আন্দোলনের জায়গাটিও দেখছি। সামাজিক আন্দোলনের চিন্তা-ভাবনা বড় পরিসরে আসছে। আমরা হয়তো কিছু রাজনৈতিক নীতিমালা বা গরিব মানুষের কাছে বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে যেতে চাচ্ছি। সবশেষে যেটি বলব, এটিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শেষ বিচারে রাজনৈতিক নেতৃত্ব লাগবে, এটিকে গঠনমূলকভাবে এগিয়ে নিতে হলে গণতান্ত্রিক প্রকাশ, প্রচার ও অনুশীলন লাগবে। সেই অনুশীলন ও প্রকাশের যথোপযুক্ত রূপ দেখছি না।

নতুন চ্যালেঞ্জ

জিল্লুর রহমান: ২০২০ সালে কী কী চ্যালেঞ্জ আপনি দেখছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ২০২০ সালে আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছর পালন করব। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীও দোরগোড়ায় চলে আসবে।

জিল্লুর রহমান: ৫০ বছর পালন তো আমরা ২০২১ সালে করব।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ২০২০ থেকেই প্রস্তুতি শুরু হবে। এর অনুভব চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ২০২০ সালের জন্য আমি আপনাকে তিনটি বিষয় বলব, যে তিনটি বিষয় দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম, অর্থনীতি অমসৃণ গতিতে এগোবে। অর্থনীতির অমসৃণ জায়গাগুলো প্রকাশ পাবে রাজস্ব আদায়ের মাত্রার উপর। কারণ, রাজস্ব যদি ঠিক মতো আদায় না হয় – এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি ভালো না – তাহলে সরকারের যে ব্যয় করার ক্ষমতা, সেটি অনেক কমে যাবে। কারণ, এখন পর্যন্ত সরকার কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যয় দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই জায়গাটা হলো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ অবশ্যই ব্যাংকিং খাত, এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বিনিয়োগ ইত্যাদি। ব্যাংকিং খাতে খুব মারাত্মক কিছু ঘটে কিনা, সেই দুশ্চিন্তা আমাদের থেকেই যাচ্ছে। কারণ, সরকার যেভাবে ব্যাংকিং

খাতের সঙ্গে আচরণ করছে, তাতে ব্যাংকিং খাতের সমস্যা আরো বাড়ছে। সুদের হার কমিয়ে এক অংকের ঘরে নিয়ে আসার চেষ্টা হচ্ছে, অথচ যিনি ন্যূনতম অর্থনীতি জানেন তিনিও বলবেন, এভাবে ব্যাংকিং খাতে সুদহার নির্ণয় করা যায় না, হুকুমের অর্থনীতি দিয়ে এটি করার চেষ্টা হচ্ছে। এটির একটি ব্যাকরণ আছে, অর্থনীতির একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। এটির সঙ্গে আবার মূল্যস্ফীতি জড়িত, যে লোকটা ব্যাংকে টাকা রাখছে, তাকে আপনি কী সুদ দেবেন, কারণ যদি ৬ শতাংশ মূল্যস্ফীতির হার হয়, তাহলে তাঁকে অন্তত ৮ শতাংশ দিতে হবে। এই মূহূর্তে ব্যাংকে টাকা রাখা মানে হলো, সঞ্চয়ী হিসাবে যে মূল্যমানে টাকা রেখেছিলেন, এখন তার চেয়ে কম পাবেন। বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার বাড়ছে না। যতটুকু বাড়ছে, সেটি রেমিট্যান্সের সূত্রে বাড়ছে।

অর্থনীতিতে একটি বড় বিষয় হলো রাজস্ব আদায় ও ব্যাংকিং খাত। পুঁজিবাজারও একটি বড় বিষয়, কিন্তু সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে রপ্তানি। ১০ বছরের মধ্যে এই প্রথম রপ্তানি টানা পাঁচ মাস ঋণাত্মক ধারায়। চীনের পরে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে দ্বিতীয় ছিল, কিন্তু এখন আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে যে, ভিয়েতনামও আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছে। অর্থনীতির মধ্যে এই জায়গাগুলো আমি দেখছি। এর বাইরে আমি দেখি রোহিঙ্গা সমস্যা। রোহিঙ্গা সমস্যা ওই বেড়া অর্থাৎ শিবিরের মধ্যে থাকবে কিনা, সেটি একটি বিষয়। আরেকটি ব্যাপার হলো, আমরা কবে তাদের পাঠিয়ে দেব। আর তারা যখন থাকবে, তখন কী কী সমস্যার মধ্যে থাকবে। পরিবেশগত বা সামাজিক সমস্যা তো আছেই, পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে একধরনের শান্তি, শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। তারা কিন্তু লাখ লাখ মানুষ জমায়েত করতে পারে। একটি জায়গায় যদি ১০ লাখ মানুষ একত্র হয়, তবে তার ফলাফল কী হবে। শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা থেকে শুরু করে ওই এলাকার স্থানীয় লোকজনের উপরে কী প্রভাব পড়বে, তা আমরা জানি। আমি মনে করি, রোহিঙ্গা সমস্যা নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে। আর যদি তৃতীয় কোনো কিছু আমার বলতে হয়, তাহলে সেটি হলো, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক।

ভারত-বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক

জিল্লুর রহমান: বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক খুব বড় ব্যাপার। ভারতে সম্প্রতি ৪/৫টি বড় ধরনের ঘটনা ঘটে গিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে বললে, মূল্যবোধের দিক থেকে এগুলো আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। তবে আমি এক দেশের নাগরিক হয়ে

অন্য দেশ নিয়ে মতামত দিতে চাচ্ছি না। কিন্তু আমি এটুকু বুঝেছি যে, সব ঘটনা আমার দেশের জন্য উপকারী নয়। একটি তো মন্দির নিয়ে রায় হয়েছে। সম্প্রতি যে তিনটি ঘটনা ঘটল তার একটি হলো, কাশ্মীরের স্বায়ত্বশাসন বিলোপ, আরেকটি হলো নাগরিক পঞ্জি, তৃতীয়টি হলো নাগরিকত্ব আইন। ভারতে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে, কিন্তু কথা হচ্ছে এর চেয়ে বড় ইংরেজিতে যাকে বলা হয় কাউন্টার প্রোডাক্টিভ কিছু হবে না? অর্থাৎ ব্যাপারটি উল্টো ফল দেবে। প্রথমত, নাগরিকত্ব ধর্মের ভিত্তিতে হওয়া উচিত নয়, এটি মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে হওয়া উচিত, এর জন্য আন্তর্জাতিক আইন আছে। কিন্তু বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুর জন্য ভারতে সম্প্রতি যে আইনগুলো হলো, এটি কোনোভাবেই উপকারী হয় নি বলে আমি মনে করি। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকেও এ কথা আমি বলেছি। সাম্প্রদায়িক সমস্যা আছে, কিন্তু তার সমাধান ভারতের নাগরিকত্ব নয়। এর সমাধান হতে হবে এভাবে: বাংলাদেশ যদি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়, প্রগতিশীল রাষ্ট্র হয়, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হয়, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার রাষ্ট্র হয়, তাহলে এর সমাধান হবে। আমি তিনটি বিষয়ের কথা আপনাকে বললাম। চতুর্থ বিষয়টি হলো, ২০২০ সালে বাংলাদেশের গণতন্ত্র আবার পরীক্ষার মুখে পড়বে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের চরিত্রের যে দিকটি বার বার পরীক্ষার মুখে পড়ছে তা হলো, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনা ও অনুশীলন। জানুয়ারি মাসে সিটি নির্বাচন হওয়ার কথা, তখন আবার নাগরিকেরা দেখতে চাইবেন যে, আসলেই এটি অবাধ ও অভূতপূর্ব হচ্ছে কিনা। অভূতপূর্ব মানে হলো, আগে আমরা দেখি নি এরকম নির্বাচন; অর্থাৎ আমি আগে দেখিনি, এমন একটি নির্বাচনের প্রত্যাশা করছি। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক চেতনার আরেকটি পরীক্ষা ২০২০ সালে হবে এবং এটি ধারাবিকভাবে চলতে থাকবে। অন্য সমাধানগুলো দ্রুত আসবে বলে আমার মনে হয় না।

জিল্লুর রহমান: বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে আপনি শুধু ভারতের কিছু বিষয় নিয়ে বললেন, যেগুলো ঠিক হয় নি সেগুলো বলেছেন; কিন্তু প্রশ্ন ছিল, আপনিও যেটি বলতে চেয়েছিলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ২০২০ সালে কেমন যাবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিঃসন্দেহে আমার সরকারকে একটু অস্বস্তির মধ্যে রেখেছে। আমরা দেখেছি, বেশ কিছু যোগাযোগ বন্ধ হয়েছে, মন্ত্রীরা যাওয়া বন্ধ করেছেন, বেশ কিছু কমিশন মিটিংও বন্ধ হয়েছে, জানি না কে বন্ধ করেছে, কিন্তু এটি হয়েছে। ভারত আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম আমদানির জায়গা, ভারতে এখন আমরা ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি করছি, দেশে ভারতের একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি হচ্ছে, আমরা ভারত থেকে বিদ্যুৎ কিনছি, ভারতের মালামাল আমাদের

উপর দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের বন্দর আন্তর্জাতিক বন্দর ঘোষণা করেছি, ভেতরের বিভিন্ন স্থলবন্দরসহ। এর বাইরেও ভারতের সাথে আমাদের প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য যোগাযোগ আছে। তাই চুপচাপ বেশি দিন বসে থাকা যাবে না। হয়তো ঠান্ডা করার জন্য সময় দেওয়া যায়, কিন্তু আপনাকে এক সময় না এক সময় ফিরতে হবে, নাগরিক পঞ্জি যতই তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলি না কেন, ভারতের লোকসভায় তো আমাদের নিয়ে আলোচনা হলো। সে ক্ষেত্রে আমাদের তো কিছু না কিছু বক্তব্য এ ব্যাপারে থাকতে পারে। ফলে সেটির প্রভাব আমাদের উপর পড়বে।আগামী দিনে আমাদের রাজনৈতিক বন্ধুত্ব, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রতিরক্ষার যে সম্পর্ক – এই দু'টি একে অপরের পরিপূরক – দেখতে হবে, সেখানে দূরত্ব সৃষ্টি হয় কিনা। এই দূরত্ব সৃষ্টি না করার জন্য যে রাজনৈতিক পুঁজি আমাদের সরকার ব্যবহার করবে, সেটি আবার নাগরিকেরা কীভাবে নেবে, সেটিও দেখার বিষয়। সরকার তো অনুভব করছে যে নাগরিকরা এ কারণে স্বস্তিতে নেই, তারা পারলে এর নিন্দা করে এবং সরকার এটি ঠিক রাখার জন্য আগামী দিনে তার রাজনৈতিক পুঁজি ও সম্পর্ক কীভাবে ও কতটা ব্যবহার করতে পারে, সেটিই দেখার বিষয়।

জিল্লুর রহমান: কিন্তু ভারতের সঙ্গে এই সম্পর্কের বাইরে বিকল্প বা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে চীন আসছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমরা জানি, এর বাইরে চীন আসছে। চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে আমরা আছি। ভারত মহাসাগরে চীনের সঙ্গে ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন প্রতিযোগিতা করছে। কিন্তু আমাদের তিনটি সম্পর্ককে একসঙ্গে নিয়ে চলতে হচ্ছে। একদিকে আছে রাজনৈতিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক, আরেকদিকে আছে নিরাপত্তার সম্পর্ক। নিরাপত্তার সম্পর্ক কিন্তু কম নয়, মানে যেটিকে আমরা সিকিউরিটি রিলেশনশিপ বলি। সেই সিকিউরিটি রিলেশনশিপ বৈশ্বিক কাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের উগ্রবাদী আক্রমণের মুখে, যেমন সম্প্রতি রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমাদের দেশের পরিস্থিতি ভালো নয়। এটি একটি বড় বিষয় হিসেবে আসছে। অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে বিদেশিদের বিভিন্ন প্রতিরক্ষামূলক কার্যক্রম চলছে। আমরা কীভাবে এই তিনটির মধ্যে ভারসাম্য রাখব, আমাদের মতো তুলনামূলকভাবে একটি দুর্বল দেশের জন্য এটি বড় বিষয়। এখন যদি যোগ্যতা আমাদের থাকে, তাহলে এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে আমরা বের হয়ে আসতে পারব, কিন্তু সেটি আমরা পারব কিনা, তা ভাববার বিষয়। কিন্তু ওই প্রতিযোগিতায় জয় পেতে হলে আমাদের সরকারকে নাগরিকের আস্থাভাজন হতে হবে। আমি যদি কোনো সরকারকে বলি, আপানার এই কথাগুলো আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ আমাদের মানুষ এগুলো গ্রহণ করবে না,

আর উনারা যদি আমাকে বলেন, মানুষ এটি গ্রহণ করবে কি করবে না আপনি কীভাবে জানলেন? আপনি কি আসলে একটি ভালো নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এসেছেন? আপনার কি এই জায়গাটায় শক্তি আছে? গণতন্ত্র আমাদের সরকারকে শক্তি দেয়। গণতন্ত্র তখন আমাদের প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতির মাধ্যমে কথা বলার শক্তি দেয়। আমি এখনো ভারত-পাকিস্তানের সেই আলোচনার কথা স্মরণ করি, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঠিক কে ছিলেন আমার মনে নেই, কিন্তু বিরোধী দলের নেতা ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা ছিল। বিরোধী দলের নেতাকে তখন ডেলিগেশন টিমের লিডার করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তো আমাদের একতাবদ্ধ থাকতে হবে, ঐক্য থাকতে হবে, এটি মৌলিক বিষয়। দেশের সার্বভৌমত্ব, স্বকীয়তা, দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ – এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ জন্য আমি আবার আপনাকে এই জায়গায় নিয়ে আসছি যে, রাজনৈতিক শূন্যতা যে শুধু অর্থনীতিতে সংস্কার করতে দেয় না তা নয়, এটি আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে, বিশ্বের পরাশক্তির সঙ্গে শক্তভাবে কথা বলার জায়গাও দুর্বল করে দেয়। ২০২০ সালে সবচেয়ে বেশি যেটি আমি দেখতে চাই তা হলো, রাষ্ট্রের নাগরিকের সঙ্গে সম্পর্কটা কী দাঁড়ায়। রাষ্ট্র নাগরিককে শিক্ষা দেবে, স্বাস্থ্য দেবে, নাগরিকের কর্মসংস্থান করবে, অনুকূল পরিবেশ দেবে। একই সঙ্গে আমাকে বিশ্বের বুকে স্বাধীনভাবে সম্মান নিয়ে বাঁচার সুযোগ করে দেবে, আমাকে কথা বলার সুযোগ দেবে, নিজের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত করার সুযোগ দেবে। রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক দিয়ে শেষ বিচারে আমরা মূল্যায়িত হব।

জিল্লুর রহমান: এরকম একটি পরিস্থিতিতে নতুন বছর শুরু করতে গিয়ে কী আশার কিছু নেই?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশই তো আশার জায়গা। কারণ, আমরা এই পর্যায়ে এসেছি অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে, সেটি তো অস্বীকার করা যাবে না। গত ১০ বছরে এই উন্নয়ন তরান্বিত হয়েছে, এটিও অস্বীকার করা যাবে না। বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে, এটিও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু কথা হলো, এই ভাবমূর্তি টিকিয়ে রাখতে হবে প্রকৃত অর্জন দিয়ে। অর্জনের বেলায় আমি শেষ বিচারে রাজনৈতিক বিদ্যায় আস্থা রাখতে চাইব, এটি তাদের উপলব্ধির ব্যাপার, দেশকে শাসন করার ক্ষেত্রে আপনার যে চিন্তা, দর্শন ও রূপকল্প, তাকে কার্যকর করতে হলে কী কী করতে হবে। উনারা তো দেখতে পাচ্ছেন, চারপাশে কি হচ্ছে। শাসক দল থেকে আরম্ভ করে বিরোধী দল, প্রশাসন থেকে স্থানীয় পর্যায়, সব ক্ষেত্রেই মহৌষধ হচ্ছে যোগ্যতা। আশা করি, সেটি নিয়ে তারা আমাদের সামনে আসবেন। ২০২০ সালে এই প্রত্যাশাই

আমি করি। আমি মনে করি, আমাদের দেশের বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ যারা আছেন, দেশের যারা নেতা নেত্রী আছেন, তারা তো আপনার আর আমার চেয়ে ভালো বুঝবেন। উনারা নিঃসন্দেহে এটি উপলব্ধি করেন। যদি বাধা থাকে, সেটি অতিক্রম তাদেরই করতে হবে, এর মধ্য দিয়েই নেতৃত্ব বিকশিত হয়। নেতা তো হলেন তিনি, যিনি ইতিহাসের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে মানুষকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যান, বঙ্গবন্ধু তো বঙ্গবন্ধু হয়েছেন সে কারণেই। ২০২০ সালে সেই নেতৃত্ব আমি প্রত্যাশা করি।

জিল্লুর রহমানঃ অনেক ধন্যবাদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। কথা বলছিলেন অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, মূল্যায়ন করছিলেন ২০১৯ সালের, ২০২০ সালে কী দেখতে চান, তাও বলছিলেন। তিনি বলেছেন, একধরনের সন্তুষ্টি হয়তো ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের আছে, কিন্তু অস্বস্তির মধ্যে বাংলাদেশের মানুষকে বসবাস করতে হচ্ছে। চারিদিকে অদক্ষতা ও অযোগ্যতার জয়-জয়কার। রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্কটা সেই অর্থে সুখকর নয়, দূরত্বটা অনেক বেশি। এই দূরত্ব রাষ্ট্রের কাটিয়ে উঠতে হবে। আর ২০২০ সালে যে চ্যালেঞ্জগুলো উনি সব চেয়ে বড় মনে করেন তা হচ্ছে, অর্থনীতির যে ভঙ্গুর অবস্থা, তাতে কি সে অমসৃণ পথেই হাঁটতে থাকবে, নাকি ঘুরে দাঁড়াবে; প্রতিনিয়ত যে সংস্কারগুলো করা দরকার এবং যা হয়ে উঠেনি, সেগুলো নীতিনির্ধারকেরা কীভাবে করবেন, সেটি দেখার বিষয়। রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান ২০২০ সালে কীভাবে হবে, তাদের ফেরত পাঠানো যাবে কিনা, সেটি নিয়ে এখন পর্যন্ত আশার আলো আমরা দেখিনি। এরা একটি সংকট তৈরি করতে পারে ঢালাওভাবে, সেই সংকট বাংলাদেশ কীভাবে মোকাবেলা করবে, তা দেখতে হবে।

তৃতীয় মাত্রা
চ্যানেল আই
২৬ *ডিসেম্বর* ২০১৯

তিনটি আশা করার সাহস পাচ্ছি না

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বিদায়ী ২০১৯-এর শুরুটা ভালো ছিল, শেষটা তেমন ভালো হলো না। শুরুতে ছিল অনেক প্রতিশ্রুতি, শেষটা ছিল অনেক ক্ষেত্রেই আশাভঙ্গের। কারণ, চাপের মুখে আছে অর্থনীতি। অর্থনীতির সঙ্গে যাঁরা নানাভাবে সম্পর্কিত, তারা কীভাবে দেখছেন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে। কেমন গেল বিদায়ী বছরটি। অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো কী কী? তাহলে নতুন বছরে যাচ্ছি কী নিয়ে, প্রত্যাশাগুলো কী? ঠিক এই প্রশ্নগুলোই রাখা হয়েছিল দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী নেতা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের কাছে। তারা অর্থনীতির মূল্যায়ন যেমন করেছেন, তেমনি বলেছেন কী তারা চান, কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে অর্থনীতি।

কেমন গেল

এই বছরে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। আমরা অনেকেই আশা করেছিলাম, এই সরকার নতুন উৎসাহ ও নতুন উদ্দীপনা নিয়ে এমন কিছু পদক্ষেপ নেবে বা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করবে, যাতে ব্যক্তি খাতে নতুন বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হবে; কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তা ঘটেনি। শুধু তা-ই নয়, ব্যক্তি উদ্যোগে মূলধন জোগায় যে পুঁজিবাজার এবং ঋণ জোগায় যে ব্যাংকিং খাত, সেই দুই জায়গাতেই এ বছর বড় ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। নতুন সরকার যে ব্যবস্থা নিল, তাতে এর কাঠামোগত সমস্যা আরো গভীর হলো। একদিকে স্মরণাতীতকালের মধ্যে পুঁজিবাজারের সূচক সবচেয়ে নিচে নেমে গেল, অন্যদিকে ব্যাংকের সুদহার কমানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর মন্দ ঋণ আরো বেড়ে গেল।

বছরের শেষ নাগাদ আমরা দেখছি, সংস্কারের সমস্যা তো রয়েই গেল, উপরন্তু সংস্কারের অভাবের কারণে আরো সমস্যা সৃষ্টি হলো। এখন আর ব্যাংক, পুঁজিবাজার বা বিনিয়োগই সমস্যা নয়, রাজস্ব আদায়ের দুর্বলতা ও রপ্তানি কমে যাওয়াও সমস্যা হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। সম্প্রতি ১০ বছরের মধ্যে রপ্তানি আয় এই প্রথম নেতিবাচক হয়ে গেছে। কৃষকও ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে পুঁজি পাচার আরো বেগবান হয়েছে। একমাত্র আশার আলো হচ্ছে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়। যদিও আমরা জানি, এটি বৈশ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত, তাই মধ্য মেয়াদে এর উপর আস্থা রাখা কঠিন।

এই অবস্থায় বলা যায়, বাংলাদেশ খুব শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ২০১৯ সাল শেষ করছে না। বছরটি শুরু হয়েছিল যেভাবে, শেষ হচ্ছে তারচেয়ে দুর্বলভাবে। তাই সামগ্রিকভাবে আগামী বছর অর্থনীতির পথটা অমসৃণ হবে বলেই মনে হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ

২০২০ সালের প্রধান চ্যালেঞ্জই হলো রাজস্ব আদায়। রাজস্ব আদায় না হলে এ-সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা অর্থনীতিকে আক্রান্ত করবে। অর্থাৎ, রাজস্ব আদায় না হলে সরকার কোথা থেকে ব্যয় করবে, সেই ব্যয়ের গুণগত মান, সেই ব্যয় নির্বাহ করতে ঋণ নেওয়া, এর ফলে টাকার মূল্যমান কী হবে, সুদের হার কী হবে, মূল্যস্ফীতি কেমন হবে এ রকম হাজারো সমস্যা রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হলো, রপ্তানির নেতিবাচক ধারা ঘোরানো না গেলে এর প্রভাব কেবল অর্থনীতির মধ্যে সীমিত থাকবে না। বড় বড় কিছু কলকারখানা যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং হাজার হাজার শ্রমিক মাঠে নামেন, তাহলে দেশের কী পরিস্থিতি হবে, তা বলাই বাহুল্য। এই রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে আরো অনেক বিষয় জড়িত। যেমন টাকার মূল্যমান কী হবে।

অন্যদিকে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার সক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কমে যাচ্ছে কিনা, তা-ও আরেক উদ্বেগের বিষয়। আবার সরকার বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারে সামঞ্জস্য না এনে প্রবাসী আয়ে ২ টাকা করে প্রণোদনা দেওয়ার প্রাগৈতিহাসিক ব্যবস্থা নিয়েছে। এটি পশ্চাৎমুখী ব্যবস্থা এবং এতে অপচয় হয়। এর সঙ্গে আবার রেমিট্যান্স, বৈদেশিক বিনিয়োগ, পুঁজিবাজারে বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্পর্ক আছে। তাই বৈদেশিক খাতকে কেন্দ্র করে সমস্যা হতে পারে।

তৃতীয় চ্যালেঞ্জটি হলো, বড় বড় প্রকল্পগুলো স্থিতিশীলতা ও পরিপূর্ণতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা। দেশের বর্তমান উন্নয়নের ধারা অতিমাত্রায় ভৌত অবকাঠামোভিত্তিক। ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানো যায়নি। মধ্যম আয়ের দেশের জন্য যে পরিপূরক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠার কথা ছিল, তা হয়ে উঠেনি। অন্যদিকে, অবকাঠামোর ব্যয় যে হারে বেড়েছে, তাতে সরকারের দায়দেনা পরিস্থিতির কিঞ্চিৎ অবনতি হয়েছে। আরো কিছু স্বল্পমেয়াদি বৈদেশিক ঋণ নেওয়ার কারণেও পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে।

তিন প্রত্যাশা

অন্যদিকে, তিনটি প্রত্যাশা করার সাহস নেই। আশা একটিই। ব্যাপারটি হলো, দেশের অগ্রসরমাণ অর্থনীতির শ্লথ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতি শ্লথ হয়ে গেছে। ভারতেও সেই ধারা দেখা যাচ্ছে। সমস্যাটি কাঠামোগত। সংস্কারের অভাবের কারণে যারা সবচেয়ে লাভবান হচ্ছে, যারা কর ফাঁকি দিয়ে, টাকা পাচার করে, ঋণ ফেরত না দিয়ে লাভবান হচ্ছে, পুঁজিবাজারে ফাটকাবাজি করে লাভবান হচ্ছে, এদের হাত থেকে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া মুক্ত করতে হবে।

আমি প্রত্যাশা করি, ২০২০ সালে এই কাজ করার মতো রাজনৈতিক শক্তি, দৃঢ়তা ও প্রজ্ঞা দেখতে পাব। নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন যে একটি শ্রেণির হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে, তা থেকে বেরোনো না গেলে নির্বাচনী ইশতেহার যেমন বাস্তবায়ন করা যাবে না, তেমনি প্রবৃদ্ধির ধারা টেকসই করা যাবে না। পিছিয়ে পড়া মানুষকে সামনে নিয়ে আসতে এর বিকল্প নেই।

৩০ ডিসেম্বর ২০১৯
প্রথম আলো

অধ্যায় ৩

ব্যাংকিং ও বাণিজ্য

পাটশিল্পের পরিত্রাণ কোন পথে

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী একটি প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। সেটি হলো পাট ও পাটজাত পণ্যের বাজার বাড়ছে না, বরং সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত পণ্যের বৈশ্বিক বাজার বাড়ছে না, এক জায়গায় স্থবির হয়ে আছে। পাটের সুতা অর্থাৎ ইয়ার্নের ফেয়ার ২০১০ সালে ছিলো ২৭০ মিলিয়ন ডলার। ২০১৬ সালে তা হয়েছে ২২৪ ডলার। এই সময়ের মধ্যে তা ২.৯ শতাংশ কমে গেছে। আর হেসিয়ানের বাজার বেড়েছে ০.৬ শতাংশ। সিঙ্গেল ইয়ার্নের বাজার কিছুটা ভালো। সেটি বেড়েছে ৬.৭ শতাংশ। পাটের অন্য পণ্যগুলোর বাজার নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির মধ্যে আছে। অর্থাৎ পাটের বাজার তেমন একটি বাড়ছে না। বাড়লেও শ্লথগতিতে বাড়ছে। তাই পাট ও পাটজাত পণ্যের বাজার হয় শ্লথগতিতে বাড়ছে না হলে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির মধ্যে রয়েছে।

সেদিক থেকে বাংলাদেশের বাজারের অবস্থাও আশাব্যঞ্জক নয়। রপ্তানির বাজারে ইয়ার্নের ক্ষেত্রে এবং ফেব্রিক্সের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি কিছুটা বাড়ছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি তেমন বাড়ছে না বা সীমিত আকারে বাড়ছে। বাংলাদেশ যেহেতু পাটের প্রধান রপ্তানিকারক দেশ এবং বৈশ্বিক পরিসরে পাটের চাহিদা কমে যাওয়ায় বাংলাদেশে পাটের বাজারে তেমন একটি প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এর পেছনে নানা কারণ রয়েছে। এসব কারণকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। ১. বহিঃস্থ কারণ ২. অভ্যন্তরীণ কারণ। বহিঃস্থ বা বৈশ্বিক পরিসরে পাটের প্রবৃদ্ধি তেমন একটি বাড়ছে না।

প্রথমত, বিশ্বব্যাপী পাটের চাহিদা তেমন একটি বাড়ছে না। কোনো একটি কারণে পাটপণ্যের চাহিদা বাড়ছে না। তাই পাটের বাজারে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে না। আমাদের উপর তার একটি চাপ পড়ছে।

দ্বিতীয় কারণ হলো, পণ্য হিসেবে দুর্বল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া। অর্থাৎ পণ্য হিসেবে পাট তার বিকল্প যেসব পণ্য আছে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। আমরা ১৯৯৫ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত একটি পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে দেখিয়েছি যে ৭০ শতাশ জায়গায় পলিথিন বা পলি প্রোফাইলিং পণ্য ব্যবহৃত হচ্ছে। বাকি ৩০ শতাংশ জায়গায় পাটপণ্যের ব্যবহার হয়। পলি প্রোফাইলিং বা পলিথিন তৈরি করতে পেট্রোলিয়ামের প্রয়োজন হয়। এখন যেহেতু বৈশ্বিক পরিসরে পেট্রোলিয়ামের দাম কম, তাই পলিথিন সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এ কারণে সবাই এখন পলিথিনই ব্যবহার করছে। পাটপণ্যের বিকল্প যেসব পণ্য রয়েছে, সেগুলো পাটপণ্য থেকে ভালো করছে। পাটপণ্যের জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তৃতীয় কারণ হলো, ভারতের বাজার। আমাদের পাটের সবচেয়ে বড় বাজার ভারত। কিন্তু ভারতে আমাদের পাটপণ্যের উপর অ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করা হয়েছে। এটি ১৯ ডলার থেকে ৩৫১ ডলার পর্যন্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পাটের ইয়ার্ন, হেসিয়ান বা পাটের ফেব্রিক করা ব্যাগের উপর অ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করা হয়েছে। যখন উৎপাদন মূল্যের চেয়ে অন্য দামে পণ্য রপ্তানি করা হয়, তখন অ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি বসে। বাংলাদেশের মিলগুলোতে যে মূল্যে পাটপণ্য উৎপাদন করা হয়, তার চেয়ে অন্য দামে পণ্য রপ্তানি করে। ভারত এই অভিযোগে বাংলাদেশের পাটপণ্যের উপর অ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করেছে। বাংলাদেশ এই সমস্যার সমাধান রাজনৈতিকভাবে করতে চেয়েছিল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে এই সমস্যার ব্যাপারে যৌথ বিবৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। তাই রাজনৈতিকভাবে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা সফল হয়নি। এই তিনটি কারণই হলো আমাদের পাটপণ্যের রপ্তানির বাজার সংকুচিত হওয়ার বড় বহিঃস্থ কারণ। এই কারণগুলো থেকে সহজেই বেরিয়ে আসা যাবে বা এগুলোর সমাধান সহজেই করা যাবে ব্যাপারটি এমন নয়। এটি আমাদের জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ।

এবার অভ্যন্তরীণ কারণগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করা যায়। প্রথম কারণ হলো, বিজেএমসির দুর্বল কার্যক্রম। একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান যেভাবে কার্যক্রম করা পরিচালনা করা উচিত বিজেএমসি তা করছে না। একটি ভালো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লক্ষণ হলো তা কেমন রেট অব প্রফিট রিটার্ন পাচ্ছে। কিন্তু বিজেএমসির রেট অব প্রফিট বর্তমানে নেতিবাচক। আমরা ২০১২ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই প্রফিটের হার গবেষণা করে দেখেছি তা সব সময়ই নেতিবাচক। এই নেতিবাচকতার হার কখনো কমলেও তা বেড়েছে অনেকবার। সর্বশেষ তাদের নেগেটিভ প্রফিট হচ্ছে ৪৮৯ কোটি টাকা। এই তথ্যও পূর্ণাঙ্গ কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কেননা বিজেএমসির বিভিন্ন দায় রয়েছে,

সরকার অনেক ঋণ পায়, শ্রমিক-কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি রয়েছে, অনেক ধরনের বকেয়া রয়েছে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত শ্রমিক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনাদায়ী রয়েছে ৪২৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে রয়েছে তাদের অবসরকালীন ভাতা, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি। আবার যারা বিজেএমসির কাঁচা পাট সরবরাহকারী, তাদেরও প্রচুর অনাদায়ী রয়েছে। এ ছাড়া আরো অনেক পর্যায়ে অনাদায়ী রয়েছে। তাই প্রতিষ্ঠানটির অ্যাকাউন্টের প্রকৃত কি অবস্থা, তা নিরপেক্ষ অডিট ছাড়া প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রতিষ্ঠানটির এই দুর্বল কার্যক্রম দিয়ে আসলে পাটশিল্পের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো যাবে না। বৈশ্বিক বাজারের এই অবস্থায় বিজেএমসির মতো দুর্বল প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখা খুবই দুষ্কর। শুধু সরকার ঋণ দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তাই এখন প্রতিষ্ঠানটির বকেয়া মেটানো এবং শ্রমিক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনাদায়ী পরিশোধ করার মতো পদক্ষেপ নিয়ে কীভাবে বিজেএমসিকে সচল করা যায় সেটি সরকারের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ হলো, মার্কেট ডিস্টরটিং অ্যাক্টিভিটিস। এটি বলতে বোঝায় যে আপনি যে কোনো দামে বাজারে পণ্য বিক্রি করতে পারেন না। তার একটি নিয়ম আছে। বিজেএমসি যে দামে পণ্য উৎপাদন করছে আর যে দামে পণ্য বিক্রি করছে, তার মধ্যে কিছু সমস্যা রয়েছে। অর্থাৎ এখানে ডাম্পিংয়ের ইঙ্গিত আছে। তাই বিজেএমসি যে মূল্যে উৎপাদন করছে, তার চেয়ে ভিন্ন কোনো দামে পণ্য রপ্তানি করতে পারবে না। তখন পাটের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য পণ্যগুলো এর চেয়ে কম দামে পাওয়া যাবে। প্লাস্টিক বা সুতার পণ্য এর চেয়ে অনেক কম দামে পাওয়া যাবে। আবার পাটের যে উৎপাদন ব্যয়, তাতে এই মার্কেট ডিস্টরশন রোধ করা খুবই কঠিন। তৃতীয় সমস্যা হলো চাহিদা। অভ্যন্তরীণ বাজারে যে চাহিদা রয়েছে, তা সরবরাহ করার মতো সক্ষমতা বেসরকারি মিলগুলোর নেই। এখন ডিস্টরশনের অভিযোগে যদি বিজেএমসিকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে আবার বেসরকারি মিলগুলোর চাহিদা মেটানোর সক্ষমতা নেই।

উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য পাটশিল্প প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। এগুলো থেকে পরিত্রাণের জন্য কিছু সমাধান রয়েছে। প্রথমত, বিজেএমসির যে লুম আছে তা কমিয়ে আনতে হবে। প্রতিষ্ঠানটির ৫৭ শতাংশ লুম শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য রাখা যেতে পারে। বাকি জায়গায় বেসরকারি জুট মিল বা অন্য ধরনের কারখানা করা যেতে পারে। ছোট ধরনের বিশেষ অর্থনৈতিক জোন করা যেতে পারে। কিন্তু সেগুলোকে বিজেএমসির আওতায় রাখা যাবে না। প্রকৃত অর্থে বিজেএমসিকে বন্ধ করার সময় এসে গেছে। যখন বিজেএমসি ইস্ট পাকিস্তান জুট মিলস করপোরেশন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তার একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিলো। কেননা ১৯৬০, '৭০, '৮০-এর দশকে

বাংলাদেশে তেমন উদ্যোক্তা শ্রেণি ছিল না। বেসরকারিভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল না। এখন দেশে বেসরকারি খাতে প্রচুর উদ্যোক্তা এসেছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তাই করপোরেশন, বিশেষ করে বিজেএমসির মতো করপোরেশন টিকিয়ে রাখার আর প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ধ করে বেসরকারি শিল্পভিত্তিক পাটকল গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বিজেএমসির প্রাইসিং পলিসি ঠিক করতে হবে। প্রতিষ্ঠানটি যেভাবে প্রাইসিংয়ে ডিস্টরশন করছে, তাতে ভারতের মতো বাজার পাটশিল্প হারাবে। আর এই ডিস্টরশন শুধু সরকারি মিলগুলোকে আক্রান্ত করছে না, বেসরকারি মিলগুলোকেও আক্রান্ত করছে। তাই এই প্রাইসিং ডিস্টরশন ঠিক করতে হবে।

তৃতীয়ত, বিজেএমসিতে উচ্চ পদগুলোতে কেউই দীর্ঘমেয়াদে থাকছেন না। আমি একটি হিসাব দিতে পারবো যেখানে দেখা যাবে প্রতিষ্ঠানটির উচ্চ পদে কেউই দীর্ঘ মেয়াদে থাকতে পারছেন না। গত ১০ বছরে চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, প্রোডাকশন ডিরেক্টর, ডিরেক্টর অব রিসার্চ এবং ডিরেক্টর অব ফাইন্যান্স – এই ছয়টি পদে কেউই গড়ে সাড়ে সাত মাস থেকে সর্বোচ্চ ১৫ মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিলেন না। ফলে তারা কেউই তাদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে পারেননি, এই স্বল্প সময়ে দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পাননি। কেউই দীর্ঘমেয়াদে পরিকল্পনা নিতে পারেননি। এটি প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে এক ধরনের বড় প্রতিবন্ধকতা। এর গভর্নেন্স স্ট্রাকচার থেকে সহজে বের হওয়া সম্ভব নয়। কেননা এখানে যারা আসেন, তারাও খুব দীর্ঘমেয়াদে থাকতে চান না। এই দুর্বলতা থেকে বেরিয়ে আসা জরুরি হলেও তা খুবই কঠিন।

চতুর্থত, ভারতে বাংলাদেশের পাটজাত পণ্যের ক্ষেত্রে যে অ্যান্টি ডাম্পিং রয়েছে তা প্রত্যাহার করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া। এ জন্য যে উৎপাদন মূল্যে বিজেএমসি পণ্য তৈরি করছে, তার চেয়ে কম দামে পণ্য বিক্রি করা। এখন প্রতিষ্ঠানটি যে কাঠামোর মধ্যে আছে, তার মধ্যে একে ঠিক করা খুবই কঠিন। একে প্রতিযোগিতামূলক করা, রপ্তানির বাজারে প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা অর্জন করা, এককথায়, প্রায় অসম্ভব। তাই এখন বিবেচনা করতে হবে কীভাবে একে কোন কাঠামোয় ঠিক করা যাবে।

পাট ও পাটশিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু অল্প সংখ্যক দেশ এই পাট রপ্তানি করে এবং বাংলাদেশ যেহেতু সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারক দেশ, তাই এই শিল্পের দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। রপ্তানির বাজার যেহেতু সীমিত, তাই দেশে ক্যাপটিভ মার্কেট

তৈরি করতে হবে। এ জন্য সরকারকে পণ্য মোড়ক আইনকে কার্যকর করতে হবে। এখন দেশে যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদন হচ্ছে তাতে যদি এই আইন কার্যকর করা যায় তাহলে পাটশিল্পের আশি ভাগ বাজার এখানেই তৈরি করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, জেলা শহরে যেসব সড়ক আছে, তার বিটুমিনের উপর পাটের তৈরি চট ব্যবহার করা। এই সংক্রান্ত ধারা তৈরি করতে হবে। তৃতীয়ত, পাটপণ্যের বহুমূখী ব্যবহার তৈরি করতে হবে। নিত্যনতুন পণ্য যাতে এই খাত থেকে তৈরি হয়, সে জন্য গবেষণা প্রয়োজন। চতুর্থত, পাট খাতকে ছোট আকারের শিল্প হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এই খাতকে বড় শিল্প হিসেবে বিবেচনা করার অবকাশ নেই। কেননা এই খাত থেকে বড় ধরনের প্রফিট আনা এখন কষ্টকর। তাই করপোরেশনগুলোকে সীমিত করে বেসরকারি খাতের দিকে পাটশিল্পকে নিয়ে যাওয়াই হবে সঠিক উদ্যোগ। এ জন্য করপোরেশনগুলোর জমিগুলোকে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি বা বেপজার সঙ্গে কথা বলে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। মোট কথা, পাটশিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা ও চাহিদা রয়েছে। একে আগামীতে ছোট আকারের বেসরকারি খাতের শিল্প হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

৯ এপ্রিল ২০১৯
দেশ রুপান্তর

সুদের উচ্চ হার কি জনস্বার্থে?

ফাহমিদা খাতুন ও সৈয়দ ইউসুফ সাদাত

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের দৃষ্টিকোণ থেকে সুদের হার একটি বহুল আলোচিত ব্যাপার। যদিও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়ে একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে, কিন্তু বেসরকারি বিনিয়োগ এখনো মোট দেশজ উৎপাদনের মাত্র ২৩ শতাংশের মধ্যেই আটকে আছে। একটি অগ্রসরমান দেশের জন্য এতো অল্প বিনিয়োগ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে না। ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তারা সুদের উচ্চ হারকে বিনিয়োগের জন্য বাধা হিসেবে দেখছেন। নব্যধ্রুপদী তত্ত্ব অনুযায়ী বিনিয়োগ আর সুদের হারের সম্পর্ক নেতিবাচক। অর্থাৎ সুদের হার বৃদ্ধির ফলে মূলধনের ব্যয় বেড়ে যায়। এর ফলে ব্যবসা ব্যয়বহুল হয়ে যায়। এটি বিনিয়োগের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে বাস্তবে এরকম সরল রৈখিক সম্পর্ক দেখা যায় না।

বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ ও আমানতের সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে। তফসিলী ব্যাংকগুলেতে ঋণ ও আমানতের সুদের হারের মধ্যে ফারাক ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে ৪.৪১ শতাংশ ছিলো। এটি ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে দাঁড়িয়েছে ৪.১৫ শতাংশ। ২০১৪ সালের জুন থেকে এই নিম্নমুখী প্রবণতা বিরাজ করছে। তবে অনেক ব্যাংক তাদের গড় সুদের হারের এই ফারাকটি ৬ শতাংশের উপরে রাখছে, যেহেতু নিয়ম-কানুন কিংবা আর্থিক নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালন করা হয় না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাসের জন্য আর্থিক নীতি পরিকল্পনায় যে সুদের হার নির্ধারণ করে দিয়েছিল তা কেউ মানছে না। বরং ব্যাংকগুলো নিজেরাই নিজেদের সুদের হার নির্ধারণ করছে। দেখা যাচ্ছে কিছু ব্যাংক তাদের নিজস্ব ব্যবসায়িক

স্বার্থের কথা ভেবে ঋণের সুদের হার নির্ধারণ করছে। বেশি মুনাফার জন্য ঋণের হার বাড়িয়ে রাখা হচ্ছে। তবে মুদ্রাস্ফীতির চাপের কারণেও ঋণের সুদের হার বেশি রাখতে হচ্ছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ খেলাপির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণেও ব্যাংকগুলোতে ঝুঁকি বাড়ছে। সেটি পুষিয়ে নিতেও অনেক সময় সুদের হার বাড়িয়ে রাখছে। ২০১০ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত নয় বছরের মধ্যে আট বছরে যে পরিমাণ খেলাপি ঋণ ছিলো তা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতের জন্য জাতীয় বাজেটে যে বরাদ্দ ছিলো তার সমপরিমাণ।

প্রচলিত অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী অধিক ঝুঁকি নেওয়া হয় অধিক মুনাফার জন্য। সেই অনুযায়ী, ব্যাংকের বেলায় ঝুঁকিপূর্ণ ঋণের সুদের হার ভালো ধরনের সুদের হারের চেয়ে বেশি হতে হবে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে এর বিপরীতটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খাতওয়ারী সুদের হার এবং খেলাপি ঋণের অবস্থা খতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, ২০১৭ সালে সাধারণ গ্রাহকদের জন্য যে ঋণ দেওয়া হয়েছিলো সেখানে গড় সুদের হার ছিলো ১১ শতাংশ। অথচ সাধারণ গ্রাহকদের গড় খেলাপি ঋণের হার ব্যাংকগুলোর মোট ঋণের মাত্র ৪ শতাংশ ছিলো। অন্যদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের হার ছিলো ১১ শতাংশের বেশি তা সত্ত্বেও ব্যবসা ও বাণিজ্যের জন্য যে ঋণ দেওয়া হয়েছিল তার সুদের হার ছিলো গড়ে ১০ শতাংশ। এভাবে ভালো ঋণগ্রহীতাদের অধিক সুদের হার চাপিয়ে দিয়ে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আর খারাপ ঋণগ্রহীতাদের কম সুদের হারে ঋণ দিয়ে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। এটি আসলে একটি বিকৃত বাজারের প্রতিচ্ছবি, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর এদিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরী।

আরেকটি আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, আমানতের উপর প্রকৃত সুদের হার। মুদ্রাস্ফীতির হার বিবেচনা করলে তফসিলী ব্যাংকগুলোতে প্রকৃত আমানতের হার ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে শূন্যের নিচে চলে গেছে। তাই সাধারণ মানুষ কেন ব্যাংকে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ জমা রেখে তার মূল্য হারাবে? অন্যদিকে, বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্রে প্রকৃত সুদের হার ছিলো প্রায় ৬ শতাংশ। তাই তারা জাতীয় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করতেই বেশি আগ্রহী।

আমাদের দেশে যথেষ্ট সামাজিক সুরক্ষার অভাবে সঞ্চয়পত্রই এখন সাধারণ এবং সীমিত আয়ের মানুষের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। সঞ্চয়পত্রে উচ্চ সুদের হারের অর্থ হলো বাজেট প্রণয়ন করতে সরকারকে জনগণের কাছ থেকে ব্যয়বহুল ঋণ গ্রহণ করতে হচ্ছে। জনসাধারণের সঞ্চয় যদি সরকারের কাছে যায় তাহলে ব্যাংকগুলো আমানত থেকে বঞ্চিত হবে এবং আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যাংকগুলোর ভূমিকাও গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। সঞ্চয়পত্রের উপর বেশি নির্ভরতা

অর্থনীতিতে ব্যয়বহুল ঋণের বোঝা তৈরি করে। কেননা সরকারকে উচ্চ সুদে জনগণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

সুদের হারের প্রভাব সঞ্চয়কারীদের আচরণে কিছুটা বোঝা যায় তবে বিনিয়োগের আচরণের উপর সুদের হারের প্রভাব বোঝা সহজ নয়। বাংলাদেশে সুদের হার এবং বিনিয়োগের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, ঋণের প্রকৃত সুদের হার এবং বিনিয়োগের মধ্যে একটি দুর্বল নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, সুদের উচ্চ হার বিনিয়োগকে তেমন প্রভাবিত করতে পারে না। গবেষণার এই ফলাফল বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি বিশ্ব ব্যাংকের 'ডুয়িং বিজন্যাস' প্রতিবেদনের সাথেও সংগতিপূর্ণ যেখানে বরাবর উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য অন্যান্য অনেক বিষয় যেমন সম্পত্তি নিবন্ধনকরণ এবং বিদ্যুতের প্রাপ্যতা, ঋণ পাওয়ার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'বাংলাদেশ বিজনেস এনভায়রনমেন্ট স্টাডি-২০১৮' তেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য অর্থ প্রাপ্তির চেয়ে অন্যান্য জটিলতা যেমন দুর্নীতি, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং অদক্ষ আমলাতন্ত্রের মতো বিষয়গুলো সমাধান করা বেশি জরুরি।

ব্যাংকিং খাতের বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে ঋণ ও আমানতের মধ্যে সুদের হারের ব্যবধান উল্লেখযোগ্য। ব্যাংকিং খাতকে চাঙ্গা করতে হলে এর সংস্কার প্রয়োজন। এটি কোনো সহজ কাজ নয়। কারণ দীর্ঘ সময় ধরে এই খাতটিতে সুশাসনের অভাব বিরাজ করছে। এখানে সুশাসন ফিরিয়ে আনতে হলে সরকারকে আপোসহীন মনোভাব নিয়ে খাতটির প্রতি নজর দিতে হবে।

[*অনূদিত*]

২৮ এপ্রিল ২০১৯
দ্য ডেইলি স্টার

ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা জরুরি

মোস্তাফিজুর রহমান

আর্থিক খাত একটি দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে, যার কারণে অনেক সময় এ খাতকে অর্থনীতির নার্ভ-সেন্টার বলা হয়। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে ব্যাংকিং খাতের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এসব দেশে আর্থিক খাত মূলত ব্যাংকনির্ভর। ব্যাংকিং খাতের দক্ষ ব্যবস্থাপনার উপর যেমন সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল, তেমনি নির্ভরশীল ব্যবসা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ভোগ ও বিভিন্নমুখী অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কর্মচাঞ্চল্য। নীতিনির্ধারকরা তাই সদা সতর্ক থাকেন, যাতে ব্যাংকিং খাত নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে, অর্থনীতিতে সঞ্চয় আহরণ ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে যথাযথ অবদান রাখতে সক্ষম হয় এবং এ খাতে যাতে শৃঙ্খলা ও সুশাসন বজায় থাকে। এ কথা স্মর্তব্য, বাংলাদেশের ধারাবাহিক উন্নয়নে দেশের ব্যাংকিং খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে; এ কথাটি সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু ব্যাংকিং খাতের প্রত্যাশিত ভূমিকা একটি দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন কোন পর্যায়ে আছে, তার সঙ্গে নিকটভাবে সম্পর্কিত। বাংলাদেশ এখন একটি দ্বৈত উত্তরণের পর্যায় অতিক্রম করছে। বাংলাদেশ মধ্য-আয়ের দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে; স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়েছে। এর সঙ্গে আরো যোগ করা যেতে পারে, বর্তমান সময় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের সময়। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে এবং এই ত্রিবিধ বিবেচনাকে সামনে রেখে ব্যাংকিং খাতকে আগামীর দায়িত্ব পালন করতে হবে। একটি দক্ষ ব্যাংকিং খাতের তাই প্রয়োজন বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য এবং এমন একটি জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়, যেখানে উন্নয়ন প্রক্রিয়া হবে জনকল্যাণমুখী এবং বণ্টন প্রক্রিয়া হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত কি এ দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত? বাংলাদেশের উন্নয়ন পথযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিলগ্নে ব্যাংকিং খাত বর্তমানে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, যেগুলো মোকাবেলা করতে না পারলে আগামীর যাত্রা ব্যাহত হবে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার উপর নেতিবাচক অভিঘাত বাংলাদেশের অর্জনকে হুমকির সম্মুখীন করবে।

সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ যে পর্যায়ে আছে, তা চিন্তাকে অতিক্রম করে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু পদক্ষেপ সর্বসাম্প্রতিককালে নেওয়া হচ্ছে – সংজ্ঞা পরিবর্তন করা হচ্ছে, ঋণের সুদ হার হ্রাসের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু মূল সময়গুলো অধরাই রয়ে যাচ্ছে। অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলো থেকে যাচ্ছে। কারণ প্রকৃত কার্যকারণ চিহ্নিত করা হচ্ছে না। করদাতাদের টাকা দিয়ে সরকারি ব্যাংকগুলোর পুনঃপুঁজীকরণ করতে হচ্ছে। কিন্তু ব্যাংকিং খাতে আস্থা আনার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন এবং খেলাপি ঋণ আদায়ে যে সক্রিয়তার প্রয়োজন, তার অভাব ক্রমান্বয়ে দৃশ্যমান হচ্ছে। ফলে ঋণের উপর সুদের হার হ্রাস করার যেসব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, তা কার্যকর হচ্ছে না। সঞ্চয়ের উপর সুদের হার এবং ঋণের হারের উপর সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য কমানো যাচ্ছে না। খেলাপি ঋণের সমস্যা আর্থিক খাতের শৃঙ্খলাকে ক্রমান্বয়ে দুর্বল করে দিচ্ছে এবং বিনিয়োগের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

দুঃখের বিষয় হলো, যে ধরনের সুদৃঢ় পদক্ষেপ এবং জিরো টলারেন্স নিয়ে খেলাপি ঋণের বিষয়টিকে মোকাবেলা করা উচিত ছিলো, সে ধরনের উদ্যম ও উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বরং কিছু পদক্ষেপ – যেমন একই পরিবার থেকে পরিচালক নিয়োগের সংখ্যা ও মেয়াদকাল, খেলাপি ঋণের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের নামে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও রেয়াত ইত্যাদি ব্যাংকিং খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিরিখে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিরূপ প্রভাব রাখবে। ঋণখেলাপির কার্যকারণ নির্দিষ্ট করে খেলাপিদের ভাগ করা, কারা বিভিন্ন সুবিধা নিয়েও ঋণখেলাপি থেকে যাওয়াকেই ভালো ‘বিজনেস মডেল’ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন, তাদের চিহ্নিত করা, আইনের সংস্কার ও প্রয়োগ – এসব বিষয়ে কোনো উদ্যম দেখা যাচ্ছে না। এর বিপরীতে বরং বড় ও ধারাবাহিক ঋণখেলাপিরা বিভিন্ন প্রণোদনা পাচ্ছেন। ফলে যারা ভালো ঋণ গ্রাহক, তাদের জন্য এক ধরনের নৈতিক বিপত্তি (মোরাল হেজার্ড) সৃষ্টি হচ্ছে। তারা অনুৎসাহিত হয়ে পড়ছেন, কেননা তারা দেখছেন যে খেলাপি হলে তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধা পাওয়া যেতে পারে।

আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা এবং সুশাসনকে শক্তিশালী করতে হলে বিদ্যমান আইনের সংস্কার প্রয়োজন এবং তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা জরুরি। বর্তমানে কিছু উদ্যোগের কথা

শোনা যাচ্ছে। যেমন ঋণ পুনরুদ্ধার কোম্পানি গঠন করে খেলাপি ঋণ আদায়ের চেষ্টা। এসব উদ্যোগ তখনই সফল হবে, যখন ঋণখেলাপিরা দেখবে যে আইনের প্রয়োগ হচ্ছে এবং কাউকেই অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে, তার স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করত হবে। তাহলেই শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতির যৌক্তিকতা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে আর্থিক খাত পরিচালনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে।

সামনে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট আসছে। এ বাজেটের বাস্তবায়নে ব্যক্তি খাতের বড় ভূমিকা থাকবে। জিডিপিতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ, যা বর্তমানে জিডিপির ২৪ শতাংশ আছে, সেটিকে ক্রমান্বয়ে ৩০ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে। ব্যক্তি খাতকে প্রণোদিত করতে হলে ঋণের উপর সুদের হার হ্রাস করতে হবে। আর সেটি করতে হলে আর্থিক খাতের শৃঙ্খলার দিকে নজর দিতে হবে এবং এটি করতে হবে অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে। এ ক্ষেত্রে অনেক ধরনের চাপ থাকবে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের আলোকিত স্বার্থপরতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য অনেক দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখি, আর্থিক খাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব অর্থনীতির অন্যান্য খাতকেও সংক্রামিত করে। সুতরাং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

আমরা সম্প্রতি দেখছি, নতুন নতুন অনেক ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। তুলনীয় অন্য অনেক দেশের চেয়ে আমাদের দেশে ব্যাংকের সংখ্যা বেশি। এ ক্ষেত্রে আমানত সংগ্রহে সমস্যা হচ্ছে; ঋণ বিতরণে সমস্যা হচ্ছে; খেলাপি ঋণ বৃদ্ধিতে এটিও ভূমিকা রাখছে। নতুন নতুন ব্যাংকের অনুমতি না দিয়ে বরং বিদ্যমান ব্যাংকগুলোর দক্ষ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও মার্জার ও একুইজিশনকে প্রণোদিত করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ব্যাংকের সুদের হার এক অঙ্কে নিয়ে আসার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু অর্থনীতির মৌলিক সূত্র না মেনে তা করা যাবে না বা করার চেষ্টা করা হলেও তা টেকসই হবে না। প্রথমত, আমানতকারীর প্রকৃত সুদ যাতে ইতিবাচক থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। মুদ্রাস্ফীতির বিবেচনায় তা ঋণাত্মক হলে আমানতকারীরা অনুৎসাহিত হবেন এবং নিজের কাছে নগদ টাকা রাখতে চাইবেন। ফলে তারল্য সংকট দেখা দেবে। দ্বিতীয়ত, ব্যাংককে তার লাভ্যতার নিরিখে ব্যাংক ঋণের সুদ নির্ধারণ করতে হয় – এটি বিবেচনায় নিতে হবে। তৃতীয়ত, স্প্রেড (ঋণ ও আমানতের সুদের হারের পার্থক্য) ব্যাংকের দক্ষতার উপরও

অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই তিন বিবেচনা পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং, ঋণের উপর সুদের হারহ্রাস করতে হলে মুদ্রাস্ফীতিহ্রাস, খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনা এবং ব্যাংক কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি – তিনটিরই সমন্বয় করতে হবে। উপর থেকে সিদ্ধান্ত দিয়ে চাপিয়ে দিলে তা যে টেকসই হবে না, সে অভিজ্ঞতা আমাদের এরই মধ্যে হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জনকে তাই কোনোক্রমেই হুমকির মুখে ফেলা যাবে না। সে ক্ষেত্রে আর্থিক খাতে যেসব সংস্কার প্রয়োজন, সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমরা সিপিডি'র পক্ষ থেকে অনেক দিন ধরে একটি স্বাধীন ব্যাংকিং কমিশন গঠন করার কথা বলে আসছি। ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন এবং এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনের কথাও বলেছিলেন। প্রস্তাবিত কমিশনের ম্যান্ডেট হতে পারে নিম্নের বিষয়গুলোর উপর সুচিন্তিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ চিহ্নিত করা – খেলাপি ঋণসহ অন্যান্য সমস্যার মূল চিহ্নিতকরণ; আইনি কাঠামোর সংস্কার; কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনভাবে কাজ করার নিশ্চয়তা বিধান; ব্যাংক বোর্ডের গঠনের জন্য নীতিমালা; আইন প্রয়োগে সমস্যার চিহ্নিতকরণ এবং আইনের পরিবর্তন। কমিশন ব্যাংকিং খাতের দক্ষ, যুগোপযোগী ও সুশাসনভিত্তিক পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দেবে। সরকারকে সেসব পরামর্শ বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। আর্থিক খাতের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে এ ধরনের একটি উদ্যোগ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশকে একবিংশ শতাব্দীতে মধ্য-আয়ের দেশ হিসেবে অগ্রসর হতে হলে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে হলে, দেশের আর্থিক খাতকেও এসব অভীষ্টের সঙ্গে সংগতি রেখে সমান্তরালভাবে কাজ করতে হবে। এ দুয়ের মধ্যে যদি বড় পার্থক্য থেকে যায়, তাহলে শুধু আমাদের অভীষ্টসমূহই অনর্জিত থেকে যাবে না, যা অর্জন করেছি তাও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

১৫ মে ২০১৯
দেশ রূপান্তর

BRI - an emerging new international economic order

Rehman Sobhan

As we moved into the 21st century a new more sustainable set of opportunities for the Third World to construct a more just and balanced global economic order has presented itself. The onward thrust of globalisation has led to transformative changes in global comparative advantage. In a wide range of goods and services countries of the Third World, particularly from Asia, have established their global competitiveness to a level where China has emerged as the world's largest economy in purchasing power parity (PPP) terms with India in third place. Between 1990 and 2017 Asia's share of global gross domestic product (GDP) increased from 23.9 per cent to 35.8 per cent while China's share of GDP grew from 1.6 per cent to 15.2 per cent. In the area of global trade, Asia's share increased from 22.7 per cent in 1990 to 37.6 per cent in 2017. China's share of global trade in this same period increased from 1.6 per cent to 11.5 per cent.

As a consequence of Asia's enhanced competitiveness 61 per cent of global foreign exchange reserves are now located in Asian countries, including Central, West, South and East Asia, with China accounting for 27 per cent of total global reserves. A further manifestation of the shift of global investment capacity is to be found in the Sovereign Wealth Funds

(SWF) where 75 per cent of global holdings originate in Asia with China accounting for 21 per cent of global SWF capital. Asia's capital surpluses are now underwriting the balance of payments and budget deficits of the Western capitalist countries where 56 per cent of United States (US) Treasury Bills are held by Asian countries with China accounting for 19 per cent of these holdings.

These trends in global capital accumulation are not likely to change significantly in the years to come since they originate in the competitive strength of the Asian economies and not in the price variabilities of global commodity markets. The arguments now propagated by some of the wealthiest countries that this relocation of competitive strength and capital accumulation to Asia owes to malpractices in the global trading system appears to be a self-serving argument which fails to address the root cause of decline in the competitiveness of the West.

The enhancement of both economic competitiveness and capital surpluses in the hands of some Third World countries, particularly in Asia, provides a historic opportunity to use these strengths to promote South-South cooperation as a route to construct a new, more just international economic order for the 21st century. Central to any initiative to restructure the global economic order is the relocation of capital surpluses from the advanced capitalist countries of the West into Asia with China as the principal source of global capital.

This relocation of global surpluses from the West to Asia has also created conditions for challenging the monopoly of global capital flows and their management by Western and international finance institutions such as the International Monetary Fund (IMF), World Bank and the Asian Development Bank (ADB). This monopoly over capital underwrote the economic power of the West and empowered its institutions to write the rules for governing the global economy so as to perpetuate their hegemony over the global economic order. This relocation of global financial power into Asian hands, now drawing upon the services of some of the world's largest banks and SWF to manage their funds, has

created opportunities to re-write the rules for building a more just economic order. China's vast foreign exchange reserves of United States dollar (USD) 3.2 trillion and capital accumulated in its various sovereign wealth funds amounting to USD 1.7 trillion is specially provisioned to play a vanguard role in building a more balanced order.

BRI as an instrument of cooperation

The refusal of the US and Europe to relinquish their dominance over the management of the global financial institutions has encouraged some countries of the South to draw upon the relocated capital surpluses accumulated by the more advanced emerging economies. The BRICS bank set up by Brazil, Russia, India, China and South Africa was the first of these initiatives but its capital base and scope remains modest. China moved further in designing an Asia-centric bank, the Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB), in partnership with some other countries, with a strong enough capital base to challenge the monopoly of the World Bank and ADB over development financing.

The AIIB served as an important demonstration of China's intention of using its capital surpluses to extend its economic reach across the global South and even into the developed world of Europe. The AIIB's multilateral design and narrower focus on the infrastructure needs of the developing world did not fully capture China's more ambitious vision to construct a new international order. China therefore decided to autonomously move further through the Belt and Road Initiative (BRI) programme by drawing upon its enormous financing capacity. Chinese commercial banks such as the Bank of China and the CITIC had already engaged themselves in funding large investment projects across the world. In 2014, for example, Exim Bank of China disbursed USD 80 billion in project financing, more than the total disbursement of the seven largest development finance institutions. China has now set up a more dedicated BRI funding facility, the Silk Road fund.

Over the last two decades China had steadily built up strong commercial ties across the world. Its growing economic competitiveness had ensured that by 2015 it was the largest trading partner of the US, a number of European Union (EU) countries as well as many economies in Asia, Latin America and Sub-Saharan Africa (SSA). The BRI must therefore be viewed as a continuum of China's expanded global economic reach and resource base.

China's financial capacity to underwrite the BRI programme is backed by the availability of sizeable surplus capacity in its capital goods, engineering and construction industries. Its mega construction companies have emerged as world leaders in the construction sector. These available assets invest China with the development capability to operationalise its BRI programme. This opportunity to recycle its financial investments in large infrastructure projects, located in beneficiary countries, back into the Chinese economy will significantly reduce the opportunity cost to China for implementing the BRI.

China's global expansion has stimulated growth across the Asian region. As a result, today Asia is the fasted growing region in the global system. Over the next 25 years it will account for over 50 per cent of global growth. Investment in this region and indeed in other fast growing economies of the Third World would both provide for higher returns on capital and also be safer sources of investment. The global financial crisis of 2007 which has persisted over the last decade due to severe deficiencies in the direction and management of the financial institutions and system of a number of Western countries indicates that the traditional overlords of the global financial system are no longer its most reliable custodians. Furthermore, some of the most advanced economies have shown that incoming investments in their markets can be exposed to a variety of restraints on political grounds as also to the political hazard of being frozen or confiscated as part of wider strategic agendas.

Since capital surpluses of other Asian and some other Third World countries are also sizeable there is scope for tapping into a much

larger pool of investible resources to underwrite a large number of BRI projects not just in Asia but across the world in Sub-Saharan Africa, Latin America and even Europe. China's BRI programme can play a catalytic role in drawing in countries with investible surpluses from Asia and the BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) to participate in the development of the countries of the South.

As it stands today a partial relocation of global surpluses away from Western capital markets to underwrite the large infrastructures deficit which hold back development in many developing countries, can play a major role in accelerating both global growth and reducing poverty in the less developed countries. The improved economic linkages created by these investments will further stimulate South-South cooperation both as a result of better connectivity as also through the enhanced transfer of skills and technology associated with major investment projects.

Ensuring economic sustainability of BRI programmes

China remains the driving force behind Asia's dynamic GDP and export growth as also the primary source of accumulation of capital surpluses. It can therefore not only sustain its commitment to the BRICS bank and AIIB but can also underwrite major commitments to the BRI. This is an awesome responsibility for one country. China will therefore need to reflect on how it handles its global mandate. It will particularly need to exercise caution in relation to the terms on which it transfers its capital and skills. Under all circumstances China will need to avoid the prospect of BRI beneficiaries falling into debt and dependency traps once associated with the transfer of capital from the West. Debt liabilities of Third World countries, accumulated to the Western colonial powers precipitated the era of colonisation and later the construction of a global economic order based on domination of the North and dependency of the South which came to be known as neo-colonialism.

Today some of the former colonial powers are proclaiming that China's aggressive lending practices are contributing a form of debt trap

diplomacy. In my view much of these criticisms are overstated. China has little to gain from driving weaker partners into debt, thereby reducing their capacity to trade. China has indeed helped out many of its borrowers around the world through debt relief extended to more than 80 projects around the world between 2000 and 2017. But the risks of over-indebtedness remain inherent in the circumstances of some of the weaker economies which have been prone to overdependence on external loans well before the BRI entered the global discourse.

Debt relief is at best a temporary solution. The substantive goal is to restore viability to loss-making investment projects. This has been tried by China in addressing the problems of some of the more talked – about BRI debtors such as Pakistan and Sri Lanka. Both countries had been accumulating international debts not just from China but multilateral institutions as well as from the global capital market. A recent article in the Economist (April 27) reports that Pakistan's current levels of indebtedness amounted to about 80 per cent of its GDP but China's share so far contributes about an eighth of the debt. With further BRI loans being disbursed China's share of debt may rise to a quarter of Pakistan's total debt. Sri Lanka's debt dependence on China, according to a recent article by two of its leading economists, Dushni Weerakoon and Sisira Jayasuriya, amounted to 10 per cent of its external debt. Much of this debt was accumulated independently of its BRI debts through borrowing on hard terms.

In these countries two much-talked-about projects associated with the BRI programme are the Gwadar port on the Arabian sea built by the Chinese at a cost of USD 8 billion to connect Pakistan with the Silk Road and Hambantota Port, in Southern Sri Lanka, built at a cost of several billion dollars by the Chinese. Both projects initially threatened to become losing concerns due to their inability to enhance capacity utilisation and served as liabilities to the respective economies. The Chinese bailed out both projects by converting a large part of the debt into equity and taking over the management of both ports on a long lease. China has now assumed the risk of making both ports

economically viable through superior management and bringing in further investments in the port region to increase capacity utilisation.

The leasing out of national ports to foreign companies with strong management capabilities is common practice and has generated large global business for some of the leading port management authorities such as the Singapore Port Authority and Dubai Port Authority. A Chinese port authority has already taken over the management of Greece's main port at Piraeus.

China has recently applied its model of swapping debt for equity in Laos where it has invested USD 6 billion under the BRI in constructing a railway which connects the landlocked country to China to its north and the sea. China offered the loan on generous terms at 2.3 per cent, with 35 years maturity with repayment after five years and has assumed 70 per cent of the investment as equity. This idea of China of converting debt to equity under the BRI is sensible economics and makes it a stakeholder in the project's viability.

The projection of China as a 21st century imperialist ensnaring poor countries in debt for nefarious strategic purposes is mostly propagated by erstwhile great powers struggling to retain their global hegemony without having to pay the price. However China, as a newcomer to the big league of global investment finance will need to structure its terms for financing of its BRI projects so that recipients can sustain the debt and repay it through enhancement in their production base and its diversification. Such a task would be made easier if China incorporated its experience in Gwadar, Hambantota and Laos as a business model by re-structuring its BRI projects as partnerships with the host country rather than as exclusive loan-financed investments. To this end China will need to restructure its own economy to create market space for a widening volume of exports from Third world countries which have benefitted from and been linked to China through the BRI.

The possible risks of investing exclusively in capital-intensive infrastructure projects through the BRI have not escaped the attention

of the Chinese leadership. In his recent inaugural address to the 2nd BRI global forum in Beijing on May 06, 2019 President Xi Jinping projected the BRI as a comprehensive global economic partnership to build a more integrated economic order to promote trade, investment and technology transfer. BRI investment by China which is projected at around a trillion US dollars may provide the physical manifestation of this order but the economic activity generated through the process will have an exponentially larger impact on not just China but its partners in the projects.

Possible areas of research collaboration between think tanks on the BRI agenda

We must recognise that the BRI as it is conceived by President Xi Jinping in its totality is much more than just a programme to use Chinese capital to construct infrastructure projects across the world. The BRI is, indeed, a global initiative to construct a new international order based on enhancing development and ending poverty across the South within the framework of a more equitable world order. The scope of the BRI thus extends to agendas for comprehensive, deeper economic cooperation across the world.

The vision of a globally more cooperative order has traditionally been articulated in certain global fora convened by international institutions dreaming dreams about a more just, harmonious world. No country came forward to either take the lead in building such an order or in mobilising funding for its realisation. The BRI is unique because it is presented to the world as part of a national and foreign policy commitment by one country, China, which today presides over the largest, most competitive, economy in the world. Furthermore China has demonstrated what has never before been promised before by any collective of countries, let alone one country, that it is willing to invest part of its enormous wealth towards the realisation of its vision. This again is not pie in the sky since the trillion or so dollars committed to BRI is just a quarter of China's current capital surplus and can be replenished through further earnings

through its global competitiveness. The BRI may not immediately take us towards the promised land of global peace and order but will at least demonstrate that at least one country is willing to move ahead in this direction. This initiative may now inspire other countries to join this ambitious enterprise but this is part of the future.

In the absence of any collective move to construct a new order China will have to work out the specifics of its more comprehensive vision on a bilateral basis. Such exercises will need to study the scope and willingness of individual countries to engage with China in the project and politically decide how ambitious they will be in participating in such joint ventures.

Some of the think tanks in China which are already engaged in studying the BRI and its prospects may find it useful to enter into research collaboration with their counterparts in countries where BRI is making or may make significant advances. The focus of such collaborative research would be to study the current focus and impact of BRI programmes, including those funded by the AIIB and to examine the economic benefits and financial viability of these projects in the beneficiary country. Study would also be required as to the terms and condition of the loans appropriate for particular countries to ensure that they do not end up overburdened with debt.

Work on identifying project priorities will remain important. However in some cases a Chinese Think Tank and its partner institution in a host country may review the broader agenda of the BRI to explore how far it is possible to work out a more comprehensive programme for long term cooperation with China. Such an exercise may also be extended to include countries which may partner with China in regional groupings, as for example in the Bangladesh, China (Yunnan), India and Myanmar (BCIM) sub-regional group. Multinational groupings involve more complex political and strategic issues which may also be examined in order to design a comprehensive regional agenda for cooperation which is mutually beneficial to all partners.

It is particularly important that Chinese and Indian think tanks come together to assess the concerns of the Indian government which have so far kept them out of the BRI process. So far no plausible explanation has been forthcoming from the Indian side for keeping itself outside the BRI along with Trump's USA and Japan. Both China and India as well as their neighbours have much to gain from making the BRI into a more inclusive enterprise. With both India and Japan as full partners in the BRI such a pan-Asian grouping could once again recreate a bipolar global order which remains essential to the peace and prosperity of the 21st century.

(This paper was prepared for presentation at a recent meeting of Think Tanks in Beijing convened by the Xinhua News Agency, on the Belt Road Initiative (BRI), as a companion event to the BRI summit on April 26, 2019 hosted by President Xi Jinping).

22 May 2019
The Financial Express

Sale of non-performing loans to asset management company

Fahmida Khatun

While Bangladesh is feted for being one of the fastest growing economies in the world with a growth rate of 8.13 per cent in fiscal year 2018-19, its banking sector is in the grip of despair. All major parameters of the banking sector indicate its persistent fragility. Reforms in the banking sector have not been in sight for long, even though the sector has been grappling with huge governance crisis for more than a decade or so. Needless to say, that as Bangladesh prepares for graduation from a least developed country to a developing country and from a lower middle-income country to an upper middle-income country, it has to prepare for a sound financial system which will provide seamless access to finance for development. Regrettably, the policymakers seem to be unwilling to comprehend the headwinds of the banking problems and take up the required reform agenda.

Recent data reveal that the amount of non-performing loans (NPLs) has touched Bangladeshi Taka (BDT) 116,288 crore in September 2019. This is equivalent to 11.99 per cent of the total outstanding loans in banks. And, NPLs are clearly not a problem of the state-owned banks only. It is also a serious problem in the private commercial banks. Additionally, as of June 2019, loans worth BDT 54,464 crore were written off. The opportunity cost of this money is huge for a poor country like Bangladesh.

If this was allocated for social protection, the annual budget of all social safety net programmes in Bangladesh (except pension for government officials) could be doubled.

In the midst of such a non-stoppable practice of loan default, Bangladesh Bank issued a circular on May 16 announcing that defaulters would be allowed to pay only a 2 per cent down payment and loan repayment period will be 10 years, with a one-year grace period. Moreover, rescheduled loans were to be repaid at only 9 per cent interest rate, which falls in the range of the lowest interest rate in the country. Bad borrowers getting longer time to repay loans than good borrowers is baffling as it clearly encourages the perverse behaviour of borrowers.

While the banking sector is saddled with huge amount of NPLs, it has been reported that recently, the Asian Development Bank has proposed to the ministry of finance to reduce NPLs through forming a public asset management company (PAMC). The finance ministry is also reported to have informed the media that the government would formulate a special law to set up such a PAMC so that the PAMC can purchase NPLs from banks and sell those off to individuals or corporate entities.

The use of AMCs to solve distressed assets of banks is a common practice in the financial world. However, the formation of a PAMC for reducing NPLs in Bangladesh raises a few questions. Do we have the pre-conditions which should be in place in order for the AMC to function? Are we willing to create an enabling situation for the PAMC to function? We forget that the fundamental problem of Bangladesh's banking sector is the total absence of governance and that the problems are structural in nature. So the first and foremost requirement is to ensure that there is a strong government commitment for comprehensive reforms to strengthen institutions and ensure public accountability.

Also, functioning of the AMC has to be backed by a strong legal framework. Unfortunately, Bangladesh's banking sector, in its current situation, is not only a source of crony capitalism but is also guided by outdated and dysfunctional legislation. There is no law for distressed

asset take over, restructuring and additional collateralisation by banks when borrowers default. Hence, in the present context, an AMC could create more problems for the banking sector instead of solving the existing ones.

Moreover, in operationlising a PAMC, the government has to inject an initial equity which acts as the working capital for the company. Evidences of many countries suggest that the initial capital provided to an AMC by the government is rarely recovered. This is usually considered as the sunk cost of the crisis that is borne by the government. It is to be seen what will be the amount of this cost in case of Bangladesh.

It is important to understand that the PAMC is not a magic wand for reducing NPLs. Because an AMC does not function in isolation and the solution through AMC is not straight-forward. Setting up and operation of a PAMC is expensive. Therefore, such a company should only be established if the above-mentioned preconditions are met.

The other issue is that of potential investors. Which individuals and companies will invest in the PAMC? Local or foreign? Can the authorities guarantee a transparent process in case of local investors? Do local investors have experience and corporate governance? Which foreign investors will come forward? When foreign investment in the capital market and banks of Bangladesh is not encouraging, then how much interest will foreign investors show to invest in the PAMC? We have seen global private equity firms such as the Carlyle group playing an important role in salvaging distressed asset-burdened banks in countries such as China, India and South Korea. Can our PAMC attract Carlyle or similar companies to rescue our banking sector? Can our policymakers give them confidence?

Without resolving the above issues, the idea of PAMC is like old wine in a new bottle.

1 December 2019
The Daily Star

বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য প্রসঙ্গে

মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যের সম্ভাব্য পরিমাণ ১৬.৪ বিলিয়ন ডলার, এ প্রাক্কলন বিশ্বব্যাংকের। ২০১৮ সালে বাণিজ্য হয়েছে ৯.৫ বিলিয়ন ডলারের। এ ব্যবধান দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক কোন পর্যায়ে রয়েছে তার নির্দেশক। বিদ্যমান সমস্যাগুলো দূর করতে পারলে ফল কী হতে পারে তা বোধগম্য।

অনেক পর্যবেক্ষক ও বিশেষজ্ঞ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ে বেশ ভাবিত। ২০১৮ সালে ঘাটতির পরিমাণ ছিলো ৮.৬ বিলিয়ন ডলার, এটি বাড়ছে। ভারতে রপ্তানির প্রসঙ্গ উঠলে প্রায়ই বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা অশুল্ক বাধা নিয়ে অভিযোগ করেন। বাংলাদেশি পণ্যের উপর অ্যান্টি-ডাম্পিং ডিউটি ও কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপ করে রেখেছে দেশটি। এসবের প্রভাব ক্ষতিকর। বাণিজ্য উৎসাহিত করার ও ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থার অভাব উভয় পক্ষের জন্যই সবচেয়ে বড় অশুল্ক বাধা।

ভারত থেকে সাধারণত কাঁচামাল আমদানি করা হয় বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী খাতের জন্য, বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পের জন্য। এ শিল্পে রপ্তানির উদ্দেশ্যে পোশাক প্রস্তুত করা হয়। প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে মোট রপ্তানির ৮৭ শতাংশই তৈরি পোশাক। এসবের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের মধ্যে রয়েছে তুলা, সুতা ও কাপড় – যা ভারত থেকে আনা হয়। সুখের বিষয়, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত রয়েছে; ২০১৮ সালে এর পরিমাণ ছিলো ৬.১ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর বিষয়টি নীতিনির্ধারণী মহলে এবং জনমহলে বড় বিতর্কের বিষয় হয়ে রয়েছে।

ভারতের বর্ধমান আমদানি বাজারের সুবিধা ঠিকমতো নিতে পারছে না বাংলাদেশ। ২০১৮ সালে ভারতের মোট আমদানি ছিলো ৪০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। ভারত বিশ্ববাজার থেকে অনেক পণ্য কিনছে, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে নয়। একই জাতের পণ্য বিশ্ববাজারে পাঠাচ্ছে বাংলাদেশ, কিন্তু ভারতে নয়। নীতি-নির্ধারকদের যথাযথ নীতির মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বাড়ানোর পথে বাধা অবশ্যই দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেক স্থলবন্দরগুলোর মাধ্যমে হয়ে থাকে। এর জন্য নো ম্যানস ল্যান্ডে পণ্য খালাস ও উত্তোলন করতে হয় – এতে একদিকে বিলম্ব ঘটে, অন্যদিকে পণ্যের দাম চড়ে। মিউচুয়াল রিকগনিশন অ্যাগ্রিমেন্ট না থাকায় দূরবর্তী টেস্টিং সেন্টার থেকে পরীক্ষণ-সমীক্ষণের ফলাফল না আসা পর্যন্ত পণ্য পড়ে থাকে।

ঢাকা-দিল্লি পণ্য পরিবহন খরচ ঢাকা থেকে ইউরোপীয় বা মার্কিন বন্দরে পরিবহন খরচের চেয়ে অনেক বেশি। বাণিজ্য-সংযোগের কার্যকারিতা পরিবহন, বিনিয়োগ ও লজিস্টিকস কানেক্টিভিটির কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে। সাফটা চুক্তির অংশ হিসেবে ভারত তার বাজারে বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ তা কাজে লাগাতে পারছে না।

সীমান্তে বাণিজ্য ত্বরান্বিতকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য কিছু নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, কাজও চলছে। ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন এবং দুই কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো উন্নত করা হচ্ছে এবং নথিকরণের ঝামেলা কমানো হচ্ছে। ২০১৫ সালে সম্পাদিত বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল মোটর ভেহিকল চুক্তি অনুযায়ী সীমান্ত দিয়ে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল অনুমোদন পেলে পরিবহন খরচ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমবে।

বাংলাদেশ ভারতীয় বেসরকারি কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগের জন্য কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা ও বাগেরহাটের মোংলায় দু'টি বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা করার কথা বলেছে। রিলায়েন্স পাওয়ার বাংলাদেশে তিন হাজার মেগাওয়াটের একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি টার্মিনাল নির্মাণের জন্য তিন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের চুক্তি সই করেছে। উন্নত অবকাঠামো, বাণিজ্য ত্বরান্বিতকরণের ভালো ব্যবস্থা, এসইজেডে দক্ষ ব্যবস্থাপনা, কার্যকর পরিবহন সংযোগ ও জ্বালানি নিরাপত্তা বিনিয়োগকে প্রণোদিত করতে পারে।

নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে এবং বিরোধ নিরসন ব্যবস্থাকে সংহত করতে হবে। সীমান্তে এক পদক্ষেপে যাতে কাজ হয়, সেটি করতে হবে;

ইলেকট্রনিক তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। এতে দুই পাশে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স সমন্বিত হবে এবং পণ্যবাহী গাড়ির সহজ পারাপার নিশ্চিত হবে। গাড়ি চলাচল, ল্যাবরেটরি টেস্টিং, স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি কার্যক্রম এবং টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডস-সংক্রান্ত মিউচুয়াল রিকগনিশন অ্যাগ্রিমেন্ট হওয়া দরকার। এর জন্য পর্যাপ্ত সক্ষমতা তৈরি করাও দরকার।

বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের অবশ্যই ভারত ও চীনের সঙ্গে বিকাশমান অর্থনৈতিক বন্ধনের নিরিখে সমন্বিত কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। সামগ্রিকভাবে বললে, দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে বলেই প্রতীয়মান হয়। ঢাকা যদি সম্পর্কের সম্ভাব্য সুবিধা পুরোপুরি নিতে চায়, তাহলে তাকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

[উদ্ধৃতাংশ ইষ্ট ইশিয়া ফোরামের সাক্ষাৎকার থেকে অনূদিত]

২২ *সেপ্টেম্বর* ২০১৯
কালের কণ্ঠ

Basic wage as a proportion of total wage for RMG workers has been falling

Khondaker Golam Moazzem

Dr Khondaker Golam Moazzem, Research Director, Centre for Policy Dialogue (CPD), talks to Nahela Nowshin of The Daily Star about the recent demonstrations of readymade garment (RMG) workers and the underlying reasons behind them.

Could you shed some light on the demonstrations of RMG workers that we have seen this week?

The demonstrations of RMG workers as reported in the print and electronic media in the last several days reflect the spontaneous reaction of general workers regarding the discrepancies in the new minimum wages. Although the demonstrations were initially localised in nature, they may spread over other regions unless the issues are properly addressed. However, workers' unrest on wage-related issues in the RMG sector is a perennial problem due to less attention being given to workers' concerns amidst discussions and negotiations on minimum wage. Workers only become fully aware of the revision of minimum wages when they receive the wages in hand. Discussions on minimum wage of RMG workers began in February 2018 and continued till August 2018, the gazette was published in November last year and

the minimum wage came into effect last December. Now we are in January 2019 which is when workers seem to have finally realised just how much they will be benefited.

Workers were demanding a minimum wage of Bangladeshi Taka (BDT) 16,000 and finally the government set the wage at BDT 8,000 (for grade 7 workers). CPD in its study on livelihood expenditure of RMG workers proposed a detailed wage structure for different grades. However, the announced wages were way below the proposed wages. More importantly, CPD and other organisations had said that the basic wage as a proportion of the total wage would actually go down as a result. When the minimum wage of BDT 5,300 was declared in 2013 for grade 7 workers, basic wage was BDT 3,000 which accounted for 56.6 per cent of the gross wage. But last year when the minimum wage was set at BDT 8,000, the basic wage of BDT 4,200 accounted for 52.5 per cent. The basic wage as a proportion declined for workers of other grades as well.

We had said even back then that there would be various consequences of such a move. Firstly, overtime pay and other benefits (e.g. festival bonus) which are calculated based on the basic wage would fall (as reported in national dailies and electronic media). So despite an increase in the total wage, workers would be less benefited when you assess basic wages and other benefits as a proportion of the total wage.

Secondly, starting from 2013 until 2018, workers have gotten an increment which is five per cent of their basic wages. But now workers have realised that there isn’t much difference between their basic pay under the new wage structure and the basic pay that they used to get earlier under the system of five per cent increment. This is why a sense of dissatisfaction is festering among workers, particularly those who belong to upper grades. There is a tendency to excessively focus on grade 7 or entry level workers. And wages of upper grade workers did not rise by as much as that of the bottom-tier workers, partly due to cost-related reasons. The demonstrations that we have seen in the last couple of days reflect the fact that workers’ expectations have not

been met; even though they didn't get the wages they had asked for, they had hopes that they'd get certain net benefits which didn't materialise either, particularly for upper grade workers.

RMG workers' discontent about wages seems to have reached a boiling point. What is the way forward?

In the gazette notification, there are 17 conditions and I believe solutions to workers' grievances lie within condition no. 9, 12 and 13. Ordinarily, entry level workers tend to be better off than older workers under a new wage structure and factory owners are usually cautious about any dissatisfaction that may arise among senior workers as a result. The introduction of increment with basic wages during the period of revision of minimum wages in 2013 was a new initiative. Unfortunately, this issue did not get proper attention when the discussion on minimum wage in 2018 took place. In fact, this increment issue has introduced a new dimension in the workers' wage structure—new wage structure should not only indicate the wage scale but also needs to indicate the "fixation of wages" in the scale.

To assess equitability of workers' wages under different grades, a measuring indicator is used which shows whether a sufficient gap between median wage and entry level wage has been maintained. For example, in 2013, a grade 7 worker got 79 per cent of a grade 4 worker's wage. In 2018, a grade 7 worker got 86 per cent of a grade 4 worker's wage. This shows that the gap between the wages of a grade 7 worker and grade 4 worker has reduced. This can work as a disincentive for a skilled worker. And the demonstrations of RMG workers we are seeing are a manifestation of this. Compared to other major garment-exporting countries, the wage gap is far less in Bangladesh.

Unfortunately, in Bangladesh's RMG sector, discussions have remained limited to wage increase of entry level workers alone and incentivisation of skilled workers has not received the attention that it deserves. In CPD's re-cent research study, we have proposed that upper grade

workers get proportionally higher wage increases so that workers can be incentivised in a progressive manner (the proportionate rise of wages following promotions from grade 6 to grade 5 would be 7 per cent; from grade 5 to grade 4 would be 10 per cent; from grade 4 to grade 3 would be 13 per cent; and from grade 3 to grade 2 would be 15 per cent). It is important to take into account that jobs in the RMG sector are increasingly becoming complex-operation-oriented because of the changing product composi-tion (shift towards high-value, more complicated products).

I think the existing gazette of workers' wages could be used for solving the problem. Taking the fixation issue into account, worker's wage under each grade (except grade 7) should be fixed by including the number of increments received by the workers since the last revision of wages in 2013 (no. of increments will be a maximum of five). Hence, the new wage can be fixed by adding five increments with the announced basic under the gazette. For example, the basic of grade 3, 4, 5 and 6 could be re-fixed at a maximum of BDT 6,480, BDT 6,163, BDT 5,838 and BDT 5,463 respectively. This change in the basic wage in different grades would reflect wage-skill matching in the operation of RMG workers.

The fact that some factories have been paying workers following the old wage structure has emerged as another grievance during the recent demonstrations. So there is also a legitimate concern about the proper implementation of new wage structures.

It seems that traditional problems with regard to implementation of the new minimum wage could not be avoided this time either. In 2013 when the minimum wage for RMG workers was first declared, we came across several issues: (i) time required for full implementation of the new wage; (ii) discrepancies in the early period in ensuring benefits and wages according to their grades; and (iii) complaints regarding decline in grade despite an increase in wage.

These issues must be kept in mind when implementing a new wage structure. The gazette has stipulated conditions so that a worker's grade does not go down and wages don't decrease. If these conditions are met, workers' dissatisfaction could be contained to an extent. There is a need for strict monitoring by the Department of Labour, DIFE, BGMEA and BKMEA. A part of the responsibility should also be taken by brands, buyers and consumers to ensure decent wages for workers.

Furthermore, we have to look beyond wages and acknowledge the reality that workers have to face in their day-to-day lives such as rising living costs. CPD has made a number of proposals with regard to this in its recent report. Along with wages, the government should also think along the lines of a "community development" approach, which includes provision of healthcare facilities and housing, in RMG clusters for the welfare of our workers.

11 January 2019
The Daily Star

Why we still do not get fair clothing industry in Bangladesh

Khondaker Golam Moazzem

Underpaid Bangladeshi tailors remain victims of 'the system'

A week of violent protest by textile workers in Bangladesh is not having an impact. "Why are the big brands not responding now?"

Thousands of textile workers have been dispersed with baton and tear gas during demonstrations in the capital Dhaka. One fell dead last week. Many were injured.

As a punishment, employers threatened to close factories. Bangladesh points to the new minimum wage and asks the workers to resume work. But little has changed. The 'new' wage of Bangladedhi Taka (BDT) 8,000 (83, ed.) Had already been negotiated in November. Now it is paid out for the first time. Textile workers reject that wage as inhuman and will continue to do so.

According to the Bangladeshi think tank Center for Policy Dialogue (CPD), a worker should receive at least BDT 10,000.

'These are emotional, little coordinated protests,' says political scientist Shantanu Majumder (Dhaka University). 'It starts with a spark in one

factory and before you know it there are two thousand people on the street. We will see this escalate more often. The workers no longer trust anyone.'

According to trade unionist Nazma Aktar, the anger is immense. "People do not believe or understand the promises. The lifespan increased by seven per cent this year, while wages stagnated."

Forward loans

Tailors in Bangladesh, the second supplier of clothing worldwide, do not receive a living wage. They survive through the labour of family members and usurious loans and alms from the government. "17 per cent of the workers we questioned sleep on the floor at their shabby home," says Dr Khondaker Golam Moazzem. The wage rises through supplements for overtime, while the basic wage decreases relatively. That increases the pressure. "The government must intervene," says Dr Moazzem. "It is also now that big brands have to make their voices heard, but it remains silent." Time is running out: workers no longer have many options.

Option 1: Local factories pay fair wages

"Different manufacturers sit in parliament and stop reforms," says Majumder. The government has too often chosen their position. Employers also have an influence on the opposition. The manufacturers say that their buyers, the western companies, move away with a higher wage. "But cheaper cost countries like Vietnam or Pakistan cannot just deliver the large quantities on time that Bangladesh does," says the political scientist. "The employers have an attitude problem."

Option 2: Clothing brands offer fair prices

"Tell your readers that Western brands have to pay more," says trade unionist Aktar unambiguously. "The distribution of margin in the value chain indicates that the margins for local manufacturers are too small," says Dr Moazzem. He argues that consumers should pay more and that payment to be passed on to the workers through innovative means, such as better banking facilities.

Option 3: Help with government or trade union?

“The tripartite wage negotiations were poor this year compared to the past,” says Moazzem.

Moreover, the democratic climate in Bangladesh is deteriorating, while external inspection bodies in the sector are being phased out (DS 26 November 2018). “Bangladesh is tired of the international finger,” said a German NGO employee. Workers cannot just set up a trade union. You are still being fired for that. Majumder shares, “Only ten per cent of the workers are members of a trade union, and the unions are fragmented. Sometimes they lean towards the government.”

Option 4: You argue …

… but until now the answer was repression. This worsens the atmosphere with those who are injured. ‘41 per cent of the workers have debts. Often this is to pay for a medical emergency, says Dr Moazzem. Majumder concludes, “It’s not about how an individual prime minister now responds to the unrest, but to the entire system that has to change.”

15 January 2019
Blendle.com

ব্যাংককে করের টাকা দিয়ে ক্ষতির রাষ্ট্রীয়করণ করা হচ্ছে

মোস্তাফিজুর রহমান

আগামী অর্থবছরের বাজেট, অর্থনীতির নানা দিক ও ব্যাংক খাত নিয়ে সিপিডি কার্যালয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন সংস্থাটির সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ফখরুল ইসলাম।

প্রথম আলো: ১৩ জুন জাতীয় সংসদে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বের হয়ে আসার এই সময়ে বাজেট কেমন হওয়া উচিত বলে সিপিডি মনে করে?

মোস্তাফিজুর রহমান: ১০ বছর পর আমরা নতুন একজন অর্থমন্ত্রীর তৈরি বাজেট দেখতে যাচ্ছি। আমি মনে করি, আগের অর্থবছরগুলোর সঙ্গে আগামী অর্থবছরের একধরনের ধারাবাহিকতা থাকবে। রাতারাতি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রত্যাশা করাটা অযৌক্তিক হবে। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে যে পর্যায়ে আছে, তার জন্য নতুনভাবে বাজেট করার প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। সামষ্টিক অর্থনীতির ধারাবাহিক অর্জন, যেটি ছিলো অর্থাৎ বাজেট ঘাটতি ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকা, সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, লেনদেনের ভারসাম্য ইতিবাচক থাকা – এগুলো কিছুটা ঝুঁকির মুখে পড়ছে। আবার, এ বাজেট হবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ অর্থবছরের বাজেট। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ যেহেতু শুরু হবে, উচিত হবে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ধারার সঙ্গে এর যোগসূত্র রেখেই নতুন বাজেট তৈরি করা।

প্রথম আলোঃ বাংলাদেশ তো অনেক ক্ষেত্রে ভালো করছে। কিন্তু এই ভালো ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে – এই বিবেচনায় টেকসই উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে। তার জন্য বাজেটে কি সুরক্ষামূলক উদ্যোগ থাকা উচিত?

মোস্তাফিজুর রহমানঃ গড়ে আমরা ভালো করছি। তবে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন বা টেকসই উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ উন্নয়নকে হতে হবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং পরিবেশবান্ধব – এই ত্রিমাত্রিক সংশ্লেষে। বণ্টন এবং বৈষম্য নিরসনের দিক থেকে বড় ধরনের ব্যত্যয় ঘটছে সমাজে। ২০২৪ সাল শেষে এলডিসি থেকে উত্তরণের পর আরো প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে আমাদের যেতে হবে। সুতরাং, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরবরাহ সক্ষমতা ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি খাতে চাঞ্চল্য আনাই হবে বাজেটের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

প্রথম আলোঃ বৈষম্য নিরসনে তাহলে কী করা উচিত?

মোস্তাফিজুর রহমানঃ আয়, ব্যয় ও পুনর্বণ্টন – এ হলো বাজেটের তিনটি দিক। বাজেটে আয় ও ব্যয় উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনতে হবে। আয়ের ক্ষেত্রে যদি বলি, আমাদের প্রত্যক্ষ কর মোট করের এক-তৃতীয়াংশ। তার মধ্যে ব্যক্তি কর আবার প্রত্যক্ষ করের এক-তৃতীয়াংশ। বিশ্বের অন্য দেশে তা একেবারেই বিপরীত। অথচ বাজেটের মাধ্যমেই অর্থ সংগ্রহ করে সরকার বিনিয়োগ করে। এই যে ঋণখেলাপি, করখেলাপি – এ ব্যাপারে যে আইনগুলো আছে, যথেষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ হচ্ছে না। আবার দুর্নীতির কারণেও বৈষম্য বাড়ছে।

প্রথম আলোঃ অর্থ পাচারের কারণে কি বৈষম্য বাড়ছে না?

মোস্তাফিজুর রহমানঃ হ্যাঁ, বাড়ছে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন আছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি ট্রান্সফার প্রাইসিং সেল আছে। একটি বৈশ্বিক প্রতিবেদনে বছরের পর বছর বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে বছরে যে পরিমাণ অর্থ পাচার হয়, তা আমাদের বৈদেশিক আয় ও বিনিয়োগের চেয়েও বেশি। অর্থ পাচার ঠেকাতে হলে এনবিআর ও বাংলাদেশ ব্যাংককে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। ট্রান্সফার প্রাইসিং সেল হয়েছে বটে, এটি যাতে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে, সে জন্য কোনো বিনিয়োগ কি হয়েছে? হয়নি।

প্রথম আলো: বাজেটে অগ্রাধিকার খাত কী হওয়া উচিত? আয়-ব্যয়ের বিন্যাস কি এমনই থাকবে?

মোস্তাফিজুর রহমান: ব্যয়ের দিকের সরকারের কর্মকাণ্ড নতুনভাবে বিন্যস্ত করা দরকার। যেমন: শিক্ষা খাতে ব্যয় মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২ দশমিক ৫ শতাংশেরও কম। এটিকে ৪ শতাংশে নিতে হবে। স্বাস্থ্য খাতে ১ শতাংশের কম, কমপক্ষে একে দ্বিগুণ করতে হবে। সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপির ৩ শতাংশের কথা বলা হলেও পেনশন বাদ দিলে তা ১ দশমিক ৭ শতাংশ। আমাদের নীতিমালার মধ্যেও বৈষম্য লুকিয়ে থাকে। এগুলো পরিষ্কার করা উচিত।

প্রথম আলো: ব্যাংক খাতের জন্য আপনার নতুন কোনো পরামর্শ আছে?

মোস্তাফিজুর রহমান: অর্থনীতির জন্য ব্যাংক অত্যন্ত সংবেদনশীল খাত। ব্যক্তি বিনিয়োগ প্রায় স্থবির। সম্প্রতি ঋণখেলাপিদের নিয়ে কিছু উদ্যোগ দেখছি। ঋণখেলাপি ও টাকা পাচারকারীদের শাস্তি দেওয়ার বদলে উল্টো আরো টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। কোনো কারণে এটি হলে ফল খারাপ হবে। আগেও এক পরিবার থেকে চারজনকে ব্যাংকের পরিচালক এবং তাদের টানা ৯ বছর পর্ষদে রাখার বিধান করা হয়, যা কাম্য ছিল না।

প্রথম আলো: আপনার সুনির্দিষ্ট পরামর্শ কী?

মোস্তাফিজুর রহমান: মূল জায়গায় হাত দিতে হবে। বছরের পর বছর ব্যাংকগুলোকে জনগণের করের টাকা দেওয়া হচ্ছে। ব্যাংক খাতের অব্যবস্থাপনা ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার দায় করদাতাদের উপর চাপিয়ে দেওয়াকে আমি বলব ক্ষতির রাষ্ট্রীয়করণ করা হচ্ছে। সিপিডি আগেই ব্যাংক খাত নিয়ে একটি কমিশন করার কথা বলেছিল। সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত রাজিও হয়েছিলেন। তবে সরকারের নিজের স্বার্থেই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিত, আন্তর্জাতিকভাবে যে বিষয়টিকে বলা হয় 'আলোকিত স্বার্থপরতা'।

প্রথম আলো: আপনাকে ধন্যবাদ।

মোস্তাফিজুর রহমান: আপনাকেও ধন্যবাদ।

০১ জুন ২০১৯
প্রথম আলো

বিনিয়োগ বাড়ানো বড় চ্যালেঞ্জ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

গত কয়েক বছরে দেশে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ স্থবির হয়ে আছে। এর অন্যতম কারণ বিনিয়োগের জন্য পুঁজি সংগ্রহের দু'টি খাতেই (ব্যাংক ও পুঁজিবাজার) বিশৃঙ্খলা চলছে। এ অবস্থায় আগামী বাজেটেও বিনিয়োগ বাড়ানো বড় চ্যালেঞ্জ। এছাড়া মোটাদাগে সরকারের অন্য চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজস্ব আয় বাড়ানো এবং বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নির্বাচনী ইশতেহার অনুসারে পুরো আর্থিক ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কার আনতে হবে। বাজেট হতে পারে আর্থিক ব্যবস্থা সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের দর্শনকে ধারণ করে বাজেট হওয়া উচিত। যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মনির হোসেন।

যুগান্তর: এবারের বাজেটে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিবেচনায় এবারের বাজেটে বড় চ্যালেঞ্জ তিনটি। এগুলো হচ্ছে রাজস্ব বা সম্পদ আহরণ, বিনিয়োগ বাড়ানো এবং বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা।

এর মধ্যে রাজস্ব বা সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক - এ দু'টি উৎসই চ্যালেঞ্জে। কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় দেখা গেছে, রাজস্ব আহরণের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, বাস্তবে আদায় তার চেয়ে অনেক কম। এ বছরও ৮০ থেকে ৯০ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি থাকবে। প্রতিবছরই এই পার্থক্য বাড়ছে। মোট

দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) হারের হিসাবেও রাজস্ব ঘাটতি পার্থক্য বাড়ছে। ফলে অভ্যন্তরীণভাবে সম্পদ আহরণের এই সীমাবদ্ধতা, স্বাভাবিকভাবেই সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যুক্তিযুক্ত নয়। অন্যদিকে, সহজ শর্তে বৈদেশিক অনুদান ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি দেখি না।

ফলে প্রতিবছরই জিডিপির ৪ শতাংশের মতো ঘাটতি থাকছে। আর এই ঘাটতির বড় অংশই সঞ্চয়পত্র ও কিছুটা ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে। এসব ঋণের সুদ খুব বেশি। ফলে সরকারের দায়দেনা পরিশোধে ব্যয় বাড়ছে। এতে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। বছরের শেষ তিন মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বেশি হারে বাস্তবায়ন প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ফলে সম্পদ সরবরাহের ক্ষেত্রে সহজ শর্তের অনুদান ব্যবহার করতে না পারলে বাজেটের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে। এক্ষেত্রে বাজেট প্রণেতাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের হিসাব-নিকাশ দেওয়া হয়, কিন্তু সেগুলো বাস্তবভিত্তিক নয়।

বাজেটের দ্বিতীয় বিষয়ের (বিনিয়োগ বাড়ানো) ক্ষেত্রে বলতে হয়, গত কয়েক বছর ধরে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ স্থবির হয়ে আছে। এটি সবাই স্বীকার করছে। ফলে বিনিয়োগ বাড়ানো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ বেসরকারি বিনিয়োগে অর্থায়নের বড় দু'টি উৎস মুদ্রাবাজার বা ব্যাংক এবং পুঁজিবাজার। এর মধ্যে ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা নেই। ব্যাংকগুলোর পুঁজি স্বল্পতা রয়েছে। খেলাপি ঋণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আরো একটি সমস্যা হলো সুদের হার বিনিয়োগ সহনীয় নয়। আর হুকুম দিয়েও এই সুদের হার কমানো যায়নি। উল্টো সরকার নতুন যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে, তা ঋণখেলাপিদের উৎসাহিত করবে। এতে ভালো গ্রাহকদের এক ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে। অর্থাৎ সরকারের এই পদক্ষেপ ঠিক উল্টো পথে যাত্রা। এতে সামগ্রিকভাবে সুশাসনের ঘাটতি তৈরি হবে। ফলে ব্যাংকিং খাতে যদি আমূল সংস্কারের উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তাহলে সুদের হার কমানোর হুকুম দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কারণ এই সমস্যা অনেক গভীরে।

এর সঙ্গে অনেক বিষয় জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, পরিচালনা পর্ষদের নিয়োগ ও কার্যক্রম এবং সরকারের সদিচ্ছা। তবে এটি শুধু বাজেটের মধ্য দিয়ে করা যাবে না। বাজেট দিয়ে সূচনা করা যাবে। আমাদের প্রত্যাশা হলো, বাজেটে এমন কোনো সুবিধা যেন না দেওয়া হয়, যাতে ঋণখেলাপি পরিস্থিতি আরো গুরুতর আকার ধারণ করে। একইভাবে সমস্যা রয়েছে দেশের পুঁজিবাজারে। এখানেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই।

এক ধরনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী এটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিভিন্নভাবে এই বাজারে কারসাজি হচ্ছে। আর ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই সমস্যাটিকে স্বীকার করে পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে বাজেটে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের কিছু সুবিধা দেওয়ার কথা আসছে। কিন্তু এই সুবিধায় শেয়ারবাজারের মৌলিক সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। ফলে পুঁজিবাজারেও বড় ধরনের সংস্কার দরকার। এ কারণে আমাদের বক্তব্য হলো বাজেটে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না, যা পুঁজিবাজারের সমস্যাকে আরো গভীরতর করে।

বাজেটের তৃতীয় চ্যালেঞ্জ বৈদেশিক লেনদেনের উপর সাম্প্রতিক সময়ে এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। আর্থিক লেনদেন ও চলতি হিসাব - এ দু'টিতেই ঘাটতি বাড়ছে। পাশাপাশি চাপ বাড়ে দেশের মুদ্রা বিনিময় হারের উপর। বর্তমানে অন্য দেশগুলোর তুলনায় টাকার বিনিময় হার বেশি। এটি কমিয়ে সমন্বয় করা দরকার। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার বিক্রি করে এটি স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করছে। এতে রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়াও ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক লেনদেনের দায় বাড়ছে। যদিও বর্তমানে এই দায় স্বস্তির জায়গায় আছে। কিন্তু আগামী দুই-তিন বছরে এটি অস্বস্তিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য ব্যবসায়ীদের রপ্তানির জন্য কিছু প্রণোদনা দিতে পারে সরকার। কিন্তু এতে সাময়িক কিছুটা সমাধান হলেও গভীর থেকে সমস্যার সমাধান হবে না। কয়েকদিন পর আবার একই সমস্যা সৃষ্টি হবে। প্রণোদনার জন্য চাপ আসবে। ফলে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না, যার জন্য রপ্তানিতে বাড়তি সমস্যা সৃষ্টি হবে। সামগ্রিকভাবে বক্তব্য হলো টাকার বিনিময়ের হার সমন্বয় না করে সাময়িকভাবে কিছু সুবিধা দিয়ে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা অর্থনীতির সুষ্ঠু নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে রেমিট্যান্স (প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ) বাড়ানোর জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রবাসীদের কিছু সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

যুগান্তর: আর্থিক ব্যবস্থায় সংস্কারের কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেই, আপনি কী মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাজেটের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে কিছুটা সমন্বয় ও উন্নতি হতে পারে। কিন্তু ব্যাংকিং খাত, পুঁজিবাজার, বৈদেশিক লেনদেন, মুদ্রার বিনিময় হার, মূল্যস্ফীতি ও কৃষিসহ আরো যে সব সমস্যা

আছে, সেগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংস্কার দরকার। বর্তমান সরকারের প্রথম বছর যাচ্ছে, কিন্তু সংস্কারের জন্য আমরা কোনো হাঁকডাক দেখিনি। সবকিছু গতানুগতিকভাবে চলছে।

কিন্তু বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধিকে ধরে রাখতে হলে ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক চেতনা ও পদক্ষেপের ভেতরে বাজেটকে স্থাপন করতে হবে। বাজেট দিয়ে সব সমস্যা সমাধান হবে না। কিন্তু বাজেটকে বড় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অনেক কিছু রয়েছে। কিন্তু বাজেটের মাধ্যমে নির্বাচনী ইশতেহারের দর্শনকে ধারণ করা যাবে কিনা সেটি বড় প্রশ্ন। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করছি।

যুগান্তর: ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের জন্য এ বছর অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো ভ্যাট আইন। এটি তিন ধাপে বাস্তবায়ন করার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু আমরা এর সঙ্গে একমত নই। আমরা মনে করি, ভ্যাটের হার কমিয়ে সমানভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত। বিভিন্ন হারের কারণে কর আহরণ, প্রয়োগ, সুবিধা দেওয়া ও হিসাব রাখার ক্ষেত্রে আগে যে সব সমস্যা ছিলো, সে সমস্যা থাকবে। অন্যদিকে এই আইন চালু হলে আগের চেয়ে কর বেশি পাবে, না কম পাবে, সেটিও পরিষ্কার নয়। এরপরও ভ্যাট আইন চালু হোক এটি আমরা চাই। কিন্তু এখনও আইনটি চালুর প্রস্তুতি শেষ হয়নি। ফলে আগামী ৫ বছরে কীভাবে এটি কার্যকর হবে, সে পদক্ষেপগুলো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে হবে। অন্যদিকে ভ্যাট একটি পরোক্ষ কর, এটি আদায়ের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হবে, কিন্তু প্রত্যক্ষ কর আদায় হবে না - এটি যৌক্তিক নয়। কারণ দেশের মোট করের ক্ষেত্রে মাত্র ২৫ থেকে ২৬ শতাংশ প্রত্যক্ষ কর। এটি বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি।

যুগান্তর: অর্থনীতিতে বড় সমস্যা বৈষম্য। এটি কমানোর ব্যাপারে বাজেটে কী ধরনের পদক্ষেপ প্রত্যাশা করছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বৈষম্য কমানোর ব্যাপারে আমরা পরিষ্কার করে বলেছি, শুধু আয়কর দিয়ে বৈষম্য কমানো যাবে না। প্রত্যক্ষ কর বাড়ানো হলেও খুব বড়ভাবে বৈষম্য কমবে না। এক্ষেত্রে সম্পদের উপর কর বসাতে হবে। উত্তরাধিকারের মাধ্যমে যে সম্পদ পাওয়া গেছে, সেটির উপর কর বসাতে হবে। পৃথিবীর যে সব দেশে বৈষম্যবিরোধী রাজস্ব ব্যবস্থা হয়েছে, এর সব দেশই সম্পদের করকে গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমানে সম্পদের

ওপরে সারচার্জ রয়েছে। তাই এ বছর পরিষ্কারভাবে সম্পদের উপর কর বসানো উচিত। বর্তমানে যেসব কর বসানো বা ছাড় দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোও বৈষম্য বাড়ায়।

যুগান্তরঃ এ বছর বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোন খাতে বেশি জোর দেওয়া উচিত?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপির মাত্র ২ শতাংশ। স্বাস্থ্য খাতে মাত্র ১ শতাংশ। এই হারে ব্যয় দিয়ে বাংলাদেশের মতো দেশে দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমা সম্ভব নয়। এতে ঘুরেফিরে আবার গরিব মানুষ সৃষ্টি হবে। আমরা হিসাব করে দেখেছি, গরিব মানুষের শিক্ষার হার বেড়েছে, কিন্তু তার গড় অর্জন একটি সচ্ছল পরিবারের চেয়ে কম। সাধারণভাবে আমাদের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন হয়েছে। বর্তমানে গড় আয়ু ৭২ বছর।

এটি পৃথিবীর গড় আয়ুর চেয়ে বেশি। কিন্তু এখনও একটি স্বচ্ছল পরিবারের চেয়ে গরিব পরিবারে মাতৃমৃত্যুর হার দ্বিগুণ। এর মানে হলো গরিবের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা না দিতে পারলে বৈষম্য দূর হবে না। একটি মানুষ কীভাবে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতায় টিকবে, তা নির্ধারিত হয় অনেক আগে। প্রথমত সে কোন উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মেছে। দ্বিতীয়ত সে কী অর্জন করেছে। এ কারণেই মানুষের অর্জনের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এটি বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এজন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

যুগান্তরঃ দেশ থেকে টাকা পাচারের বিভিন্ন তথ্য আসছে। এটি রোধে বাজেটে কী ধরনের পদক্ষেপ থাকা উচিত?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ সাধারণভাবে বাংলাদেশে একটি অদ্ভুত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। একদিকে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ নেই। অপরদিকে তারাই হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে। কী কারণে এটি হচ্ছে তা বোঝা দরকার। এই টাকা পাচারের কয়েকটি কারণ হতে পারে। যেমন তারা বিনিয়োগের পরিবেশ পাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় টিকে থাকতে পারছে না। অথবা বাংলাদেশের ভবিষ্যতের প্রতি তাদের আস্থা নেই। সামগ্রিকভাবে কেন উচ্চবিত্তরা দেশে টাকা রাখে না, সেটি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয়। আবার যদি এ ধরনের কাজ আইনের আওতায় না এনে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে বাজেটের আকার বাড়িয়ে লাভ নেই। এ অবস্থার উত্তরণে আমরা বড় ধরনের সংস্কারের কথা বলছি। বাজেট নিয়ে স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্যই সংস্কার দরকার।

যুগান্তরঃ বিভিন্ন মহল থেকে করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে, আপনার মন্তব্য কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ আমি মনে করি করমুক্ত আয় সীমা বাড়ানোর যৌক্তিক হবে না। কারণ বাংলাদেশে খুব কম মানুষই কর দেয়। ফলে করের ভেতরে যারা এসেছেন, তাদেরকে করের আওতা থেকে বের করে দেওয়া সঠিক সিদ্ধান্ত মনে করি না। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন স্তর ১০ শতাংশ। এটি কমিয়ে সাড়ে ৭ শতাংশ করা উচিত।

যুগান্তরঃ এ বছর কৃষক ধানের ন্যায্য মূল্য পায়নি। আগামীতে উৎপাদনে এর কী প্রভাব পড়তে পারে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ জিডিপির অন্যতম মৌলিক খাত হলো কৃষি। চলতি মৌসুমে কৃষকের অনেক বড় ক্ষতি হয়েছে। কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়নি। প্রশ্ন হলো, এই অবস্থা কেন সৃষ্টি হলো। আমরা পরিষ্কারভাবে দেখেছি, সরকারের নীতি এবং সময়মতো পদক্ষেপ না নেওয়ায় অবস্থা বেশি গুরুতর হয়েছে। কারণ মূল্য নিয়ন্ত্রণে চাল আমদানি শুরু করলো সরকার। কিন্তু কখন এই আমদানি বন্ধ করতে হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে বিষয়টি নজরদারি করার দায়িত্ব যাদের ছিলো, তারা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করেনি। সাম্প্রতিক সময়ে আমদানি বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এবার এর সুফল আর কৃষক পাবে না। অন্যদিকে, কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করেনি। আমরা পণ্য মূল্য কমিশন করার জন্য বারবার বলে আসছি। এতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাইরে উৎপাদক, ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সমন্বয় করে আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে দাম নির্ধারণ করতে পারে।

৯ জুন ২০১৯
যুগান্তর

বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে চাঞ্চল্য দেখা যায়নি

মোস্তাফিজুর রহমান

বেসরকারি খাতে ঋণের চাহিদা তেমন নেই। এ জন্য অবকাঠামো সমস্যা, গ্যাসের অপ্রতুলতা ও পরিবেশগত অনিশ্চয়তা দায়ী। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত করা প্রয়োজন।

বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে নানা বাধা রয়েছে। আমরা বেসরকারি খাতের বিনিয়োগে চাঞ্চল্য আনতে পারিনি। বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হলে একটি চাঞ্চল্যকর পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এটি করতে পারলে বেসরকরি খাত উজ্জীবিত হতো, ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পেতো। এ জন্য গত মুদ্রানীতির প্রক্ষেপণও অর্জিত হয়নি। বিনিয়োগ পরিবেশের অনেক কিছুই মুদ্রানীতির আওতায় নেই। তাই বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ বাড়াতে আইনিসহ বিবিধ খাতের সংস্কার করতে হবে। ব্যবসায়ীদের অনিশ্চয়তা থেকে বের হওয়ার পরিবেশ দিতে হবে। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ না হলে বিনিয়োগ হবে কীভাবে।

১ অগাস্ট ২০১৯
শেয়ার বিজ

আগে চামড়া রপ্তানির ঘোষণা দিলে এ অবস্থার সৃষ্টি হতো না

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে এবার মহাসংকট দেখা দিয়েছে। ভালো দাম না পাওয়ায় অনেকেই চামড়া নদীতে ফেলে দিয়েছেন এবং মাটিতে পুঁতে ফেলেছেন। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের মূল্যবান চামড়া শিল্প। বিষয়টি নিয়ে অর্থনীতিবিদ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, আরো আগে থেকে চামড়া রপ্তানির ঘোষণা দিতে হতো, তাহলে এ অবস্থা তৈরি হতো না। এ বিষয়ে তিনি আরো অনেক কথা বলেছেন। তার সাক্ষাৎকারের বিশেষ অংশ নিচে দেওয়া হলো। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এসএম আলমগীর খোন্দকার।

তিনি বলেন, সাধারণত নিয়ন্ত্রিত বাজার, যেগুলোতে সরকার মূল্য নির্ধারণ করে দেয়, সেসব ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের পর বাজার পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন পড়ে। যথাযথ মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে কিনা সেগুলো তদারকি করতে হয়। চামড়া খাতের মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছিল। যেহেতু এতদিন দেশের ভেতরে পর্যাপ্ত চাহিদা ছিলো, সেহেতু চামড়া নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি। বিক্রি হয়ে যেতো সব চামড়া। তা ছাড়া সব সময় নির্ধারিত মূল্য যেহেতু তুলনামূলকভাবে ট্যানারি মালিকদের স্বার্থেই বা তাদের উপযোগী করেই নির্ধারণ করা হয়। ফলে যখন চামড়া ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে তখন এতদিন খুব একটা সমস্যা হয়নি।

আরেকটি বিষয় হলো সরকার বাজারটি নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে, এতদিন রপ্তানিও করতে দেয়নি। ফলে এ বাজারের বিক্রেতাদের এখানে চামড়া বিক্রি করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ খোলা ছিল না। সেখানেও এতদিন তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। কারণ দীর্ঘদিন থেকে চামড়ার বাজার নিয়ন্ত্রণেই ছিলো এবং বাজারে চামড়ার চাহিদাও ছিলো। তবে এই বাজারে সব সময় একটি অভিযোগ শোনা যায় – যেমন সিন্ডিকেট করে চামড়ার দাম কমানো হয়। সাধারণত নিয়ন্ত্রিত বাজারে এ রকম সুবিধাভোগী গ্রুপ দাঁড়িয়ে যায় এবং তাদের এক ধরনের প্রবণতা থাকে, যেহেতু অন্য কোনো বাজারে এ পণ্য বিক্রির সুযোগ নেই কিংবা বাজারে তেমন কোনো প্রতিযোগিতা নেই, সেহেতু এই সুবিধাভোগী গ্রুপ নিজেদের স্বার্থে বাজারে প্রভাব বিস্তার করে। এ ধরনের সুবিধাভোগী গ্রুপ এ বাজারে আগেও ছিলো, কিন্তু আগে তেমন একটি সমস্যা হয়নি কারণ চামড়ার চাহিদা ও যোগান মিলে মোটামুটি বিক্রি হয়ে যেতো এবং ভালো মূল্য পাওয়া যাচ্ছিল।

তবে গত দু-তিন বছরে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে থাকে। সাভারের চামড়া শিল্পনগরীতে ট্যানারি শিল্প স্থানান্তরের পর বিদেশি ক্রেতাদের একটি প্রত্যাশা ছিলো যে এখানে হয়তো মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, সেটি এখনও করা সম্ভব হয়নি। ফলে বিদেশি ক্রেতারা যে প্রত্যাশা নিয়ে এখানে এসেছিলেন, সে প্রত্যাশা তাদের পূরণ হয়নি অনেক বিদেশি ক্রেতাই বাংলাদেশের বাজার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এর প্রভাব পড়েছে দেশের চামড়া ও চামড়া পণ্য রপ্তানিতেও। গত দু'বছরের রপ্তানির তথ্যের দিকে তাকালে দেখা যায়, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের সার্বিক রপ্তানি কম হয় ১২ শতাংশ। এর মধ্যে প্রক্রিয়াজাত চামড়া রপ্তানি কম হয় ২০ শতাংশ, চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি কম হয় ২২ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও চামড়া খাতের রপ্তানির চিত্র প্রায় একই রকম ছিলো। এ বছরে চামড়া খাতের মোট রপ্তানি কম হয়েছে ৬ শতাংশ। এর মধ্যে প্রক্রিয়াজাত চামড়ার রপ্তানি কম হয়েছে ১০ শতাংশ, চামড়াজাত পণ্যেও রপ্তানি কম হয়েছে ২৭ শতাংশ এবং চামড়া জুতার রপ্তানি কম হয়েছে ৭ শতাংশের মতো। বিগত দু'বছরে এই নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি থাকার ফলে ট্যানারি মালিকরা বিগত বছরে যে চামড়া কিনেছে সারা দেশ থেকে তার বড় একটি অংশ তারা বিক্রি করতে পারেনি। এমনকি তারা বলছে ৪০-৫০ শতাংশ মজুদ রয়েছে পুরনো চামড়া। এই চামড়া বিক্রি করতে না পারায় ট্যানারি মালিকদের হাতেও পর্যাপ্ত টাকা আসেনি। তা ছাড়া চামড়া বিক্রি করতে না পারায় আগের বছর নেওয়া ব্যাংক ঋণও পরিশোধ করতে পারেননি ট্যানারি মালিকরা। ফলে একদিকে তাদের হাতে পর্যাপ্ত টাকা নেই, অন্যদিকে ব্যাংকও তাদের নতুন করে ঋণ দিচ্ছে না। এ চক্রের ভেতরে পড়ে ট্যানারি মালিকদের হাতে এবার পয়সার ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বিগত বছরের মজুদ চামড়ার সঙ্গে যদি আমদানিকৃত চামড়া যোগ হয় এবং সিনথেটিক লেদারের ব্যবহার যদি বাড়তে থাকে, তাহলে প্রাকৃতিক চামড়ার চাহিদা কিন্তু কমে যাবে। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। এবারের ঈদে যে পরিমাণ চামড়ার যোগান হয়েছে তার সব কেনার মতো অবস্থা ট্যানারি মালিকদের নেই। কারণ গত বছরেরই অনেক চামড়া মজুদ আছে, গত বছর প্রায় ১১১ মিলিয়ন ডলারের চামড়া আমদানি হয়েছে, যার মূল্য ৯০০ কোটি টাকারও বেশি। সে সঙ্গে সিনথেটিক লেদারের ব্যবহার বাড়ায় প্রাকৃতিক চামড়ার চাহিদা কমেছে। তা ছাড়া মানুষের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোরবানি দেওয়ার হারও বাড়ে। এবারও অনেক বেড়েছে। বলা হচ্ছে এবার ১ কোটি ২০ লাখ পশু কোরবানি দেওয়া হয়েছে। এত পরিমাণের চামড়া কেনার মতো অবস্থা বাজারে ছিলো না। সুতরাং চামড়া রপ্তানির সিদ্ধান্ত নিতে হতো অনেক আগেই। সরকার এমন সময় চামড়া রপ্তানির ঘোষণা দিয়েছে, যখন আসলে বাজারে প্রভাব ফেলার কোনো সুযোগ ছিলো না। আগে থেকে যদি এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো তাহলে এবারের কোরবানির চামড়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব দেখা যেতো।

তিনি বলেন, এবার চামড়া বাজারে যে পরিস্থিতি হয়েছে, কিছুদিন আগে ধান-চালের বাজারে যে রকম অবস্থা হয়েছিল তর সমরূপ। সমরূপ এ অর্থে বাংলাদেশে কৃষি এখন ঘাটতি কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত কৃষিতে যাচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আমদানি। চামড়ার ক্ষেত্রেও ঠিক একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই যে উদ্বৃত্ত চামড়া হচ্ছে এই পরিস্থিতি আগামী বছরগুলোতেও থাকবে, যদি না চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে উল্লখযোগ্য প্রবৃদ্ধি দেখতে না পায়। সহসাই যে রপ্তানিতে বড় প্রবৃদ্ধি হবে সেটিরও কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। সুতরাং আবার চামড়া উদ্বৃত্ত হবে এবং রপ্তানির প্রয়োজন হবে।

এবার অনেকটা বাধ্য হয়ে মাঠ পর্যায়ের ফড়িয়া বা আড়তদারদের চামড়া ফেলে দিতে হয়েছে বা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়েছে। তাদের এভাবে চামড়া ফেলে দিতে হতো না, যদি চামড়ার সাপ্লাই চেইনে চামড়া সংগ্রহের মেসেজটি ঠিকমতো যেতো। যেহেতু এবার ট্যানারি মালিকদেরও চামড়া কেনার মতো পর্যাপ্ত অর্থ ও প্রস্তুতি নেই, আবার আড়তদাররাও ট্যানারি মালিকদের কাছ থেকে আগে থেকে সে রকম কোনো প্রতিশ্রুতি পাননি চামড়া ক্রয়ের, সে কারণে আড়তদাররা ঠিকমতো চামড়া কেনেননি এবার। সে কারণে আগে থেকে একটি প্রস্তুতি নিতে হতো চামড়া রপ্তানির। ’৯০-এর দশক পর্যন্ত চামড়া রপ্তানি করা হতো। আমার মতে পুরো চামড়া যেহেতু ব্যবহারের মতো অবস্থা এখন নেই, সেহেতু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে চামড়া রপ্তানির অনুমতি দেওয়া দরকার। দুই বছর আগেই আমি চামড়া রপ্তানির কথা বলেছিলাম।

তিনি আরো বলেন, ট্যানারি মালিকরা চামড়া রপ্তানির বিরোধিতা করছেন। কিন্তু তাদের বিরোধিতার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। তা ছাড়া কী কারণে তারা বিরোধিতা করছেন তার সঠিক কোনো ব্যাখ্যাও দিচ্ছেন না। তবে তারা বলছেন লবণযুক্ত চামড়া রপ্তানির অনুমতি দিলে স্থানীয় বাজারে সরবরাহ কমে যাবে। কিন্তু সেই পরিস্থিতি এবার হবে না বা নেই। সুতরাং তারা যে বলছে শিল্পের ক্ষতি হবে, তার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং রপ্তানির সুযোগ দিলে বাজারে যে সুবিধাভোগী গ্রুপগুলো আছে তারা আর বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, বাজারে তখন একটি সুস্থ অবস্থা বিরাজ করবে। তখন চামড়া নিয়ে নেগোসিয়েশন হবে, ভালো দাম পাওয়া যাবে এবং ট্যানারি মালিকদের বাকিতে চামড়া কেনার প্রবণতাও দূর হবে। সরকার চামড়া রপ্তানির যে সুযোগটি দিয়েছে সেটি ওয়েট ব্লু পর্যন্ত বিস্তৃত করা দরকার। তবে তার আগে ঠিক করতে হবে দেশের ভেতরে কী পরিমাণে চাহিদা রয়েছে সেটি নিরূপণ করে তবেই যেন নির্দিষ্ট পরিমাণে চামড়া রপ্তানির সুযোগ দেওয়া হয়।

এবারের চামড়া সংকটের জন্য সাভারের ট্যানারি পল্লীর অব্যবস্থাপনা ও অসম্পূর্ণ কাজ সম্পর্কে তিনি বলেন, এ বিষয়টি দুই ভাগে ভাগ করে বলতে চায়। একটি শর্ট-টার্ম ইস্যু, অন্যটি লং-টার্ম ইস্যু। ট্যানারি পল্লীর পরিবেশগত মানদণ্ড ঠিক করা একটি দীর্ঘকালীন বিষয় এবং সমস্যাটি এ বছরের নয়, বিগত কয়েক বছর ধরেই আমরা দেখছি। এখানে অবশ্যই বলতে হবে ট্যানারি পল্লীকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটি করা হয়নি। এ বিষয়ে ট্যানারি মালিকদের অভিযোগ বিসিক এ কাজে অভিজ্ঞ না, তারা ঠিকমতো কাজ করতে পারেনি। তবে এক্ষেত্রে মালিকরাও দায় এড়াতে পারেন না। শুরু থেকে এটির সঙ্গে তাদেরও যুক্ত থাকা দরকার ছিলো এবং বিশ্বের লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপকেও এর সঙ্গে যুক্ত করা দরকার ছিলো। তাহলে কিন্তু প্রকল্পের বাস্তবায়ন আরো ভালো হতো এবং এখানকার এ অবস্থার তৈরি হতো না।

১৮ আগস্ট ২০১৯
সময়ের আলো

অধ্যায় ৪

যুব কর্মসংস্থান

কর্মক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার কী হতে পারে?

সৈয়দ ইউসুফ সাদাত

বর্তমানে একজন লিফট অপারেটরের কাজ বড়ই অদ্ভুত। একটি ছোট, আবদ্ধ জায়গার ভিতরে একটি টুলে বসে থাকা ছাড়া তার কোনো কাজ নেই। আগের যুগে এই কাজের জন্য বেশ কয়েকটি দক্ষতার প্রয়োজন হতো। তখন লিফটগুলো ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে একটি বড় লিভারের সাহায্যে পরিচালিত হতো। লিফট অপারেটরের দায়িত্ব ছিলো লিফটের গতি নিয়ন্ত্রণ করা। তাকে খেয়াল রাখতে হতো যেনো লিফটটি সব সময় মেঝের সমান্তরালে এসে থেমে যায়। কাজটি ছিলো অনেকটা বিমান অবতরণের মতো উত্তেজনাপূর্ণ। আজকাল বেশিরভাগ লিফট কেবলমাত্র একটি বোতামে চাপ দিয়ে ব্যবহারকারী নিজেই চালাতে পারে। বর্তমানে লিফট অপারেটরদের হাবভাবে বোঝা যায়, তারা একটি বিব্রতকর পরিস্থিতিতে আছে। তাদের এক সময়ের ব্যস্ততাপূর্ণ পেশাটি এখন একটি একঘেয়ে কাজে রূপান্তরিত হয়েছে। ভবিষ্যতে কেবল হাতে গোনা কয়েকজন লিফট অপারেটর প্যারিসের আইফেল টাওয়ার বা টরন্টোর সিএন টাওয়ারে কাজ করতে সক্ষম হবে। লিফট অপারেটররা জানে তাদের দিন ফুরিয়ে আসছে।

এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি কেবল লিফট অপারেটররা একা নয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব প্রযুক্তিতে এমন এক জোয়ার এনেছে যা তুমুল গতিতে এগিয়ে চলেছে। আধুনিক প্রযুক্তির আবির্ভাবের কারণে পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে। এমনকি সে কারখানাগুলোতেও এর প্রভাব পড়েছে যেটি আগে অসম্ভব বলে মনে করা হত। যেহেতু এটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে যন্ত্রের অগ্রগতি রোধ করা যাবে না, তাহলে কি এখন কায়িক শ্রম ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজে পরিত্যক্ত ঘোষণা হবে?

বর্তমানে যন্ত্র প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের কাছ থেকে কাজ কেড়ে নিচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট প্রায় প্রতিটি দেশে আগের চেয়ে সহজলভ্য হয়ে উঠছে। এখন বাস, গাড়ি, ট্রেন চালক ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে সক্ষম। সুপার কম্পিউটার দাবা খেলায় এখন গ্র্যান্ডমাস্টারদের হারিয়ে দিচ্ছে। মানুষ কম্পিউটারকে চিনতে পারার চেয়ে বর্তমানে কম্পিউটার মানুষকে ভালো চিনতে পারে। এজন্য ফেসিয়াল রিকগনিশন টেকনোলজিকে ধন্যবাদ দিতে হয়। প্রোগ্রাম করে নিয়ে চিত্রাঙ্কন এবং সংগীতের মতো সৃজনশীল কাজগুলোও শীঘ্রই কম্পিউটারের সাহায্যে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

দ্য ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধ অনুসারে ২০১৭ সালে চীনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবটের ব্যবহার ৫৯ শতাংশ বেড়েছে। কিছু চীনা তৈরি পোশাক (আরএমজি) কারখানায় মেশিনের আধিপত্যের ফলে শ্রমিক ছাটাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। সামরিক বাহিনীর জন্য তৈরি ক্যামেরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে কাপড়ের ত্রুটি স্ক্যান করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে চীনে তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে কেবল শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে না, পাশাপাশি চাকরির ধরণেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। আগে একঘেয়ে কাজ করা শ্রমিকরা এখন আরো ভালো মেশিন ডিজাইনের কাজে ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তা করছে।

যন্ত্রের ব্যবহার ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের শ্রমবাজারকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। কিছু তৈরি পোশাক কারখানায় রোবট চালু করা হয়েছে। এক্সেস টু ইনফরমেশন (a2i) থেকে প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে যন্ত্র বা অটোমেশনের কারণে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের ৬০ শতাংশ কাজ ২০৪০ সালের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে। যন্ত্রের ব্যবহার ভবিষ্যতে আরো বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রমিক অধিকার বিষয়ক সংগঠন, পরিবেশবাদী সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক সম্মতি আইনের চাপের কারণে বর্তমানে দেশে স্থাপিত প্রচুর সংখ্যক তৈরি পোশাক কারখানা টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে। এর সম্ভাব্য ফলাফল হিসেবে ভবিষ্যতে তৈরি পোশাক কারখানার সংখ্যা হ্রাস পাবে। বেশিরভাগ ছোট কারখানা হয় বন্ধ করতে বাধ্য হবে অথবা বড় কোম্পানিগুলো তা অধিগ্রহণ করে নেবে। এর ফলে বাজারের শেয়ার আরো ঘনীভূত হবে।

যেহেতু আকারে বড় তৈরি পোশাক কারখানাগুলো টিকে থাকবে তাই তারা তাদের উৎপাদনশীলতা এবং লাভ বাড়ানোর জন্য যন্ত্র ব্যবহারে প্রচুর পরিমাণ বিনিয়োগ করবে। প্রযুক্তি ব্যবহার কারখানার আকারের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের

বড় কারখানার ৪৭ শতাংশে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়, যেখানে মাঝারি পর্যায়ের কারখানাগুলোতে তা ব্যবহার করা হয় ২৫ শতাংশ।

যন্ত্রের কারণে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলোর ক্ষেত্রে এই আশঙ্কা বেশি। উৎপাদন প্রক্রিয়ার একেবারে নিচের দিকের শ্রমিক, যাদের বেশিরভাগই মহিলা, তারা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কারণে চাকরি হারানোর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। অন্যদিকে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করবে। যন্ত্রের চালক এবং মেরামতের জন্য দক্ষ টেকনিশিয়ানের প্রয়োজন হবে। যেসব কর্মীর প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ রয়েছে, যাদের পুরুষ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তারা এই চাকরী গ্রহণ করবেন। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার একদলকে বিজয়ী এবং অপর দলকে পরাজিত করবে এবং পুরুষ ও মহিলার কর্মক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্যকে আরো বৃদ্ধি করবে। তাই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার কেবল কর্মসংস্থানই নয়, লিঙ্গ সমতার জন্যও মারাত্মক হুমকি।

এই প্রেক্ষাপটে দেশগুলোকে পণ্য উৎপাদন এবং রপ্তানিতে বিশেষ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা উচিত, যেন তারা তুলনামূলকভাবে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের উপাদানটি ব্যবহার করতে পারে। অন্য কথায়, পুঁজি সমৃদ্ধ দেশগুলোর উচিত এমনভাবে পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করা যেন তাদের মূলধন সুরক্ষিত থাকে। আবার শ্রম সমৃদ্ধ দেশগুলোর উচিত এমন প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করা, যেনো তাদের শ্রমিক সুরক্ষিত থাকে। বাংলাদেশ একটি শ্রম সমৃদ্ধ দেশ হওয়ায় তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিতে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা এখনো পর্যন্ত শ্রমিকবান্ধব। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ফলে কারখানাগুলো যদি পুঁজি নির্ভর হয়ে যায়, তাহলে বাংলাদেশকে এমন এক পদ্ধতির সন্ধান করতে হবে যা তার প্রচুর তরুণ শ্রমশক্তি টিকিয়ে রাখার জন্য সহায়ক হবে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের উত্থানের অর্থ হলো নীতিনির্ধারকগণের বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজানেরা সময় এসে গেছে, একই সাথে ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য নতুন ক্ষেত্র নিয়ে ভাবতে হবে।

[*অনূদিত*]

১৯ জানুয়ারি ২০১৯
দ্য ডেইলি স্টার

How much has the youth gained from growth?

Fahmida Khatun

If one asks owners or chief executives of companies and organisations to single out one difficulty that they face, a chorus of voices will respond in unison: lack of skilled human resources. On the other hand, if one investigates into the one prominent challenge for the economy at this very moment, many would point to the lack of employment opportunities for the youth.

Bangladesh is a country of about 160 million people. The share of population within 15-24 years is close to 20 per cent and the median age of its people are a little over 26 years. Thus Bangladesh is uniquely positioned to reap the benefits of this "demographic dividend". But how many of them have the opportunity to enter the labour market? According to official statistics, overall unemployment rate is 4.2 per cent in Bangladesh. However, youth unemployment rate is 10.6 per cent. What do these young people do? Are they studying? Are they going through training? No, not all of them. The share of youth from within the total youth population in the country who are neither in education, nor in employment or training (NEET) is 29.8 per cent.

Bangladesh's economic growth has been consistently high during the past decade. In fiscal year 2018, it reached a record high of 7.86 per cent, a growth that has only been matched by China and India—two economic

giants. However, our economic growth has not kept up with the rate of job creation for our young workforce. These youth could be in NEET due to the lack of quality jobs or they could be struggling to be in education and training. Ironically, young people who are more highly educated face greater problems in securing a job. According to the Labour Force Survey 2016-17, unemployment among the youth who have received secondary level education is as high as 28 per cent. Unemployment rate among those who have received tertiary level education is 13.4 per cent. Higher unemployment among the educated youth is both due to insufficient regular salaried jobs and their unwillingness to join low paid informal jobs. In Bangladesh more than 80 per cent of jobs are in the informal and unorganised sectors which are low paid. Whatever the reason is, the reality is that education is not empowering the youth with the right skills-set to be employable in the job market. Thus the country is being deprived of much contribution from this large workforce since the full potential of this young population remains unutilised.

But we have to recognise that youth unemployment is a multidimensional problem. If not addressed, the problem can become a threat to social, economic and political stability of a country. Not only can it lead to demoralisation, depression, loss of self-confidence and social exclusion but it also brings stress to societies and families. Research has shown that crime rates are positively related to youth unemployment.

The solution to such high youth unemployment lies in the very structure of the economy and the education system. The structure of employment generation in Bangladesh is such that the industrial sector accounts for 20.4 per cent, while the service sector creates 39 per cent of total employment. The rest 40.6 per cent employment is in the agriculture sector, even though agriculture's share in GDP is less than 14 per cent. So non-agricultural sectors have to create more opportunities for employment. Though the manufacturing sector has potential for higher opportunities, the sector is increasingly feeling the pressure of being automated to increase productivity and remain competitive. This means that labour intensity will decline. But if the scale of operations is expanded, there may be need for more workers. Without skills

development and training, the existing workforce will not be able to cater to the demand of the newly emerging job market.

Another prospective area is small and medium enterprises. Recently, a number of start-ups have emerged which is another source of employment. Innovative and dynamic young people are creating jobs for others instead of looking for secure jobs for themselves. These have to be backed by favourable policy measures including access to finance, better infrastructure, improved logistics and fiscal incentives. The government has to formulate concrete plans so that rapid growth is accompanied by high quality and more productive employment.

In the face of low employability of our young workforce the gap is being fulfilled by hiring skilled people from neighbouring countries. So, quality of education and appropriate skills are basic requirements for increased opportunity for the youth. Investment in education sector must be raised from its current level of only two per cent of the GDP. Also, the private sector has to provide skills development by offering apprenticeships and setting up training institutes. Experiences in other countries show that technical and vocational training increases the possibility of finding jobs for both the educated and uneducated unemployed. Sector specific skills and knowledge are needed for developing their capability, improving productivity and building entrepreneurship.

During the latter half of the 20th Century, East Asian countries were able to take advantage of their demographic dividend and grow very fast. At present in many developed countries, people are aging fast resulting in economic slowdowns in those countries. In Bangladesh, if the youth workforce is engaged in economic activities of the country in a well-coordinated manner they can contribute to increased income, more savings, higher productivity and faster economic growth. With rapid economic growth and several opportunities emerging, a change is on the horizon for Bangladesh. Let the youth be a part of this positive change.

12 March 2019

The Daily Star

Time to address youth unemployment

Fahmida Khatun

Creating employment for its large young population is one of the major policy challenges in Bangladesh at this moment. According to the Labour Force Survey 2016-17 of the Bangladesh Bureau of Statistics, the national unemployment rate is 4.2 per cent. However, youth unemployment rate is 10.6 per cent, more than two and a half times the national average. The survey also reveals that the share of unemployed youth in total unemployment is 79.6 per cent.

Ironically, unemployment rate seems to be high among youth with higher education. For example, unemployment rate is 13.4 per cent among youths having a tertiary level education and 28 per cent among youths having secondary level education. This striking feature of the unemployment situation in the country indicates that education offered by our institutions cannot empower the youth with income and decent living, as one would have expected. The other aspect of youth unemployment is the existence of NEET, that is, youth who are "Not in Education, Employment, or Training". Youth NEET is as high as 29.8 per cent.

Where does the problem lie? Talk to an employer. You will learn how eager they are to make good recruitments. In desperation, they choose

to hire from abroad providing high benefit packages. In a country with a large population size, we cannot find enough employable youth! One would have expected that a country such as ours, where we have a large share of young population, would benefit from "demographic dividend". That is, with a high share of working-age population, the ratio of dependent population would decline. Thus, it is imperative that policymakers give more attention in engaging this young workforce in productive activities.

Not only can this increase economic growth further, but can solve many social problems including demoralisation, depression, social exclusion and crime. Most importantly, it will also help in reducing inequality, a phenomenon that Bangladesh has to address proactively. We should also not overlook the political threat of prolonged and high unemployment. Thus keeping the multidimensional implications of youth unemployment in purview, we have to address the issue right now.

But the recognition of youth unemployment as an emerging problem for the economy is absent in our policies. The national youth policy 2017 has paid inadequate attention on employment creation for the youth. There is no concrete plan of action for generating employment for young people in the policy. Of course, given that the private sector's contribution is higher in the economy, the major source of employment will have to be the private sector. The government has to provide policy support towards creating more jobs there.

While talking of creating opportunities, quality of education and skills come to the forefront. Graduates coming out of universities do not meet the expectation of employers. Conversely, job seekers find jobs that are low paid and informal in nature. Youth unemployment in many advanced countries has been solved by technical and vocational skills. Not everyone has to go to universities. But in Bangladesh, poor families would even sell land and valuables—often their last resort for emergencies—to send their children (mainly sons) to universities. Little do they know that the certificate is only a piece of paper when they cannot enter the highly competitive job market with the type of education they receive. This mentality has to change. We should rather

focus on the comparative strength of every individual. The need for skill development is being pronounced loudly.

There is the National Skills Development Council, there are private sector and non-government sector initiatives for skills development. But here again, expectation of employers is not met fully. Skills are not forward-looking—which not only would think of the country's job market, but also outside Bangladesh, and not only for the present, but for the future. We have to take into account the emerging realities, such as the fourth industrial revolution which threatens to take away many jobs, but also holds potential for creating new ones. There should also be access to information on job opportunities, and transparent recruitment policy of organisations.

Given the limited size of the labour market, self-employment should be actively promoted. Opportunities for becoming entrepreneurs ought to be accessible to all aspiring youth across the country, both in urban and rural areas. Globally, start-ups have significantly changed the landscape of job markets. We are observing such a wave in Bangladesh too, but at a rather slow pace. Access to fund and knowledge can help the dynamic and ambitious youth flourish in this arena.

Of course, one of the structural issues of job creation is the lack of adequate investment in the economy. With private investment hovering around 23 per cent of gross domestic product (GDP) for the last couple of years, adequate job creation is impossible. Lack of domestic private investment is not encouraging foreign direct investment (FDI). Though foreign investors are showing a lot of interest in investing in an emerging economy such as Bangladesh, the realisation of such interest is still much less. It is common knowledge that FDI flows in countries which provide enabling policies, better infrastructure, skilled human resource and corruption free environment. However, ease of doing business index for Bangladesh indicates that foreign investors are yet to be adequately confident to invest here.

Our economy, as it stands now, is on a fast-paced journey. With steady high growth in the last decade, the country has experienced positive

economic and social spillovers. However, youth unemployment could hamper further progress in the medium term. The materialisation of the aspiration to become a developed country by 2041 will also depend on maximising the potential of young people, as human capital is our key resource.

22 September 2019
The Daily Star

যুব কর্মসংস্থান ও বাজেট

তৌফিকুল ইসলাম খান

এটি পুরোপুরি সত্য নয় যে, সরকারের সক্ষমতা কম বলে বাজেট বাড়ানো হচ্ছে। ব্যাপারটি এরকম নয় যে, অর্থবছরের শুরুতেই পুরো টাকা দিয়ে দেওয়া হয় আর সারা বছর ইচ্ছেমতো খরচ করা হয়। বরং খাতভিত্তিক স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয় বাজেট কোথায় ও কীভাবে ব্যয় করা হবে, আর সেগুলো পুনরায় বরাদ্দের কোনো সুযোগ নেই।

আমাদের মতো অর্থনীতির দেশে যে বাজেট দেওয়া হয়েছে, উন্নয়নের চাহিদা অনুসারে তা বেশি বড় নয়। এই বাজেট আরো বড় হওয়া উচিত। আমরা জিডিপির ১৭ শতাংশের সমান সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ দিচ্ছি; কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানের উন্নয়নের অবস্থা বিবেচনায় এতে ন্যূনতম ২০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা বাস্তবায়ন করতে পারছি আসলে ১৩ শতাংশ। এসবের প্রভাবে যেখানে যত বেশি বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন, সেখানে ততো দিতে পারছি না। যেমন, শিক্ষা খাত ও স্বাস্থ্য খাত। সারাবিশ্বের তুলনায় আমরা স্বাস্থ্য খাতে সবচেয়ে কম বরাদ্দ দেই। আবার অন্যদিকে, নিজ পকেট থেকে স্বাস্থ্য খাতে খরচের বেলায় বাংলাদেশ সবচেয়ে আগে। এই বিষয়গুলোর দিকে নজর দেওয়া দরকার। এর কারণ শুধুমাত্র ব্যয়ের ক্ষেত্রেই আমরা অক্ষম তা নয়, বরং আয়ের বেলায়ও অক্ষম।

ব্যয় করার সময় লক্ষ্য রাখা জরুরি আমরা আসলে সঠিক খাতে ব্যয় করছি কিনা। সময়মতো প্রকল্প শেষ করাও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ, দেরী হলেই খরচের পরিমাণ বেড়ে যায়। যেমন, বেশি মজুরি প্রদান। তাছাড়া একটি প্রকল্প সময়মতো সম্পন্ন হওয়ার উপর অন্য প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। প্রকল্প দেরীতে সম্পন্ন হলে বেসরকারি

খাতগুলো বিনিয়োগে ঝুঁকি এড়াতে চাইবে। ফলে সরকারি বিনিয়োগ বাড়লেও বেসরকারি বিনিয়োগ আশাব্যঞ্জকভাবে বাড়ছে না। অন্যদিকে, সময়মতো সরকারি কাজ প্রকল্পের শেষ হলে বেসরকারি খাতও সময়মতো বিনিয়োগে উৎসাহ পাবে এবং দ্রুত অনেক নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

বাংলাদেশে আমরা বর্তমানে জনমিতিক সুবিধা (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) উপভোগ করছি, কিন্তু এটিকে আগামী বিশ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে না পারলে এ সুবিধা আর কাজে লাগানো যাবে না। ২০১৩ সালের দিকে শ্রমবাজারে লোক প্রবেশ করতো প্রায় ১৮ লাখ। কিন্তু ২০১৬ সালে শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণের ধারা কমে গেলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ১৪ লাখ। সম্ভবত নারীরা নিরাপদ ক্যারিয়ার এবং কাজের সুষ্ঠু পরিবেশের অভাবে শ্রমবাজার থেকে ঝরে পড়তে থাকে। জনমিতিক সুবিধাকে কাজে লাগাতে হলে কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, শ্রমবাজারে বেশি বেশি দক্ষ যুবদের আসতে হবে। ফলে আমাদের বাজেট ও জাতীয় অর্থনৈতিক সম্ভাবনার মাঝে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যা আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

বাজেটের লক্ষ্যগুলো কীভাবে অর্জিত হবে তা স্পষ্ট করা উচিত। বাজেট নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না। কেননা নতুন সরকারের জন্য বাজেট দ্রুত বাস্তবায়নের যে তাড়া থাকা উচিত, সেটি ছিল না। যুব উদ্যোক্তাদের জন্য ১০০ কোটি টাকার নতুন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীভাবে এটি ব্যয় করা হবে সেটি এখনো খুবই অস্পষ্ট এবং বিস্তারিত সকলের অজানা। বাজেট প্রণয়নের সময় একটি স্পষ্ট ও বিস্তারিত রূপরেখা থাকলেই কেবল আমরা আমাদের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে পারবো। অন্যথায়, বাজেটে নেওয়া এ ধরণের উদ্যোগ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য বিবরণ তৈরি করতে আরো ছয় মাস লেগে যাবে এবং এর বাস্তবায়নও মন্থরগতিতে হবে।

এটি সত্য যে, সরকার একা ৩ কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারবে না। সরকার অবকাঠামোগত সহায়তা দেবে, আর বেসরকারি খাতগুলোকে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অবদান রাখতে হবে। প্রতিবছর ১৪ লাখের মতো লোক শ্রমবাজারে ঢুকছে, আর ৬ থেকে ৭ লাখের মতো বিদেশে যাচ্ছে। ৩ কোটি সর্কসংস্থানের সুযোগ তৈরি হলেও বর্তমান হারে আগামী ১০ বছরে ৩ কোটি মানুষ কিন্তু শ্রমবাজারে প্রবেশ করবে না। বিশাল সংখ্যক নারীদেরকে শ্রমবাজারে আনার জন্য সরকারের এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা আছে। সুতরাং দেখার বিষয় আমরা এখন নারীদের জন্য নিরাপদ ক্যারিয়ার নিশ্চিত করে তাদেরকে শ্রমবাজারে আসতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি কিনা, আর আমাদের জনমিতিক সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারি কিনা।

পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, মুষ্টিমেয় নারীরা একটানা ২০ বছর ধরে কাজ করছে। এবং শুধুমাত্র নিম্নবিত্ত না, মধ্যবিত্ত নারীরাও নিজেদের ক্যারিয়ার গড়তে পারছে না। প্রান্তিক বিষয়গুলোও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। শ্রমবাজারে নারীদের আকর্ষণ করতে এবং তাদের ধরে রাখতে নারীদের নিরাপদ আবাসন ও পরিবহন সুবিধাদির ব্যবস্থা করা দরকার।

একই পদ্ধতিতে বাজেট বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিবছর বাজেট ১০ শতাংশ করে বাড়ানোর এই গতানুতিক পদ্ধতি বন্ধ করতে হবে। এর পরিবর্তে বাজেট বাস্তবায়নে নতুন মাত্রা যোগ করতে হবে এবং কার্যকর ব্যয় বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা বাজেটের লক্ষ্য বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কাঠামোগত কোনো উন্নতি দেখতে পাইনি। বাজেট বাস্তবায়নে সারাবছর ধারাবহিকভাবে কাজ করতে হবে।

[*ঢাকা ট্রিবিউন ও বাংলা ট্রিবিউনের অংশীদারিত্বে ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি) কর্তৃক আয়োজিত বৈঠকি আলোচনা।*]

[*অনূদিত*]

১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯
ঢাকা ট্রিবিউন

অধ্যায় ৫

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

Bangladesh's LDC graduation and its repercussions for RMG

Mustafizur Rahman

Bangladesh's least developed country (LDC) graduation, to take effect from 2024, needs to be celebrated as a recognition of the country's remarkable progress on many fronts over the past years. At the same time, there is no denying the fact that graduation will entail a number of new challenges as Bangladesh moves forwards on its post-graduation journey. Important questions that merit attention, and deserve to be closely examined, relate to the possible impacts of graduation on the country's flagship sector, the export-oriented readymade garments (RMGs) industry: what will LDC graduation mean for the future of the RMG sector in terms of its competitiveness and performance; how will the implications be felt at the enterprise level; in which ways LDC graduation will impact on how RMG entrepreneurs conduct their business and marketing; what initiatives will need to be undertaken towards technological upgrading, social compliance, labour standards and rights compliance, to address the post-graduation challenges.

Given the importance of the sector for Bangladesh's macroeconomic performance, employment, export earnings and balance of payments, not to speak of the positive implications in terms of social parameters, and overall, in projecting the brand Bangladesh to the world, answers to the aforementioned questions are of heightened interest from the

perspective of future development of not only the RMG sector, but also the overall performance of the Bangladesh economy.

Implications of LDC graduation

As is well known, LDC graduation will result in Bangladesh losing the preferential market access facilities enjoyed by the LDCs thanks to the various unilateral, and bilateral, regional and global initiatives. While the European Union (EU) has offered to extend the preferential market access for an additional three years following graduation (i.e. till 2027 in case of Bangladesh), there is no denying that future market access scenario for Bangladesh will undergo profound changes in the coming years.

In no sector will the implications of Bangladesh's LDC graduation be felt more acutely, and in such impactful ways, as the RMG sector of the country. Not only because the sector accounts for more than four-fifths of Bangladesh's total global export earnings, but also because apparels face tariff peaks in almost all key markets of Bangladesh. For example, tariffs facing Bangladesh's apparels are, on average, about 12 per cent in the EU and 16-18 per cent in Canada. Accordingly, the depth of preference erosion will be significantly high in case of exports of RMG items from Bangladesh.

It is also to be noted that the rules of origin (RoO) for preferential access of apparels exported by the LDCs tend to be highly LDC-friendly (e.g. only a single stage conversion requirement in the EU and a flat 25 per cent domestic value addition requirement in Canada). Graduation to non-LDC developing country status will also mean that the RoO are going to be more stringent. Thus, on both counts, LDC graduation will require the apparels sector to face new challenges. There will also be implications in the form of preference erosion currently enjoyed by Bangladesh as a member of regional trading arrangements such as the South Asia Free Trade Area (SAFTA), where India, for example, offers duty-free quota-free (DF-QF) market access to the four LDC members for all products including the apparels or the LDC scheme run by China. Indeed, apparels feature prominently in all the 40-odd preferential schemes

from which Bangladesh currently benefits [excepting the United States (US) Generalised System of Preferences (GSP) scheme which does not include most of the apparels items exported by Bangladesh; however, in any case, US had withdrawn the GSP facility for Bangladesh following the Rana Plaza tragedy in 2013].

Estimates carried out at the Centre for Policy Dialogue (CPD) indicate that Bangladesh's exports will face an additional tariff of about 6.7 per cent, on average, once the current DF-QF market access is no longer available. The corresponding figures for the EU, non-EU and Canadian markets are 8.7 per cent, 3.9 per cent and 7.3 per cent respectively. Thus, preference erosion and more stringent rules of origin will adversely, and significantly, impact the competitiveness of Bangladesh's apparels exports to the global market. The market signals are quite clear: business as usual scenario is going to fundamentally change and business as usual mind-set will also have to change profoundly.

Some of the competitors of Bangladesh are going for aggressive regional trading arrangements (RTAs), with serious implications for our RMG sector. Mention may be made in this connection of the Vietnam-EU free trade agreement (FTA) which will allow a major competitor of Bangladesh (Vietnam) to access the European market on duty-free terms. This will eliminate the preferential margin that Bangladesh currently enjoys vis-à-vis Vietnam, a non-LDC developing country, in the EU market. Indeed, there may be a time, beyond 2027, when Vietnam's apparels would have duty-free access to the EU market while apparels exported by Bangladesh would need to enter duty-paid (if the current scenario prevails). Aggressive foreign exchange policies pursued by competitors could bring new challenges for the RMG industry of Bangladesh.

RMG performance will also be impacted by indirect factors. For example, LDC graduation will have implications arising from stringent compliance requirements under the trade-related intellectual property rights (TRIPS) of the World Trade Organization (WTO), as also from changes in the support regime concerning the enhanced integrated framework (EIF) and the various special and differential treatment provisions of

the WTO. In the past, the RMG sector has benefited from the technical assistance and capacity building support received by Bangladesh as an LDC; these will no longer be available.

Meanwhile, minimum wages in the RMG sector will, justifiably, continue to rise at a time when the sector will be facing the challenges mentioned above. Cost of borrowing by Bangladesh is rising already because of its recently acquired middle income status; competing development demands and prevailing domestic resource mobilisation performance could mean that fiscal space for the type of incentives that the RMG sector has been traditionally enjoying could shrink in future.

The upshot of the discussion is that, targeted policies and actions will need to be undertaken at macro, meso (sectoral) and micro (enterprise) levels to address the emerging challenges facing this flagship sector of the country.

Going forward: Addressing the challenges

Bangladesh will need to pursue negotiations in various fora, jointly with other graduating LDCs, to secure their common interests in view of the emerging challenges. The country's policymakers will have to take a proactive stance in the WTO and lead the effort to design a package of support towards sustainable graduation of the LDCs. Such a package should include targeted initiatives in areas concerning preferences (continuation), aid for trade (additional) and special and differential treatment (in selected areas of interests to these countries), at least for a few additional years. Already the idea of a package of support for graduating LDCs has been mooted in various global fora. This idea is very much in line with the UN 2005 resolution which asks members to extend support towards sustainable graduation of the graduating LDCs. Indeed, it was in response to this resolution that the EU offered the graduating LDCs a three-year extension of the preferences under its everything but arms (EBA) initiative. The proposed package would have provided the graduating LDCs and their apparels sectors a much-needed breathing space as they embark upon their post-graduation journey. Support for

LDC graduation as part of South-South Cooperation is another possible option. Bangladesh should take the lead in exploring the possibility of extending preferential treatment under unilateral LDC schemes, such as those run by India and China, for some years following graduation. Indeed, China extended LDC preferential treatment to Samoa following its graduation in 2014.

At the same time, Bangladesh will also need to keep in the purview its future as a non-LDC developing country, and argue in favour of strengthening market access and other special and differential provisions in the WTO in support of the developing countries.

While GSP plus is an option for Bangladesh in the context of the EU, the current eligibility criteria remain a constraint, not to speak of the provision of strict enforcement of the 27 international conventions on human rights, labour rights, environmental protection and good governance. Bangladesh will also have to be prepared to go for bilateral FTAs with key trading partners. Indeed, Bangladesh is one of the very few countries which do not currently have any bilateral FTAs. This would call for significant strengthening of analytical and negotiating capacities on Bangladesh's part. This will also require further strengthening of Bangladesh's ability to ensure compliance and enforce standards (labour, social, technical, intellectual property rights, environmental). In this regard, ability to continue pursuing the compliance initiatives undertaken as part of Accord and Alliance, on our own, at the enterprise level, will be important. An objective scrutiny of support measures and incentives in place for the RMG sector will also need to be undertaken to ensure WTO compliance, and avoid trade-related disputes once Bangladesh has graduated. Some of the measures may have to be revisited and redesigned to ensure compliance as a non-LDC.

In post-LDC Bangladesh, with the status of a middle-income country, there will be a growing demand for better enforcement of workers' rights and for gradually moving towards living wage systems of compensation. These are also aligned with the SDG aspirations of Bangladesh, particularly Goal 8 relating to decent labour.

The next few years, in the run-up to graduation in 2024, should allow Bangladesh the scope and space to design appropriate strategies and take the needed preparatory steps towards sustainable LDC graduation and sustainable transition of its RMG sector. Concerned stakeholders must demonstrate that they are both willing and able to address the anticipated post-graduation challenges. For ensuring a sustainable and robust future for the RMG sector, aligned with the aspiration of Bangladesh for graduation with momentum and sustainable LDC graduation, all concerned stakeholders will have to do the needed homework and start preparing for the post-2024 future of the RMG sector with the urgency that the attendant tasks demand.

20 September 2019
The Daily Star

Mahatma Gandhi and the Sustainable Development Goals

Debapriya Bhattacharya

The world today will celebrate the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. Twelve years back, the United Nations voted to declare the date as the "International Day of Non-Violence." When people usually speak about this iconic persona, they often highlight him as a great spiritual leader, who conceived and pursued the ideology of Satyagraha; he had been a nationalist, anti-colonial leader who paved the way for the independence of this sub-continent. Great personalities such as Martin Luther King Jr, Nelson Mandela and Barack Obama were inspired by Gandhiji's thoughts and deeds. Indeed, our national non-cooperation movement in March 1971, unleashed by the call of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, bears a strong imprint of Gandhiji's civil disobedience philosophy.

But could the Gandhian philosophy, the thoughts that are encapsulated in Satyagraha, survive the test of time? To what extent currently dominant development propositions resonate with Gandhian values and principles?

As is well known, in 2015, the global leaders assembled in New York to sign up for the 2030 Agenda for Sustainable Development, which espouses 17 Sustainable Development Goals (SDGs). The 2030 Agenda

epitomised a new consensus about a vision of human kind for the next 15 years. To establish the continued relevance of Gandhian development thoughts, it will be interesting to explore how much this agenda is aligned with Gandhian outlook and reinforce each other.

The major aspiration of the 2030 Agenda is captured by the tagline "Leave No One Behind." Gandhiji viewed that, "Progress of a society should be determined by the state of the most vulnerable and the weakest ones." People, who are furthest from the frontiers of development, are to be brought up to the level of the others for "real development." He spoke about "the weakest and the most vulnerable"—not only about the most income-poor people. This essentially echoes the concept of "multidimensional poverty," which stems from not only low-income, but also from life cycle issues, social stigma, locational disadvantages, gender disparity and other similar sources of risks.

The new global agenda has identified the fight against poverty as numero uno of the SDGs. One of Gandhiji's powerful statements reflects a similar thought where he says, "Poverty is the worst form of violence." What an extraordinary perspective on poverty which surpasses time for its unique observation.

The 2030 Agenda upholds "universality" in development discourse. Gandhiji expressed his adherence to universality through his attitude towards religion. According to Gandhiji, religion or God has no country, no colour, no caste, no creed. When asked, he said, "Yes, I am a Hindu, but I am also a Muslim, a Christian, a Buddhist and a Jew at the same time." His universal humanism, however, did not shy away from recognising existing diversity; he said, "Diversity is there, because we are not same in all ways. But diversity should never be used to justify untouchability or inequality."

The SDGs are distinguished by their emphasis on "sustainability". This idea of sustainability figures prominently in Gandhiji's teaching as well. He mentioned that, "What we do today, is our future." He also said, "We should not look upon the natural resources—water, air, land—as

inheritance from our forefathers." He considered them to be the "loan given by our next generation."

The 2030 Agenda talks about "transformative" change—including changing the way we live, produce and con-sume. Gandhiji was the epitome of personal practice of sustainable consumption and production. He underscored that for sustainability of the world, individual responsibility is important—as has been also anticipated in the SDGs. Gandhiji in his unique way mentioned, "Be the change you wish to see in the world." He wanted human beings themselves to be the major change agent in the process. A similar idea is embedded in the SDGs' theory of change.

"Human development" has now become the cornerstone of mainstream wisdom. Gandhiji reckoned health as one's "biggest wealth, not the golds and silvers". He mentioned that to eradicate hunger, people should be ensured with nourishment, i.e. healthy food. This pronouncement predates our current realisation that as we eradicate hunger, we need to ensure nutrition, particularly for children. At the same time, Mahatma held that education is a significant driver of change. For him, education is a "life-time phenomenon"; "doing away with illiteracy is not necessarily full education". The measure of education for him was the revealed amount of inner goodness or po-tentials of a person.

Nowadays, gender equality is a well-established assumption in our development discourse in general and in the SDGs in particular. The concern for gender equality was also prevalent in Gandhiji's perspectives. Almost a century ago, he said, "We should not say that women are inferior to men. It would be libel and it is a sin." In fact, he spoke quite extensively about education for women, and their social positioning. He mentioned that, "The day we will be able to say that our women are safe on the street at night—that is the day we have achieved gender equality". It only shows that how much Gandhiji was ahead of his time.

Arguably, socio-economic development is fuelled by income, employment, technology and innovation. The modern concepts of "full

employment" and "minimum income" were also quite noticeable in Gandhiji's expressed thoughts. He said that, "I do not want employment for few, I want employment for the masses." He propagated a right-based approach, which is very much in line with the SDGs, when he said that, "We need to give people a square meal based on a good work, not necessarily based on charity".

Gandhiji's explicit fascination for charka and small-scale industries also needs to be understood properly. For him, technology and innovation have to be deployed to the service of the people and create broader employment possibilities; not to be used as a means for laying off people from their jobs and generate profits for few. He looked upon rural employment and small-scale industries as a tool for eradicating poverty, bringing the rural areas on a par with the urban areas, and more importantly "localising the development" (another SDG require-ment). Remaining sensitive to the possibility of technology and innovation, he said that, "The unlimited capacity of the nature and all society to meet or demand is yet to be fully tested through technological innovation."

Gandhiji was a firm believer in the rule of law and democratic polity. He fought against colonial rule, he fought against apartheid; through that he wanted to establish human rights within its own context. For him, the rule of law was manifested through non-violence, peaceful co-existence and tolerance. He said, "You must tolerate others' thoughts, if you really believe that your thoughts are better than the others." Interestingly, the new development theories, as reflected in the SDGs, uphold that the rule of laws and accountability, have to be established not only within the country, but amongst the countries.

Gandhiji said that, "You have to look at the face of the weakest and the poorest, when you do something for them, and see whether they are taking charges of their own destiny." Essentially, he talks here about ownership, empowerment and solidarity. The Gandhian idea of solidarity and partnership is best expressed through his relationship with the colonial power in the context of joint fight against fascism during the Second World War. Under the 2030 Agenda, the world seeks to unite,

irrespective of the differences in level of development and governance structure, against the common enemy of poverty, discrimination and injustice. The "bold new world", according to Mahatma, has to do away with "politics without principles" and "commerce without morality."

Celebrated author Pearl S Buck wrote, "He was right; we all knew he was right. The man who killed him knew that he was right." The question is whether this Gandhian "force of truth" can prevail in and be a solution to our present world, which remains afflicted by violence, prejudice and unilateralism. The answer to this probably will be defined by the extent to which we will be able to deliver the new global vision of sustainable development. The Gandhian force of truth will essentially be vindicated through that delivery.

2 October 2019
The Daily Star

Sustainable development of Bangladesh: Lessons from Korea

Mostafa Amir Sabbih

Bangladesh is the land of 160 million inhabitants and one of the most densely-populated countries of the world. It has achieved significant progress in poverty reduction. In Bangladesh, the proportion of population earning below United States dollor (USD) 1.90 (PPP) per day decreased from 44.2 per cent in 1990 to 13.8 per cent in 2016. The country has also expanded on average by 6 per cent per year over the last decade, largely driven by garment exports and workers' remittances which helped the country gain the lower-middle income status in 2015. Bangladesh achieved commendable success in attaining Millennium Development Goals (MDGs), particularly MDG 1 (Eradicate extreme poverty) and MDG 4 (Reduce child mortality). It has also made significant progress in attaining gender parity and school enrollment in primary and secondary education. However, there are a number of challenges that remain for sustainable development in Bangladesh.

At the seventieth session of the United Nations (UN) General Assembly on 25 September 2015, 193 UN member states adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development. The learning of MDGs taught us that the achievement of some Sustainable Development Goals (SDGs) would require a much greater stretch in Bangladesh. Bangladesh ranked 111th out of 156 countries as per the latest SDG index (SDGI) 2018 by

the Sustainable Development Solution Network. This part outlines the key areas of challenges for sustainable development in Bangladesh.

Inadequate quality of education

Promoting quality education is the most essential factor for improving human capital and sustainable development of a country. Bangladesh has had a remarkable performance regarding the treatment of disparities in the access to education, school enrollment rates in primary and secondary levels. However, this increase in quantity was not complemented by the quality of education. The results of the National Student Assessment carried out by Directorate of Primary Education in 2011 exposed that only 25 per cent of the students could master Class 5 English competencies while only 33 per cent could master Class 5 Mathematics competencies at the end of primary school cycle. A similar result was found for the secondary school pass students. Students fail to obtain the required level of competencies due to the substandard performance in quality components, such as teacher-student ratio, the proportion of trained teachers, teacher absenteeism, and inadequate technical education system. According to Bangladesh Education Statistics 2018, there is only one teacher per 45 students in secondary schools, while only 66.9 per cent of these teachers are trained.

Unemployment and youth unemployment

One major area of concern for Bangladesh with regard to inclusive development is its persistent unemployment and youth unemployment. At the present rate of labour force growth (1.9 per cent), an additional 21 million people will enter into the labour force by 2030. This poses both a challenge and a window of opportunity in the form of demographic dividend for Bangladesh's. However, Bangladesh economy absorbed just under 50 per cent of the increase in the working age population into the economy in the period of 2000-10. According to Labour Force Survey 2016-17, still 4.2 per cent of total labour force and 10.6 per cent of youth are unemployed. Further, the 29.8 per cent of youth are not in education, employment and training. Unemployment often resulted from lack of new job creation, particularly in the industrial sector

mainly driven by inadequate private investment and existence of a large informal sector or grey economy (85.1 per cent of total employment).

Inadequate infrastructure, industrialisation and innovation

Bangladesh lags far behind other developing countries with regard to its physical infrastructure such as roads, highways, ports, transport and communication which are necessary for augmenting the private investment and economic growth. As per SDGI 2018, Bangladesh ranked very poorly with regard to its overall quality of infrastructure with a score of 2.9 in the scale of 1 (extremely underdeveloped) to 7 (extensive and efficient).

It is very difficult to sustain the pace of economic growth without a strong, diversified and highly productive industrial sector. The export industry of Bangladesh is not very much diversified and highly development on in some particular products. Based on the Herfindahl-Hirschmann Index (HHI) or concentration index, this concentration has increased in recent times with 0.40 per cent in 2018 from 0.34 per cent in 1995. Bangladesh's export basket has continued to remain development in only one product – apparels, and particularly low-end items.

Information and Communications Technology (ICT) is a good enabler of cost reduction/productivity enhancement and innovation facilitation. SDGI data suggest that the use of ICT in Bangladesh is still at its early stage. Although the number of mobile broadband subscribers increased substantially (27.1 per 100 people) over the last two decades, still only 18.2 per cent people use internet for their work or recreational purposes. Further, government expenditure on research and development (R&D) is almost non-existent and data also are not available.

Poor status of rural development

In Bangladesh, still 65.7 per cent people live in rural areas where agriculture is the dominant sector. The share of agriculture in GDP declined from 24.5 per cent in 1990 to 13.8 per cent in 2018. This presents some concerns since the largest segment (40.6 per cent) of the

labour force is still engaged in this sector. Absence of a developed product market, access to credit and other inputs as well as high transportation cost reduce farmers' profit and contribute to lower productivity. Rapid population growth in rural areas resulted in more fragmentation of land and peasant impoverishment. Further, due to the lack of opportunities to work in non-farm activities and heavy dependence only on one single crop (rice), workers tend to migrate to the urban areas and do temporary non-farm jobs.

Concerns for environmental sustainability

Bangladesh is one of the most vulnerable countries that are facing immense challenges due to climate change. Bangladesh ranked as one of the extremely vulnerable countries as per the Climate Change Vulnerability index (0.3 on a scale of 0-1). Its geophysical position coupled with highly dense population, limited resources and dependence on nature makes Bangladesh a hazard-prone country with many subsequent catastrophic events like irregular rainfall patterns, floods, flash floods, cyclones, saline intrusion, drought, sea level rise, tidal surge and water logging. Another precondition of environmental sustainability is responsible consumption and production. However, industries are causing 60 per cent of the river pollution through wilful discharge of effluent, even by those few having effluent treatment plants.

Action Agenda to address the challenges: Strategic lessons from Korea

The Republic of Korea, from being one of the aid-dependent least developed countries (LDCs) of world during the 1960's, is one of the advanced industrialised countries at present. Korea achieved this success due to its rapid economic growth (with a per capita GDP of USD 29,742 in 2017 from USD 253 in 1970). This growth was largely driven by its productivity increase in the industrial sector and its human capital investment. The evolution of Korea's ICT sector from underdeveloped to an IT powerhouse during the period of 1980-2008 played a key role towards increasing its productivity and trade competitiveness. Further, during this period, Korea also made a rapid transformation of its rural

economy through its community-based "New Village Movement". In addition, Korea has made some notable progress with regard to achieving environmental sustainability through strategic decision making. Therefore, Bangladesh, which is also one of the LDCs, expected to graduate by 2024, can take many lessons from Korean experience to address its sustainable development challenges.

Promoting quality education

Korean experience suggests that during the process, some types of trade-off between quantitative growth and qualitative improvement of education are inevitable. With Korea, during the rapid universalisation process of elementary and secondary education, the deterioration of educational circumstances occurred for a considerable amount of time. However, the quantitative expansion of education became a driving force towards policies improving education circumstances and a plus factor for educational investment. As a result, it has improved to a decent level at the present. In addition, in the early industrialisation stage where the capacity of the private sector has not yet developed, the role of the government in education, which is public in character, is very important. With Korea, government-oriented/concentrated advancement systems have been maintained all over the education system such as the single-track school system; liberalisation of training and recruiting teachers; enactment and operation of national education courses; and a national and authorised textbook system including national, public, and private schools. Such measures were very effective in securing minimal levels of quality and equality of education among regions and classes.

Building resilient infrastructure, industrialisation and innovation

Korea's success of developing modern transport infrastructure suggests that strategic plans for economic growth should be combined with transport infrastructure. The Government of Bangladesh (GoB) should adopt Public Transit-oriented policy measures through including and adapting to the Intelligent Transportation System for national/regional/urban public transport. Further, there should be a convergence and integration of the public transport system with good access and

benefit for users. Finally, there should be a clearly stated vision of the government such as promoting dense development for transit station areas, leading the urban planning by prioritising green transport and encouraging private car users to change their mode to public transport.

Korea adopted three key strategies in order to develop their industrial sector which can be important lessons for Bangladesh. These include, 1) An 'economic growth first' strategy for eradication of poverty which is similar to Bangladesh; 2) Promote export-led growth with shifting industrial strategies over time – from labour-intensive exports (current stage of Bangladesh) to Heavy & Chemical Industries investment (to upgrade exports) to human capital investment rationalisation (for export competitiveness) to FDI & R&D (to upgrade technologies); 3) Prioritise and promote early and effective development of those capabilities and assets which were essential to enable sustained economic growth.

Korean ICT revolution experience suggests that the strategy to develop the ICT sector and promote innovation should be operationalised in two phases. First phase may include testing and improving upon technologies already developed in advanced countries while the second phase should concentrate on innovation (investing more in R&D), commercialising new technologies and convergence of core technologies.

Reducing rural-urban gap and attaining inclusive growth

The success of the 'Saemaul Undong' or the 'New Village Movement' of Korea, based on values of inclusive growth and inclusive partnership suggests that it can be a good model for reducing the rural-urban gap and increasing employment opportunities. It can also be a good reference point for operationalising the SDG Localisation Framework of Bangladesh. But in order this model to be successful and sustainable in a country like Bangladesh, some preconditions are required to be met such as, creation of common values; voluntary participation of community members; upward decision making process; pooling of fund from central and local government; inclusion of low and middle income villagers and local groups; and shared prosperity. Another important precondition is a successful land reform. This model can improve

agricultural productivity through supporting small farmers; enforce value chain through providing the farmers better access to market; and promote sustainable agriculture (SDG 2) through generating non-farming income. Some of the prescribed mechanism for rural job creating by Saemaul Undong include providing microfinance to support small farmers; operating and nurturing social enterprises in villages; and rejuvenating local economy through carrying out projects in local off-seasons.

Ensuring environmental sustainability

Bangladesh can learn few strategic lessons from Korea's transformation from a Brown economy to a Green economy. Korea boasts of being the only developing country with successful reforestation (the 1960s~1980s) and currently 64 per cent land areas are under forest coverage. But the industrial success brought serious environmental pollution in the 1970s and the 1980s: rivers, soil and the air were in a state as the current situation of the capital city of Bangladesh. However, an alarm among people by the early 1990s and the shift to local autonomy (1994) prompted serious actions to address pollution. Many innovative initiatives such as the volume-based Waste Collection Fee System was introduced during that time and today Korea has one of the most modern waste collection and recycle systems in the world. Korea launched the Green Growth strategy as a national strategy in 2008 where much emphasis was put on reducing GHG emissions, lowering dependence on oil, coal and gas for energy and strengthening climate change adaptation capacity.

24 November 2019
The Financial Express

এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতির নিরিখে এবারের বাজেট দেখা উচিত

মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের যে বাজেট আসছে এবং এবারের বাজেটের যে ধরনের আকার হবে বলে মনে হচ্ছে তাতে বাংলাদেশের অর্থনীতির এখন যে চাহিদা সেটির তুলনায় খুব বড় বলে মনে হয় না। এটি মাথাপিছু হয়তো ৩০ হাজার টাকার মতো হবে। যেটি উন্নয়নশীল দেশের মানুষের মাথাপিছু যে বাজেট গড় তার চেয়ে এখনও আমাদের দেশে অনেক কম। তা ছাড়া জিডিপির হার হিসেবেও যদি ধরি সেটি ১৮ শতাংশের মতো হবে। সেটিও খুব বেশি যে বড়, তা না। বরং আমাদের চিন্তা করা উচিত, বাজেটের সম্পদ আহরণ, বণ্টন, আয়ের পুনঃবণ্টন এবং বাস্তবায়ন – এই চারটি দিকে আমাদের বেশি নজর দেওয়া দরকার। কারণ এখন যে প্রেক্ষাপটে বাজেটটি হচ্ছে, এলডিসি থেকে উত্তরণের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, এসডিজির যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। এসব বিষয় মাথায় রেখে আগামী বাজেটকে দেখা উচিত। আরেকটি বিষয় হলো – সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনারও শেষ বাজেট এটি, সুতরাং সেদিক থেকেও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বাজেট হতে হবে।

এসব বিষয়কে যদি আমরা প্রেক্ষাপট হিসেবে রাখি, তাহলে যে চারটি বিষয় উল্লেখ করলাম তার মধ্যে প্রথম বিষয়টি ছিল সম্পদ আহরণ। আমরা দেখছি এবং আমরা জানি সম্পদ আহরণের দিক থেকে আমাদের অনেক বড় ধরনের দুর্বলতা আছে এবং সেটি আরো পরিস্ফূটিত হচ্ছে। চলমান অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আহরণের যে প্রাক্কলন করা আছে সেটির চেয়ে তো কম হবেই, বরং পরে লক্ষ্যমাত্রা রিভাইজ

করেছে, সেটিও পূরণ হবে না। এবারের বাজেটে কীভাবে ভিত্তি বাড়ানো যায়, কীভাবে ভ্যাট বাড়াতে পারি, কীভাবে প্রত্যক্ষ করা বাড়ানো যায়, কীভাবে রাজস্ব আদায় আরো বাড়ানো যায় সেদিকে বেশি নজর দিতে হবে। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো – প্রত্যক্ষ করের অংশ, যেটি এখনও এক-তৃতীয়াংশ আছে। তা ছাড়া ব্যক্তি খাতের কর এক-তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ। এই জায়গায় কীভাবে আরো বাড়ানো যায়, সেদিকে এবার বেশি নজর দিতে হবে।

ভ্যাটের বিষয়ে তিনি বলেন, একবার সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছিলেন, ৬ লাখ জায়গা থেকে ভ্যাট সংগ্রহ করা হয়। ব্যাংকিং খাত, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সরকারের অন্যান্য সংস্থার কাজে যদি সমন্বয় ঘটানো যায় তাহলে হয়তো ঘাটতি কমানো সম্ভব হবে। সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে বিষয়টি উল্লেখ করবো সেটি হলো, যদিও ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে, তা ছাড়া অনলাইন ভ্যাট করার কথা ছিল – কিন্তু এ বিষয়গুলোও পিছিয়ে আছে। সুতরাং বাজেটে এ জায়গাতেও দিক নির্দেশনা দেওয়া দরকার। তৃতীয় বিষয় হলো নন ট্যাক্স রেভিনিউ কিন্তু আমাদের ২০ শতাংশের মতো। এখানেও দেখার বিষয় আছে। এখানে বিভিন্ন রকম ফি আছে, ডিউটি আছে সেগুলোকে আরো রিভাইজড করা দরকার, যুগোপযোগী করা, আদায় করা, ডিজিটাইজড করা। এসব করলেও কিন্তু আমাদের কর আদায়ের ক্ষেত্রটা বাড়ে।

তিনি বলেন, সম্পদ বণ্টনের বিষয়ে বললে বলতে হয়, সম্পদ বণ্টনের বিষয়ে তারতম্য আছে। আমাদের শিক্ষা খাতের বাজেট বরাদ্দ ২ শতাংশ আছে সেটি ৩ শতাংশে নেওয়া, ইউনেস্কো বলেছে স্বাস্থ্য খাতের বাজেট ২ শতাংশে নেওয়া দরকার। স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ মাত্র দশমিক ৭৭ শতাংশ। এসব ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে যেতে হবে, একবারে যাওয়া যাবে না। কিন্তু বিষয় হচ্ছে এসব খাতে যে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হবে, তাহলে কমানো হবে কোথায়। সরকারি ব্যয়ের যে সংস্কার সেখানে তদন্ত করে প্রমোশন করা বা পুনর্বিবেচনার একটি সময় এখন চলে এসেছে। কোথা থেকে কমিয়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ানো যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। বাংলাদেশকে আস্তে আস্তে সামাজিক সুরক্ষা বলয় থেকে সামাজিক নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যেতে হবে।

আরেকটি বিষয় হলো আমরা বড় বড় অবকাঠামো যেগুলো করছি সেগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে বিলম্ব করার কারণে অনেক ব্যয় বাড়ছে। এগুলো সাশ্রয়ীভাবে করা, সময়মতো করা দরকার। বড় বড় টাকা সেখানে ব্যয় হচ্ছে। এখানে বেশি নজর দিতে হবে এবং কাজে আরো স্বচ্ছতা আনতে হবে। এসব বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং দক্ষ লোক দরকার সেখানে ঘাটতি রয়েছে। সুতরাং সক্ষমতা বাড়ানো, দক্ষ লোকবল বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ বড় প্রকল্পগুলো নির্মাণ হওয়ার পর সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও দক্ষ জনবল লাগবে। এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখারও দরকার আছে।

বাজেট বাস্তবায়নের বিষয়ে বললে বলতে হয়, আমাদের দেশে বাজেটের আকার যে হারে বেড়েছে, সে হারে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি এবং দক্ষ জনবল থাকার দরকার ছিল, সে হিসেবে আমরা সেগুলো বাড়াতে পারিনি। যার ফলে ভালো প্রকল্প পরিচালক পাওয়া যায় না, বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা হয়। লোকাল গভর্নমেন্টের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ থাকে সেগুলোর সঠিক বণ্টন ও বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সমাজকে নিয়ে যদি মনিটরিংয়ের জন্য একটি কাঠামো দাঁড় করানো যায় তাহলে হয়তো সাশ্রয়ীভাবে করা যেতে পারে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একবার এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে সে উদ্যোগ আর আলোর মুখ দেখেছে বলে মনে হয় না। সুতরাং একদিকে বাস্তবায়ন সক্ষমতা বাড়ানো দরকার, অন্যদিকে বাস্তবায়নের গুণগত মান নিশ্চিত করা দরকার। তা ছাড়া সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোকে আরো সক্রিয় করারও প্রয়োজন আছে।

এরপর বাজেটের বড় যে বিষয়টি নিয়ে বলবো সেটি হলো – পুনঃবণ্টনের দিকটি। সব দেশের বাজেটেরই একটি বড় দিক হলো – যারা অপেক্ষাকৃত বেশি আয়ের তারা বেশি কর দেয়। পরে কম আয়ের লোক যারা তাদের মধ্যে সমন্বয় করা হয়। এতে সমাজে একটি সমতা আসে এবং সম্পদের পুনঃবণ্টন হয়। বাংলাদেশে এখন যেমন ভোগ বৈষম্য থেকে আয় বৈষম্য বেশি, এ রকম একটি দুষ্ট চক্র আমরা দেখছি। যদিও বাংলাদেশ বিভিন্ন সূচকে গড়ে বেশ ভালো করছে তবুও সম্পদ বণ্টনে অনেক বিশৃঙ্খলা রয়েছে, এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত। সেটি করতে গেলে কিন্তু আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা এবং প্রত্যক্ষ করের অংশ বাড়ানো দরকার। এগুলোতে আমাদের নজর আরো বেশি দিতে হবে। তা ছাড়া সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে খাতগুলো সংশ্লিষ্ট, যেমন আমি যদি স্বাস্থ্য খাত নিয়ে বলি, তাহলে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে যা ব্যয় হয় তার ৭৫ শতাংশ নিজ থেকে ব্যয় করতে হয়। ভুটানে সেটি ২০ শতাংশ আর শ্রীলঙ্কায় সেটি ৩০ শতাংশ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে স্বাস্থ্য খাতের যেসব বিনিয়োগ আছে সিংহভাগই সরকার বহন করে। ঠিক একই রকম শিক্ষা খাতের দিকেও বেশি নজর দিতে হবে। মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকতে হবে।

২৬ মে ২০১৯
সময়ের আলো

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

ফাহমিদা খাতুন

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ সব ধরণের দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বৃহস্পতিবার ইউএনডিপি কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৯ সালের বৈশ্বিক বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকে এ তথ্য দিয়ে বলা হয়েছে দেশ থেকে দারিদ্র্য কমানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ভারত এবং কম্বোডিয়ার মতো। এ সম্পর্কে ঢাকার সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুনের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোনে কথা বলেছেন ওয়াশিংটন স্টুডিও থেকে আনিস আহমেদ।

ভয়েস অব আমেরিকা: বলা হচ্ছে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১ বা Sustainable Development Goal-1 (SDG-1) অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এই অভীষ্টগুলো কি কি?

ফাহমিদা খাতুন: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট যেটা বললেন আপনি সেখানে ১৭টি goals রয়েছে সেগুলোকে আমরা বাংলায় অভীষ্ট বলতে পারি। প্রতিটি অভীষ্টের মধ্যে আবার কিছু টার্গেট রয়েছে। আপনি যে অভীষ্টের কথা বললেন অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচন অভীষ্ট যেটি অভীষ্ট-১ সেটির অধীনে আবার বিভিন্ন ধরনের সূচক রয়েছে। বাংলাদেশ যে ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে তার ফলে কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়ছে এবং সেটি বাড়ার কারণে দারিদ্র্য বিমোচনে অনেকটা সাফল্য এসেছে। আমরা দেখেছি গত বেশ কয়েক দশক থেকেই প্রতি দশকেই অন্তত ১ শতাংশ করে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে যার কারণে মানুষের মাথাপিছু আয় ও দারিদ্র্য বিমোচনে তার প্রভাব পড়ছে। আমরা সেটারই ফলাফল দেখছি, যা জাতিসংঘের এই রিপোর্টে বলা হয়েছে।

ভয়েস অব আমেরিকা: এই যে বাংলাদেশের যে অর্জনটুকু আপনি বললেন এর লক্ষ্যমাত্রা বা অভীষ্ট অনেকগুলো তার মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের যে লক্ষ্যমাত্রা তার ভিতরেই বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যটা এবং সাফল্যটা দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ কোন কোন ক্ষেত্রে অভীষ্ট অর্জনে সফল হয়েছে?

ফাহমিদা খাতুন: দেখুন অভীষ্ট তো এখনও চলমান। আপনি জানেন ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর-এর জাতিসংঘের অধীনে বিভিন্ন দেশ, ১৯৩টি দেশ, এই অভীষ্ট বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। এখন মাত্র ৪ বছর অতিক্রম হয়েছে। এখনই বলা যায় না যে কীভাবে এবং কোন অভীষ্টগুলোতে কোন দেশ কি রকম করবে। কিন্তু আমরা ৪ বছরের একটা বিশ্লেষণ করেছি, সরকারিভাবেও করা হয়েছে, বিভিন্ন সংগঠন থেকেও করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, বেশ কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে আবার অনেকগুলোতে আরো কাজ করতে হবে। আপনার হয়তো মনে আছে যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এমডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ সাফল্য অর্জন করেছিলো। এমডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮টি। সেখানে প্রধান প্রধান কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা যেমন প্রবৃদ্ধি অর্জন, শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ে শিশুর স্কুলে ভর্তি হওয়ার হার বা শিশু মৃত্যুর হার এ সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু আগে থেকেই বাংলাদেশ ভালো করে আসছে। এমডিজি অর্জনে সাফল্যের কারণে জাতিসংঘ থেকে বাংলাদেশ পুরষ্কারও পেয়েছে। সেটারই ধারাবাহিকতা হিসেবে এসডিজি-এর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি এখন পর্যন্ত চার বছরে সবগুলো অভীষ্ট না হলেও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভীষ্টের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভালো সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ খাদ্যে সয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে যে কারণে বাংলাদেশ ক্ষুধা নিবারণে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। যার ফলে অভীষ্ট-২ এর ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কিংবা নারীর ক্ষমতায়নে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্জন ভালো কিন্তু তারপরও আমাদের কয়েকটি বিষয়ে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

ভয়েস অব আমেরিকা: সেই বিষয়েই আসছিলাম। সার্বিক অর্থে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখনও কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে?

ফাহমিদা খাতুন: প্রতিবন্ধকতার প্রথম জিনিসটা হচ্ছে, আমরা যে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি সেটার সুফল সবাই সমানভাবে পাচ্ছে না। অর্থাৎ আমি বৈষম্যের কথা বলছি। দেখা যাচ্ছে যে একদিক দিয়ে আমরা উন্নয়ন করছি, আমাদের মাথাপিছু আয় বাড়ছে, কিন্তু বৈষম্যটা কমছে না, বরং বাড়ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী ২০১০ সালের তুলনায় আমরা দেখছি যে ২০১৫ সালে এসে উপরের ৫ শতাংশের হাতে আরো বেশি সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়েছে এবং নীচের ৫ শতাংশের হাতে সম্পদ অনেক কমে গেছে। এই বৈষম্য শুধু

আয়ের ক্ষেত্রে নয়, এটি সম্পদের ক্ষেত্রে, এবং ভোগের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। বৈষম্য রয়েছে ধনী ও গরিবের মধ্যে, নারী-পুরুষের মধ্যে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে। সুতরাং বৈষম্যের বহুমাত্রিকতা আমরা লক্ষ্য করছি। আরেকটি হচ্ছে যে এই উন্নয়ন আমাদের যথেষ্ট কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারছে কিনা। আমরা দেখছি যে আমাদের যুবকদের মধ্যে কর্মসংস্থানের অভাব বা বেকারত্বের হার ১০.৬ শতাংশ। এর মধ্যে শিক্ষিত যুবক অনেক রয়েছে। তা ছাড়া যে সমস্ত যুবকেরা কোনো শিক্ষা, প্রশিক্ষণ কিংবা কর্মে নিয়োজিত নেই সেইসব যুবকের সংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশ। এই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবৃদ্ধির সাফল্য আমরা পুরোপুরি পাচ্ছি না। অর্থাৎ একধরনের কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি আমরা লক্ষ্য করছি। তৃতীয় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এখানে বিনিয়োগ কম হচ্ছে। বিশেষ করে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেখছি, গত কয়েক বছর ধরে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ জিডিপি এর ২৩ শতাংশের মধ্যে আটকে আছে। আমরা যদি একটি বিকাশমান অর্থনীতি হতে চাই তবে এটিকে ৩০/৩৫ শতাংশের উপরে নিয়ে যেতে হবে, বিনিয়োগ স্থবিরতা ভাঙ্গতে হবে। এখানে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। যেহেতু ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমরা উন্নয়ন করছি, কিন্তু এখানে পরিবেশ দূষণটা অনেক ব্যাপক। আমরা দেশের ভিতরে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে উন্নয়ন করতে পারছি না যেমনটি পৃথিবীর বহু দেশও করতে পারছে না। আবার এর সাথে যুক্ত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যেটা বাংলাদেশের একার পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর উন্নত দেশের কার্যকলাপের কারণে বাংলাদেশ এই জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হচ্ছে যার ফলে আমাদের অর্থনীতির উপর এবং জনগণের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। বাংলাদেশ যেই গতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে সেই গতিতে কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো সক্ষমতা অর্জন করছে না। এখানে যে সমস্ত নীতিনির্ধারণ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে কিনা তা প্রায়ই প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা যদি আমরা আনতে না পারি, তাহলে সুষম এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন সম্ভব হবে না। তাই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা আরো শক্তিশালী দেখতে চাই।

ভয়েস অব আমেরিকা: ড. ফাহমিদা খাতুন, অজস্র ধন্যবাদ।

১৩ জুলাই ২০১৯
ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা

অধ্যায় ৬

অন্যান্য

Addressing the Rohingya crisis: Whose responsibility is it?

Fahmida Khatun

It has been almost 21 months since the influx of about 750,000 Rohingyas to Bangladesh began in August 2017. Gradually, it is becoming clear to us that the Rohingyas are here to stay for a protracted period of time. Their prolonged stay has serious implications for Bangladesh. Already, massive deforestation in the lush hilly land around Cox's Bazar has made the whole area barren. The ecosystem is being destroyed. There are also social problems that are affecting the host communities.

The financial implication of hosting the Rohingyas is also huge. Though a Memorandum of Understating between the governments of Bangladesh and Myanmar was signed in November 2017 for repatriation of the Rohingyas, it did not materialise due to unwillingness on the part of the Myanmar government. The global experience shows that the refugee repatriation time is 10 years on average. Our estimation shows that if the Rohingyas stay for five years from the fiscal year (FY) 2018-2019 onwards, the cost to maintain them will be United States dollar (USD) 7,046 million till FY2023. With population growth and inflation adjustments, this cost will continue to increase. Thus, if they stay for 10 years, the cost will be USD 17,204 million.

Who is going to bear this cost? The international community has extended great support in tackling the problem. Not only have they come forward with financial assistance, they are also providing moral support to Bangladesh by raising the issue at international forums. Thanks to the proactive role of the government of Bangladesh, international donor agencies, international and local non-government organisations (NGOs), and many other organisations, the humanitarian activities have been going smoothly. But there will come a time of donor fatigue. This is not only because they may run short of resources, but also because their priorities could shift. We live in a time when crises arise every other day somewhere in the world. International security and cross-border terrorism have become a serious matter of concern. So, everyone rushes to attend the competing priorities on a continuous basis.

Hence, the ultimate burden of the Rohingyas will fall on Bangladesh. Clearly, the policymakers will have to plan for this even though there may be a denial syndrome among them about the length of stay of the Rohingyas. So far, the government of Bangladesh has extended all-out support to the Rohingyas by providing them with shelter and other support. It is unthinkable for any country in the world to do what Bangladesh has done for the Rohingyas. Who doesn't know the fate of the refugees crossing borders to the developed countries? Haven't we seen the inhumanity and cruelty of the wealthy and powerful countries even towards the children from poor, war-affected nations? But Bangladesh, despite being a densely populated and lower middle-income country, has shown such generosity which has put the developed world to shame.

However, when the flow of support for the Rohingyas dwindles, how will the government meet the requirements of the Rohingyas? This is an issue that the government needs to ponder on moving forward. In this regard, an action plan should be in place. There could be a three-pronged approach: first, international dialogues should be continued, and Bangladesh has to pursue more energetic diplomacy at the global level; second, bilateral talks with Myanmar should also be continued. The issue should also be raised continuously at regional

forums such as the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) and Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) Economic Corridor. Third, while the dialogues go on, the Rohingyas should be looked after, and their economic and social safety has to be ensured.

Shockingly, some international organisations have come up with the suggestion of forming a solidarity compact. They cite examples of Jordan, Lebanon and Ethiopia which had opted for such a compact in dealing with refugees in their countries. In a nutshell, advocates of such a solidarity compact promotes the idea that the host country should keep the refugees in exchange for facilities such as duty-free market access for its products, migration of its labour force and foreign direct investment into the country.

This is an out-and-out unacceptable and meaningless proposal. Currently, Bangladesh as a least developed country (LDC) gets duty-free quota-free (DFQF) market access to many countries including the European Union markets. When it graduates from the LDC group, initially in 2024, and finally in 2027 after the three-year grace period, Bangladesh will lose the DFQF market access in any case. Besides, with not so promising global economic outlook and with increased protectionism in the horizon, the desire to have DFQF in exchange for keeping the Rohingyas is wishful thinking. In fact, this whole idea is based on the political economy of the refugee problem. It is also the reflection of a parochial mindset that thinks that the southern countries will host refugees while the northern countries will provide some token support to show their sympathy.

After the initial humanitarian support, now there is a need for developmental interventions for the Rohingyas in terms of access to education and skills development. Developing human capital is a good idea in giving them the opportunity to earn a living. However, that doesn't imply that the Rohingyas should be integrated into the host society. The host communities are already stressed due to the massive

environmental damage and shrinking livelihood opportunities as a result of competition from the Rohingyas who are available at a lower wage. It is time to step up pressure on the Myanmar government for repatriation of their people. The global community also has to accept the fact that the Rohingyas are not only Bangladesh's responsibility. It is their responsibility, too. The international community has to play a proactive role to support Bangladesh and create pressure on Myanmar for repatriation of the Rohingyas at the earliest.

13 May 2019
The Daily Star

The political philosophy of Bangabandhu

Rounaq Jahan

For our generation who witnessed the birth of Bangladesh, it is a daunting task to express in words the unique role played by the Father of the Nation, Bangabandhu Shiekh Mujibur Rahman in the creation of the new state. It is even more challenging to analyse the political ideas underpinning his life's work. Whenever I think of Bangabandhu I first remember those exciting and memorable days of March 1971.

I consider myself to be very lucky that I was able to witness the events of March 1971 and Bangabandhu's role in creating history. Very few people are fortunate enough to see the making of history. I witnessed the transformation of our movement for autonomy into our struggle for independence. I witnessed how the main actor of this historic transformation, Bangabandhu Shiekh Mujibur Rahman, realised an impossible dream. There have been leaders in other countries who led their nations. But few could create history. Bangabandhu was one such rare grand actor of history.

It is unfortunate that even after 48 years of our independence and 43 years after his assassination there is no well-researched comprehensive biography of Bangabandhu Shiekh Mujibur Rahman. Fortunately two recent books, based on his personal diaries, have been published which

can serve as original source that help us understand his ideals and political philosophy.

The first book, *The Unfinished Memoirs*, published in 2012, throws light on his childhood, and early political life. Though *The Unfinished Memoirs* does not include events after the late 1950s it still illuminates his political thoughts very clearly.

The second book, *Karagarer Rojnamcha* (Prison Diaries) which was published in 2017, is based on his diaries when he was in prison after he launched the six point movement in 1966. Here again his political thoughts are made very clear. He discusses at length the different methods of suppression of people's movements pursued by an autocratic state. He highlights the importance of fundamental civil and political rights, particularly the need for ensuring freedom of expressions for sustaining democracy.

In this article I quote extensively from his writings so that we can hear his own voice. To understand his political philosophy we should always keep in mind that Bangabandhu spent most of his life as a political player outside state power. He struggled against colonial and undemocratic state power, first against the British and later against the Pakistan state to establish the economic, political, and cultural rights of the Bengalis.

He exercised state power only for a limited period of time -- barely three and a half years after independence. His political discourse, as illustrated in these two books, is that of a leader fighting authoritarian state power, not that of a leader who was using state power to govern a country.

One of the remarkable features of his political life was his transformation from an ordinary rank and file worker of a political party to an unparalleled leader of millions of people. Bangabandhu possessed outstanding organisational capacity; at the same time he was a great orator. Generally we do not find such a combination of qualities in one leader.

In his Unfinished Memoirs Bangabandhu notes that he was more interested in party organisational work than in discussing theoretical

and ideological issues. Though he was not a political theoretician, Bangabandhu had a few specific political ideals and goals and he worked consistently to achieve them. His values are best captured in three sentences which Bangabandhu penned on May 3, 1973. He writes:

"As a man, what concerns mankind concerns me. As a Bengalee, I am deeply involved in all that concerns Bengalees. This abiding involvement is born of and nourished by love, enduring love, which gives meaning to my politics and to my very being."

The above quote makes it clear that Bangabandhu identified himself both as a human being and as a Bengali.

This self-identification helps us explore the main features of his political philosophy, such as nationalism, secularism, socialism, and people-orientation.

Nationalism

Independence, liberation, and democracy

From the beginning of his political life, Bangabandhu was proud of his Bengali national identity. He was involved in the Pakistan movement but he believed that Pakistan should be established on the basis of the Lahore Resolution which envisaged two Muslim majority independent sovereign states.

He perceived the nationalist movement not simply as a struggle to gain independence from the rule of an external colonial power but also as a struggle for the economic and political emancipation of the down-trodden masses from various forms of oppression.

He joined the Pakistan movement in the hope that poor Muslim peasants will be liberated from the exploitation of the landlord classes. He had always viewed the Bengali nationalist movement as a movement for the achievement of democracy as well as liberation of the oppressed

people. Thus on March 7, 1971 he called upon the people to launch simultaneously the struggle for independence and liberation.

Prior to the establishment of Pakistan, when as a student in Kolkata, Bangabandhu joined the Muslim League. He belonged to the Shaheed Suhrawardy and Abul Hashem faction of the party which was known as the progressives group. In his Unfinished Memoirs he writes:

"Under Mr Suhrawardy's leadership we wanted to make the Muslim League the party of the people and make it represent middle-class Bengali aspirations. Upto that time Muslim League had not become an organization that was rooted in the people. It used to serve the interests of landlords, moneyed men, and Nawabs and Khan Bahadurs."

After the creation of Pakistan, Bangabandhu returned to Dhaka and became involved in various progressive movements and organisations which championed the linguistic, cultural, and economic rights of the Bengalis. In 1948 he was imprisoned for participating in the movement demanding recognition of Bengali as one of the state languages of Pakistan.

He was also involved in other social and political protest movements, such as the movement of poor peasants against prohibiting inter-district trade in rice known as the "cordon" system. He supported the movement of the fourth class employees of Dhaka University and was again imprisoned in 1949.

Within a relatively short period after the establishment of Pakistan he became convinced about the need for establishing an opposition political party not only for championing the rights of the Bengalis but also to challenge the authoritarian rule of the Muslim League. In his Unfinished Memoirs he explained the rationale for the establishment of the Awami League in the following way:

"There is no point in pursuing the Muslim League any longer. This party has now become the establishment. They can no longer be called a party

of the people … if we did not form an organization that could take on the role of the opposition the country would turn into a dictatorship."

In 1949, the Awami Muslim League (AML) was founded and Bangabandhu was elected the joint secretary of the party though he was still in prison. In 1953 he became the general secretary of the party. The demand for self-rule gained increasing popular support in East Bengal from the mid-1950s. In 1955 Bangabandhu became a member of the Pakistan National Assembly (NA). In one of his speeches in the NA we already find a strong articulation of various demands of the Bengali nationalists and his strong sense of Bengali identity. He said:

"They want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal.' We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word Bengal has a history, has a tradition of its own. You can change it only after people have been consulted. If you want to change it then we have to go back to Bengal and ask them whether they accept it … what about the state language Bengali? What about joint electorate? What about autonomy? … I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite."

In the council session of the party in 1955 the Awami League (AL) dropped the word "Muslim" from its name and Bangabandhu again became the general secretary of the party. In February 1966, Bangabandhu presented his historic six points demand which put forward a very radical notion of provincial autonomy leaving only limited powers in the hands of the central government.

In March of that year he became the president of the AL and began a country-wide campaign to popularise the six points which soon became the sole agenda of the party. Six points captured the aspirations of the nation and it was billed as the charter for the liberation of the Bengalis. Following the launch of the six points, Bangabandhu was again imprisoned and he was charged with treason by the Pakistan government in the Agartala conspiracy case.

In 1969, Ayub fell from power in the face of massive students' movement. Bangabandhu was released from prison and the students conferred on him the title of Bangabandhu (friend of Bengal). During the 1970 election campaign Bangabandhu started using nationalist slogans such as "Bangladesh" and "Joy Bangla."

Thus, within a relatively short span of four years, between 1966 to 1970, Bangabandhu was able to unite the whole Bengali nation behind his demand for liberation and independence. I do not think any other nationalist leader had been so successful in mobilising such a huge number of people within such a short period of time.

It is noteworthy that though throughout his life Bangabandhu was involved in movement politics and talked about people's emancipation from exploitation and oppression, he believed in peaceful non-violent political movements. From 1947 till 1970 the Bengali nationalist movement became stronger day-by-day under his leadership but he stayed within the bounds of democratic politics.

Whenever Pakistani rulers gave opportunities for election he participated in them, though the elections were often not free and fair and attempts were made to foil the election results. In K*aragarer Rojnamcha* he points out repeatedly that by limiting the democratic space an autocratic regime ultimately leads the country towards terrorist politics. He writes:

"Newspapers arrived. I was alarmed that they [the Pakistani government] are trying to shut down democratic politics … If anybody criticizes the government there will be cases against them under the proposed secret act … I myself am facing five cases under article 124, section 7 (3) for making public speeches … My fear is they are leading Pakistan toward terrorist politics. We do not believe in that politics. But those of us who want to do good for the people through democratic politics, our space is shrinking."

Secularism

Non-communalism and equal rights for all citizens

Though he was a Bengali nationalist, Bangabandhu never tried to create division and hatred between different identity groups. Many nationalist politicians use provocative languages and symbols that encourage violence between different groups. These days we are witnessing the rise of such nationalist leaders even in Western democratic countries who are trying to instigate intolerance and violence towards minority groups. But Bangabandhu's nationalist politics was different. He believed in co-existence and mutual tolerance of different identity groups and talked about equal rights of all citizens. He always stood against communal violence.

Though he was involved in the Pakistan movement he believed that in India, Muslims and in Pakistan, Hindus should enjoy equal rights as citizens and live together in peace and harmony. He talked about equal rights of all groups to practice their respective religions.

He witnessed the communal riots in Kolkata on August 16, 1947. He points out that Suhrawardy asked his supporters to observe the day in a peaceful way so that no blame could fall on the Suhrawardy government. But unfortunately, communal riots did break out in Kolkata and later spread to Noakhali. Bangabandhu saved both Muslims and Hindus from acts of communal violence in Kolkata. Later when Suhrawardy joined Mahatma Gandhi in efforts to bring back communal harmony, Bangabandhu joined them.

After returning to Dhaka he joined Gonotantrik Jubo League and took up the cause of building communal harmony as his main mission. He was against all forms of communal violence, not simply between Hindus and Muslims but also between different Muslim sects and between Bengalis and non-Bengalis.

In his Unfinished Memoirs he strongly condemns the anti-Kadiyani riots that took place in Lahore in 1953. In 1954, when riots broke out between Bengali and non-Bengali workers in Adamjee jute mills in Narayanganj, he rushed to the area to calm the situation. In 1964 when Hindu-Muslim riots spread in India he started a civic campaign to prevent communal riots in East Bengal. Even in his March 7, 1971 speech he asked people to remain vigilant against the threat of communal violence. He said:

“Be very careful, keep in mind that the enemy has infiltrated our ranks to engage in the work of provocateurs. Whether Bengalee or non-Bengalee, Hindu or Muslim, all are our brothers and it is our responsibility to ensure their safety.”

In his personal life he followed the preachings of Islam. But Bangabandhu was against the political use of religion. He condemned the Muslim League’s practice of using the slogan of Islam and not paying attention to the economic well-being of the people which he argued was the goal for which “the working class, the peasants, and the labourers had made sacrifice during the movement for independence.”

Socialism

Equality, freedom from exploitation, and oppression

In his Unfinished Memoirs Bangabandhu writes:

“I myself am no communist, but I believe in socialism and not in capitalism. I believe capital is a tool of the oppressor. As long as capitalism is the mainspring of the economic order people all over the world will continue to be oppressed.”

By socialism he meant a system that would free people from exploitation and oppression and remove inequality. He visited China in 1952 which left a deep imprint in his mind. He found great differences in the living conditions of people in Pakistan and China which he attributed to the differences in the two political systems.

Bangabandhu believed that the government has a role to play in removing inequality and freeing people from exploitation. He admired the priorities set by the Chinese government in improving the socio-economic conditions of the people. He writes:

“Everywhere we could see new schools and colleges coming up. The government has taken charge of education.” He further writes:

“The communist government had confiscated the land owned by landlords and had distributed it among all farmers. Thus landless peasants had become land owners. China now belonged to peasants and workers and the class that used to dominate and exploit had had their day.”

He did not want to see inequality grow in Bangladesh. In the council session of the AL held during April 7-8, 1972, he reiterated his commitment to promote an exploitation-free socio-economic system and socialism was formally adopted as one of the ideals of the party. In the next council session of the party held in 1974 he, again, pledged to work for freeing the nation of exploitation and oppression.

People Orientation

People’s issues, people’s politics

Often we find leaders who lead people towards great goals but they do not become emotionally involved with the people. Bangabandhu was an exception. When I compare the speeches of various leaders of the world with those of Bangabandhu, one of his off-repeated expressions -- “love for people” -- stands out as unique. He often talked about his love for people and people’s love for him in return.

He always prioritised the issues that are upper-most in ordinary people’s lives. His politics was people’s politics. During the campaign for Pakistan when famine struck, he worked in feeding centres for the famine victims. He worked to rescue the victims of communal riots in

Kolkata. He participated in street rallies demanding food security for the poor in East Bengal. His political philosophy was not centred only around the goal of getting state power: He developed his political ideas by being involved with the concerns of the ordinary masses.

This people's orientation made him a pragmatist. In his diaries he constantly refers to issues that would affect ordinary people's everyday life such as the rise in essential commodity prices or tax increase or flood or famine.

At one level, Bangabandhu was a man of the masses. He learned about people's aspirations from them. At another level he was the leader of the people. He carried forward ordinary people's aspirations. He had faith in people. That is why he could call upon people on March 7, 1971 to join the liberation struggle with "whatever little they have."

Four guiding principles of state

We see the reflections of Banganabdhu's political philosophy in the four guiding principles of state adopted by our constitution: nationalism, democracy, secularism, and socialism. He defended these four principles in various speeches delivered in the parliament, in the party forums, and in addresses to the nation.

Bangabandhu used to articulate the goals of his life's work in two simple words. He would either say he wants to build again "Shonar Bangla" or he would say he wants to bring "a smile on the faces of the poor and unhappy people." Bangabandhu never talked about GDP growth or other theoretical issues. He knew very well how precious a smile was and his goal was to achieve that priceless objective.

10 June 2019
Dhaka Tribune

Winners and losers in the Fourth Industrial Revolution

Fahmida Khatun

Every time I travel to a developed country, I observe new ways of doing things. I find that human interaction has become unnecessary in getting services. Machines have replaced workers. As a citizen of a less developed economy, I am sometimes taken aback with such fast pace of changes. We are still used to getting personalised services! Starting from simple things such as airline check-in to train tickets to restaurant reservations to getting coffee from machines, technology has now become the service provider. Immigration clearance in advanced countries is now a matter of two to three minutes, while bank transfer takes only a few seconds. We see fewer people, faster service. So technology is our new way of life. This will continue to unfold with further technological revolution in the coming days.

Modern economies have been observing a technological revolution for more than half a century. Now artificial intelligence, robotics, internet-of-things, block chain, etc. are rapidly changing their economies, societies and cultures. The Fourth Industrial Revolution (4IR) is changing every spectrum of human life.

The most significant impact of 4IR will be felt in the labour market. Low-skilled and repetitive work will be carried out by machines. Machines

will be able to work better and faster. Of course, new types of jobs will emerge with higher productivity and higher pay. New products and services will be in demand. So, new skills and new jobs will be required. But who will get those jobs and how the labour market will cope with the technological "disruption" are important issues that should be explored.

The labour-market implications of the 4IR are very important for Bangladesh, a country that has a large labour force. This is all the more important because, despite having high growth, the economy has not been able to create enough jobs.

On the other hand, the country has not been able to benefit from the structural change in terms of employment generation. For example, the contribution of agriculture to our gross domestic product (GDP) has reduced to 13.7 per cent in 2018, compared to 28.7 per cent in 1990. Contrary to this, the share of industrial sector has increased from 20.2 per cent in 1991 to 32.3 per cent in 2018. Similarly, the contribution of the services sector has gone up from 48.3 per cent in 1991 to 50 per cent in 2018. However, employment generation does not follow the same trend. Agriculture, being the lowest contributor to GDP, creates 40.6 per cent of total employment. Industry creates 20.4 per cent and services sector creates 39 per cent of total jobs. Besides, more than 80 per cent of employment is in the informal sector with low and unpredictable income without job security.

Some sectors of late are increasingly resorting to automation to increase efficiency and productivity. The export-oriented readymade garment (RMG) sector is one of them. Though the adoption of technology in the RMG sector is still slow, the impact is already visible. The share of female labour force has declined in the sector since they have least technological skills. This indicates to the differential impact of technology on workers. Not everyone will experience the impact in the same manner. Not everyone will benefit from the technological change in the same way.

No doubt, technology has made life smooth, saved time, and improved efficiency. Technology has enabled us to be more productive and expand

our economy. We can use technology for improving almost every sphere of our lives, if we use it in the right manner. We can expect to have a pollution-free, cleaner and smarter city, we can save time being more efficient and have more leisure time, just to name a few prospects.

But technology can also be a source of inequality and discrimination. During the Third Industrial Revolution, which is about information and communications technology (ICT), we have observed a "digital divide". The privileged individuals with access to technology and education could grab the new jobs. They could earn a lot more than those who did not have access to technology. So if technology is in the hands of a few rich people and if the benefits of technology are not distributed fairly, it worsens the inequality situation.

The other issue related to technology is the quality of jobs. Our attention is more on economic growth, less on the quality of growth. We do not know whether those working in digital platforms, such as e-commerce, have basic labour rights that guarantee a minimum wage and bargaining power. Ensuring quality of jobs and maximisation of decent employment should receive more importance, as we expand the size of digital economy.

The distributional aspects of 4IR are to be ensured through well-designed policies, such as education policy, labour policy, industrial policy, digital policy, competition policy, tax policy, etc. In case of education, the policy-makers should move beyond mere numbers, such as enrolment rates and gender parity. More focus should be on the quality of education, and opportunity for reskilling, retraining and relearning. To improve the quality of education, adequate public resources should be made available. The current allocation of only 2 per cent of GDP for education is inadequate to bring any positive change in the education outcome. But the tax-GDP ratio is only about 9 per cent. The number of people under the tax net is much lower than that of the potential taxpayers. Tax avoidance is high. As a result, resources from tax collection cannot be ploughed back to sectors such as education, health and social protection.

So the distributional aspect of 4IR should be at the forefront. And the realisation of technological opportunities to everyone's benefit will hinge on appropriate policy response by the government.

17 December 2019
The Daily Star

আমি আজ বেদনা ভারাক্রান্ত

রেহমান সোবহান

ফজলে হাসান আবেদের প্রয়াণ আমাকে বেদনা ভারাক্রান্ত করেছে। তিনি বয়সে আমার চেয়ে প্রায় এক বছরের ছোট ছিলেন। কিন্তু আমার আগেই চলে গেলেন। তার মৃত্যুতে আমি একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারিয়েছি।

ফজলে হাসান আবেদ সিপিডি'র বোর্ড অব ট্রাস্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় আমরা যখন এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছিলাম, তখন হাতেগোনা যে কয়েকজনকে সঙ্গে চেয়েছিলাম, তিনি ছিলেন তাদের একজন। কিছুদিন আগে তিনি এই পদ থেকে সরে দাঁড়ান স্বাস্থ্যগত কারণে। নিজের প্রতিষ্ঠিত ব্র্যাকসহ যেসব প্রতিষ্ঠানে তিনি জড়িত ছিলেন, সবগুলো থেকেই অবসর নিচ্ছিলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগের বাইরেও ব্যক্তিগতভাবে আবেদকে আমি চিনি ১৯৭১ সালের সেই উত্তাল দিনগুলো থেকে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে প্রচারণা ও তহবিল গঠনের কাজে স্বনিয়োজিত ছিলেন। আমি তখন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত হিসেবে ইউরোপ ও আমেরিকায় বাংলাদেশের পক্ষে লবি করছিলাম। মনে আছে, তিনি চট্টগ্রাম থেকে লন্ডন পৌঁছে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা ও তহবিল গঠনে আমার পরামর্শ চেয়েছিলেন। সেই প্রথম দেখার পর তার জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত আমাদের সখ্যে চিড় ধরেনি।

স্বাধীনতার পর সুনামগঞ্জের দিরাই-শাল্লায় ছোট্ট একটি ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প থেকে ফজলে হাসান আবেদ আজকের এত বড় ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন অনন্য নেতৃত্বের গুণে। স্বাধীনতার পর দেশে আরো হাজার হাজার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

গড়ে উঠেছিল। এগুলোর অনেক প্রতিষ্ঠানই ব্র্যাকের মতো ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল। কোনো কোনোটি উপজেলা বা জেলা পর্যায়েই সীমিত থেকেছে। ব্র্যাক ছড়িয়ে গেছে সারাদেশে। দেশের গন্ডি পেরিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কার্যক্রম শুরু করেছে।

ফজলে হাসান আবেদের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে, তিনি একটি কাজে সীমিত থাকতেন না। কোনো বিষয়ের খন্ডিত দিক নিয়ে পড়ে থাকতেন না। সবকিছুতে তার একটি 'হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ' ছিল। তিনি মনে করতেন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শুধু ক্ষুদ্রঋণ দিলেই হবে না, এর সঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে আইনি সুযোগ ও শিক্ষা দিতে হবে।

আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, একটি প্রতিষ্ঠান যেভাবে তৈরি হয়, সেটিকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা অনেকেই করতে পারেন। কিন্তু একটি প্রতিষ্ঠানকে ছোট থেকে ক্রমাগত বড় করে তুলতে পারে খুব কম মানুষই। ফজলে হাসান আবেদ সেটি পেরেছেন। এখানেই তার স্বাতন্ত্র। তিনি প্রমাণ করেছেন, কথিত তৃতীয় বিশ্ব থেকেও বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়। তার একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি কাজ করেছেন জাতীয়ভাবে; কিন্তু ভেবেছেন আন্তর্জাতিক মাত্রায় (স্কেলে)। বাংলাদেশে নিজেকে প্রমাণ করে সেই অভিজ্ঞতা ও কর্মসূচি বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। দেশের প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আন্তর্জাতিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ অনেক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

ব্র্যাক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ফজলে হাসান আবেদ বাংলাদেশের কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের জীবন রূপান্তরের ব্রত নিয়েছিলেন। আমরা দেখি, একই সঙ্গে তিনি নিজের জীবনকেও রূপান্তর করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ই তিনি বহুজাতিক কোম্পানি শেল অয়েলের অর্থ বিভাগের প্রধান হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। আমি নিশ্চিত, তিনি ওই প্রতিষ্ঠানে থাকলে সেখানেও সর্বোচ্চ পদে যেতেন। যে কোনো বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হওয়ার যোগ্যতা ফজলে হাসান আবেদের ছিল। তিনি সেই হাতছানি এড়িয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা থেকেও তার প্রতিষ্ঠিত ব্র্যাক স্বতন্ত্র। তারা বিভিন্ন দেশে এক একটি কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে। কিন্তু ব্র্যাক বাংলাদেশের উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়নের সব দিক নিয়েই কাজ করেছে। পরিবেশ নিয়েও কাজ করছে। একটি দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে দেওয়ার এ প্রত্যয় খুব কম আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার মধ্যেই রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞতা আফগানিস্তানসহ অন্যান্য দেশেও প্রয়োগ করতে চেয়েছেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে।

আমার কাছে ফজলে হাসান আবেদের যে দিকটি আরো গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হচ্ছে তিনি ভালো মানুষ ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে তুলে ধরার চেয়ে সব সময় প্রতিষ্ঠানকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এমন মানুষ কেবল বাংলাদেশে নয়, বিশ্বেও বিরল। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রস্থানের সময় হয়েছে। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে ব্র্যাক ও এর বিভিন্ন অঙ্গপ্রতিষ্ঠান কীভাবে চলবে, তার সব ব্যবস্থা সময় নিয়ে ধীরে ধীরে করেছেন। তিনি জীবনে যেমন, তেমনই মৃত্যুর পরও তার কর্ম সুচারু রাখতে চেয়েছেন।

ফজলে হাসান আবেদ ও তার মহৎ জীবনের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

২৩ *ডিসেম্বর* ২০১৯
সমকাল

আমাদের ঘরের শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় আনতে হবে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

এনটিভি: স্বাধীনতা অর্জনের অর্ধশতকের দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ। **১৯৭১** এর আজকের দিনে পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় কাঙ্ক্ষিত বিজয়। গত ৪৯ বছরে দেশ এগিয়েছে অর্থনীতি ও উন্নয়নের নানা সূচকে; তবে টেকসই গণতন্ত্র আর বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা এখনো চ্যালেঞ্জ বলছেন বিশ্লেষকরা।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, দেশের ভেতরে দারিদ্র্যের পরিমাণ কমেছে, আমাদের রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্জন আছে, কৃষি ও খাদ্যশস্য উৎপাদনে আমাদের সফলতা আছে। বিশ্বের বুকে আমারা অন্যতম রেমিট্যান্স আয়কারি দেশ হিসেবে স্থান অর্জন করেছি। যারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করতো, তাদের সম্পূর্ণরূপে ভুল প্রমাণ করে বাংলাদেশ এগিয়ে এসেছে।

এনটিভি: বিশ্লেষকরা অবশ্য বলছেন উন্নয়নকে টেকসই করতে বৈষম্যহীন সমাজ গঠন এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানবিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক নানা দূর্বলতায়।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার কাছে বারবার যেটি মনে হয় যে আমরা বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছি, আর এ অর্জন ধরে রাখতে হলে এখন আমাদের ঘরের শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় আনতে হবে। ঘরের শত্রু কী করে? ঘরের শত্রু শ্রমিকের মজুরি ঠিক মতো দেয় না, কৃষকের পণ্যের ন্যায্য মূল্য দেয় না, ট্যাক্স দেয় না, ব্যাংকের টাকা খেলাপি ঋণ

ফেরত দেয় না, দেশ থেকে টাকা পাচার করে এবং নাশকতামূলক কাজের সাথে জড়িত থাকে। সুতরাং এইগুলোর বিরুদ্ধে আমি নীতি ও বিজয়ের অপেক্ষায় থাকি।

১৬ ডিসেম্বর ২০১৯
বিজয় দিবস উপলক্ষে এনটিভি'র সাক্ষাৎকার

সিপিডি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গণমাধ্যমের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করে আসছে। নীতি গবেষণার ফলাফলকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের যে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে, তা স্বীকৃত সত্য। এ কারণে সিপিডি'র গবেষকরা গণমাধ্যমে সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে কলাম লিখে, সাক্ষাৎকার প্রদান করে ও মন্তব্য দিয়ে নীতি গবেষণার জটিল বিষয়গুলোকে সহজবোধ্যভাবে সাধারণ জনগণের কাছে উপস্থাপন করে থাকে। বর্তমান গ্রন্থটি ২০১৯ সালে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় পত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত মতামতের একটি সংকলন।

বাংলাদেশের উচ্চ প্রবৃদ্ধি সার্বিক উন্নয়নে কী ধরনের ভূমিকা রাখছে এবং এর প্রভাব বিভিন্ন খাতগুলোতে দৃশ্যমান কোনো পরিবর্তন আনছে কিনা এই বিষয়ে এই বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে সেবা বিষয়ক খাত, যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে জিডিপি'র বরাদ্দকৃত অংশ পর্যাপ্ত কিনা সে আলোচনাও আছে। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে উন্নয়নের সহায়ক হতে পারে তা তুলে ধরা হয়েছে। বইটিতে ২০১৯ সালের সামগ্রিক মূল্যায়ন এবং ২০২০ সালে দেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতি কী ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে সেটি প্রতিফলিত হয়েছে।

দেশের যুব সমাজ শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে কী ধরনের পরিস্থিতিতে রয়েছে এবং যুব বেকারত্ব নিরসনে সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি খাতের কী ভূমিকা হতে পারে তা নিয়েও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের একটি বড় অংশ যুব সমাজ। সেই যুবদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মূল্যায়নের কথা বলেছেন সিপিডি'র গবেষকরা।

বাংলাদেশের বাজেট বিষয়ক গবেষণা সিপিডি'র ধারাবাহিক কাজের একটি অংশ। বরাবরের মতোই বাজেটের পূর্বে ও পরবর্তীতে বিশ্লেষণ ও বাজেট বরাদ্দকালে কোন কোন খাতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। এবারের বাজেটটি পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোন বিষয়গুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত তার দিক নির্দেশনা আছে বইটিতে। বাজেট বাস্তবায়নের বড় চ্যালেঞ্জ, কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানো, কর ফাঁকি রোধ করা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সংস্কার এ সময়ের আলোচিত একটি বিষয়। সে লক্ষ্যে ব্যাংকিং কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা, ঋণখেলাপি সমস্যা ও করণীয় সংক্রান্ত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বিনিয়োগের চ্যালেঞ্জসমূহ ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে চাঞ্চল্য বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ চিহ্নিত করা হয়েছে।

একটি সময়োপযোগী আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে দেশের ভেতরে বিরাজমান সঙ্কট নিয়ে বিশেষত গুরুত্ব পেয়েছে রোহিঙ্গা ইস্যু। আগামী দিনের উন্নয়ন পথরেখায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক, সহনশীল, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সিপিডি'র গবেষকরা প্রতিনিয়তই কাজ করে যাচ্ছে। তারই প্রতিফলন রয়েছে বইটির বিভিন্ন প্রবন্ধে। নানামুখী বিষয় নিয়ে অনন্য এই সংকলনটি উৎসুক পাঠকদের আগ্রহ পূরণে সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি - ৬/২ (৭ ও ৮ তলা), ব্লক - এফ
কাজী নজরুল ইসলাম রোড, লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট
ঢাকা - ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৮১৫২৭৭৯, ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২
ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৪৮১১০৪১৪ ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd

9 789843 487957